বাঙলা-সাহিত্যের একদিক

রচনা-সাহিত্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক
শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত
এম্. এ, পি-এইচ্. ডি

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

প্রথিতযশা অধ্যাপক

এবং

ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক

ডক্টর সুধীর কুমার দাশগুপ্ত, এম্. এ, পি-এইচ্. ডি

মহাশয়ের

করকমলে

গ্রন্থকার

ভূমিকা

কাব্য-কবিতা, গল্প-উপন্যাস, নাটক প্রভৃতির ন্যায় 'রচনা'ও সমৃদ্ধ সাহিত্যের একটি বিশেষ দিক্; বর্তমান গ্রন্থে বাঙলা-সাহিত্যের সেই বিশেষ দিক্ সম্বন্ধেই ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। 'রচনা' শব্দটি বিদ্যালয়ের পরিচিত অর্থ হইতে এখানে অন্য একটি বিশেষ অর্থে গৃহীত হইয়াছে; প্রবন্ধ, নিবন্ধ, সন্দর্ভ, রচনা প্রভৃতি শিরোনামায় যে সকল গদ্য লেখা বাঙলায় প্রচলিত তাহার ভিতরে যে অংশটা সত্যকারের একটা সাহিত্যিক 'নির্মিতি' তাহাকেই আমি 'রচনা' আখ্যা দান করিয়াছি। সুতরাং গ্রন্থের প্রথমেই 'রচনা'-সাহিত্যের স্বরূপ-লক্ষণ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া 'বস্তু-নির্দেশ' করিতে হইয়াছে। আমি যে বিশেষ অর্থে 'রচনা' শব্দটিকে এই গ্রন্থে গ্রহণ করিয়াছি সেই অর্থে শব্দটি বাঙলা-সাহিত্যে সুপ্রচলিত নহে; 'রচনা' শব্দটির ভিতরে একটা 'সাহিত্যিক নির্মিতি'র অর্থ নিহিত আছে বলিয়াই এইজাতীয় সাহিত্য বুঝাইতে আমি বাছিয়া এই নামটিই গ্রহণ করিয়াছি।

একটি বিশেষ শ্রেণীর সাহিত্যিক নির্মিতিরূপে রচনা-সাহিত্যের স্বরূপ নির্দেশের পর গ্রন্থে বাঙলা রচনা-সাহিত্যের উৎপত্তি এবং ক্রম-বিকাশ সম্বন্ধে ধারাবাহিকরূপে আলোচনা করা হইয়াছে। আমাদের রচনার ভাল সংগ্রহ-গ্রন্থের বড় অভাব, ভাল ভাল রচনাকারগণের রচনাগুলির সহিত আমাদের পরিচয়ও কম; রচনাকারগণ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থ মধ্যে উদ্ধৃতির বহুলতাও এই কারণে অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছে। সন-তারিখ সম্বন্ধে আমি পূর্ববর্তিগণের উপরে অনেকখানি নির্ভর করিয়াছি। ইতি

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

বাঙলা-সাহিত্যের একদিক

প্রথম অধ্যায়

রচনা-সাহিত্যের স্বরূপ-লক্ষণ

প্রায় সকল জাতীয় সাহিত্যেরই গুণ-কর্ম-বিভাগ অনুযায়ী একটা আত্ম-পরিচয় আছে; কিন্তু রচনা-সাহিত্য যেন একেবারে জাতিগোত্রহীন। বিতর্কাত্মক হইলেও কাব্য, কবিতা, নাটক, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতির আমরা একটা লাক্ষণিক পরিচয় ঠিক করিয়া লইয়াছি, কিন্তু রচনা-সাহিত্য বলিতে সাহিত্যের 'মায় চণ্ডীপাঠ ইস্তক জুতা সেলাই' কিছুই বাদ পড়ে না। গুরু-গম্ভীর দার্শনিক তত্ত্বালোচনা, দুর্দান্ত ঐতিহাসিক গবেষণা, রাজনৈতিক মসীযুদ্ধ আর সমাজনৈতিক ঘোঁট, সাহিত্যিক বিতর্ক এবং সমালোচনা, আর গদ্যচ্ছন্দে লেখকের আত্ম-প্রকাশ, ইহাদের সকলকেই আমরা 'রচনা-সাহিত্যে'র শ্রীক্ষেত্রে আনিয়া একেবারে এক করিয়া দিয়াছি। মোটের উপরে গল্প, উপন্যাস এবং নাটক ব্যতীত গদ্যরীতিতে আর যাহা কিছু লিখিত হয় তাহাই 'রচনা-সাহিত্য' নামে অভিহিত।

কিন্তু আমরা জানি, যাহা কিছু লেখা হয় তাহাই সাহিত্য নহে,—সাহিত্য এক প্রকারের, 'বিশেষ লেখা'; সুতরাং যে সকল লেখার গুরু-গাম্ভীর্য এবং রাশভারিত্ব দেখিয়া আমরা সাগ্রহে এবং সসম্মানে তাহাদিগকে সাহিত্যের আসরে আভিজাত্যের উচ্চ আসন দেই, অনেক স্থলে তাহাদের উচ্চস্থান অনেকখানি অবিচারলব্ধ। হাইকোর্টের বিচারপতির ধার এবং ভার দুই-ই আছে, কিন্তু শুধু সেই বিচারপতিত্বের ধার-ভার লইয়াই যদি তিনি তাঁহার প্রিয়জনদের নিকট প্রিয় হইবার দাবী পেশ করেন তবে আপত্তির সম্ভাবনা অনেক। সাহিত্য মুখ্যতঃ হৃদয়ের জগৎ, বুদ্ধির জগৎ নহে। সাম্প্রতিক প্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে নূতন শাণ দেওয়া ঝক্‌ঝকে বুদ্ধি তাহার দন্তরুচি-কৌমুদী বিকাশ পূর্বক মানুষের হৃদয় নামক একটি 'প্যানপেনে' জিনিসের প্রতি

যতই অবজ্ঞার ধূলি নিক্ষেপ করুক না কেন, মানুষের বুকের ভিতর হইতে হৃদয় জিনিসটিকে এখন পর্যন্তও তুলিয়া ফেলা সম্ভব হয় নাই; এবং বুদ্ধির চোখ-ঝলসানো হিরণ্ময় রশ্মিসমূহকে একটু সংহত করিতে পারিলেই দেখিতে পাইব, সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা আজিও হৃদয়ের ক্ষেত্রে।

ধার-ভারের কদর এবং আদর বুদ্ধির কাছে,—হৃদয় যাহা চাহে তাহা যে কি তাহা স্পষ্ট করিয়া না বলিতে পারিলেও এইটুকু বলা যায়,—তাহা সংসারের এই ধার-ভারের অতিরিক্ত কিছু। বুদ্ধির গ্রহণ-প্রণালী এবং হৃদয়ের গ্রহণ-প্রণালীর ভিতরেও একটা তফাৎ আছে। বুদ্ধি যাহাকে গ্রহণ করে তাহা হইতে নিজেকে সে রাখে পৃথক্ করিয়া, কিন্তু হৃদয় যাহাকে গ্রহণ করে সেখানে গ্রাহ্য এবং গ্রাহকের ভিতর কোথাও নাই এতটুকু ব্যবধান,—যাহাকে পাইতে হইবে তাহার সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলিত হইয়া—তাহার সহিত সর্বাংশে এক হইয়া হৃদয় তাহাকে গ্রহণ করে। বিষয়ের সহিত সৌন্দর্যে-প্রেমে একেবারে এক হইয়া যে গ্রহণ তাহাই যথার্থ সাহিত্যের গ্রহণ।

রচনা-সাহিত্যের স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে এই সকল কথা বলিবার কারণ এই, আমরা সাধারণতঃ উৎকৃষ্ট রচনা-সাহিত্য বলিয়া যে সকল লেখার সমাদর করি সেগুলি হয়ত উৎকৃষ্ট, কিন্তু সাহিত্য নয়। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধিৎসা, দার্শনিক গবেষণা, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অতি মূলবান্, সুতরাং শ্রদ্ধার বস্তু সন্দেহ নাই; কিন্তু আমাদের সমস্ত রকমের মূল্যবোধের ভিতরে শুধু যে একটা পরিমাণগত ভেদ নহে একটা যে প্রকারগত ভেদও রহিয়াছে সেই কথাটা আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই। এই ভুলের জন্যই আমরা প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য, দার্শনিক মূল্য বা বৈজ্ঞানিক মূল্য এবং সাহিত্যিক মূল্য যে একই জাতীয় মূল্য নয় এ সত্যটি সম্বন্ধেও সচেতন থাকি না। রচনা-সাহিত্যের ভিতরে আমরা সাধারণতঃ ভাল বলি সেইগুলিকে যেখানে কোন লেখা তত্ত্ব, তথ্য এবং যুক্তিতর্কের নিখুঁত সমাবেশে একেবারে জমজমাট হইয়া উঠিয়াছে। তত্ত্ব, তথ্য এবং যুক্তিতর্কের নিপুণ সমাবেশে একটা লেখা অতি মূল্যবান্ হইয়া উঠিতে পারে সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই মূল্যের সহিত সাহিত্যের মূল্যের একটা আশমান-জমিন তফাৎ থাকিতে পারে।

আমাদের বাস্তব জীবনে দেখিতে পাই, আমাদের দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি এবং আমাদের মানসিক বৃত্তিগুলির প্রত্যেকটির একটি একটি ভিন্ন ধর্ম রহিয়াছে; কিন্তু এই ধর্মবৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও তাহাদের সকলের ভিতর আবার

একটা সূক্ষ্ম অন্বয়ও রহিয়াছে, যে অন্তর্নিহিত অন্বয়ের ফলে সকল দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং মানসিক বৃত্তিগুলি তাহাদের বিশিষ্ট ধর্মগুলি পালন করিয়া পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে না, বা পরস্পর বিরোধী হইয়া উঠিতেছে না; তাহাদের পরস্পরের ভিতরে এই গভীর অন্বয় আছে বলিয়াই সকলের কাজের ফলে আমাদের দেহ-মন একটা অখণ্ড বিকাশের পথে ধাবিত হইতেছে। আমাদের স্থূল অঙ্গ এবং বৃত্তিগুলির ভিতরেই শুধু নহে,—আমাদের সূক্ষ্ম অঙ্গ এবং বৃত্তিগুলির ভিতরেও রহিয়াছে এই জাতীয় একটা গভীর অন্বয়; আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি এবং হৃদয়বৃত্তি তাহাদের স্বাতন্ত্র্য এবং স্বগুণ রক্ষা করিয়াও তাই পরস্পরে গভীর ভাবে অন্বিত। আমাদের জীবনের সমগ্রতা জুড়িয়া যে একটি ব্যাপক সংগঠনপদ্ধতি রহিয়াছে তাহার ভিতরে হৃদয় এবং মস্তকের মধ্যে কোনও বিরোধ ত নাই-ই, তাহারা পরস্পর পরস্পরের ঘনিষ্ঠ। এই জন্যই সাহিত্যের ক্ষেত্রেও আমাদের বুদ্ধির উপাদান ও রসের উপাদানের ভিতরে আছে একটা গভীর অন্বয়। এই অন্বয়ের ফলেই আমরা কাগজে কলমে যেমন করিয়া আমাদের বিভিন্ন মূল্যবোধগুলির ভিতরে পার্থক্যের রেখা টানিতে পারি, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাহা কখনই পারি না। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমাদের এই সকল মূল্যবোধ একে অন্যের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে এবং অনেক সময়ই অলক্ষ্য ভাবে তাল পাকাইয়া থাকে,—তাহাদের ভিতরে কোনও একটিকে চিনিতে পারি সাধারণতঃ তাহার প্রাধান্য দেখিয়া। আমাদের সাহিত্যের আদালতে যত বিচার-বিভ্রাট ঘটে তাহার মূল কারণ এই মূল্যবোধের অসাবধান বিভ্রম। আদিযুগ হইতে আজ পর্যন্ত কামায়ন হইতে রসায়ন—সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই সকলেরই যে অবাধ প্রবেশাধিকার তাহার কারণও অনেকখানি ইহাই। কাম আমাদিগকে আনন্দ দেয়, জ্ঞান আমাদিগকে আনন্দ দেয়—সাহিত্যও আমাদিগকে আনন্দ দেয়;—জীবনের বৃহত্তর পরিধিতে ইহাদের সকলেরই রহিয়াছে প্রয়োজন, তাই তাহাদের প্রত্যেকেরই রহিয়াছে একটা বিশিষ্ট মূল্য; কিন্তু এই বিভিন্নজাতীয় আনন্দবোধ এবং মূল্যবোধের ভিতরে যে একটা প্রকারগত ভেদ রহিয়াছে তাহাকে আবিষ্কার এবং অনুভব না করিতে পারিলে আমরা সাহিত্যের বিচারে কোন দিনই নির্ভুল হইতে পারিব না।

সুতরাং রচনা-সাহিত্যের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি ফিরাইতে হয় গোটা কয়েক গোড়ার কথার দিকে। ভাল রচনা-সাহিত্য কাহাকে বলে তাহা জানিতে গেলে প্রথমে স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে হয় সাহিত্য

কাহাকে বলে। আমার বিশ্বাস, রচনা-সাহিত্য কি তাহা যে আমরা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারি না তাহার কারণ, সাহিত্য কি তাহ'ই আমরা স্পষ্ট করিয়া বুঝি না। সাহিত্যের স্বরূপ-লক্ষণ সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ধারণা লইয়া যে-কারণে সাহিত্যের শ্রীক্ষেত্রে আমরা 'বার জাতে'র অবাধ মেলা বসাই, সেই কারণেই রচনা-সাহিত্যের নামে কোন্ গন্থ লেখাকে যে না চালান যায় তাহাই আমরা দিশা করিয়া উঠিতে পারি না।

এই প্রসঙ্গে আর একটি জিনিস লক্ষণীয়। আমাদের ভিতরে সাধারণতঃ একটা ধারণা দেখা যায় যে, রচনাসাহিত্যের স্বরূপ-ধর্ম এবং কাব্য-কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতির স্বরূপ-ধর্মের ভিতরে একটা মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। আমাদের এই ভুল ধারণার মূল কারণ, আমরা রচনা-সাহিত্যের সত্যকার সীমানাকে প্রায় কখনই নির্দিষ্ট করিয়া লই না; তাহার ফলে বহু অ-সাহিত্যও রচনা-সাহিত্যের নাম লইয়া রচনা-সাহিত্যেরই স্বরূপ-বৈলক্ষণ্য জন্মাইয়া থাকে। আসলে সাহিত্য হিসাবে রচনা-সাহিত্য, কাব্য-কবিতা, উপন্যাস-নাটক প্রভৃতির ভিতরে কোথাও কোন মৌলিক পার্থক্য নাই। তাহাদের বিভিন্ন রূপের পশ্চাতে লুকাইয়া আছে একই স্বরূপ। সাহিত্যের স্বরূপ-লক্ষণের দিকে আমরা যদি দৃষ্টিপাত করি তবে দেখিতে পাইব, যে-স্বরূপ-ধর্মের জন্য একটি ক্ষুদ্র গীতি-কবিতা সাহিত্য পদবাচ্য, মৌলিক সেই ধর্মের জন্যই একখানি উপন্যাস বা নাটক সাহিত্য পদবাচ্য এবং সেই স্বরূপ-ধর্মের জন্যই একটি ভাল গন্থ রচনাও সাহিত্য পদবাচ্য। আকার-গত পার্থক্যকেই আমরা সাধারণতঃ স্বরূপগত ভেদ বলিয়া ভুল করি। গন্থ-সাহিত্য ও পদ্য-সাহিত্যের ভিতরে একটা মৌলিক পার্থক্য চিরাচরিত ভাবে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কবি ও লেখক এ বিষয়ে তাঁহাদের আপত্তি জানাইয়া রাখিয়াছেন বটে, তথাপি মোটের উপরে এ-ভেদটিকে আমরা স্বীকার করিয়াই আসিতেছি। অবশ্য উপর উপর বিচার করিলে এই-জাতীয় একটি ভেদ-রেখাকে আমরা একেবারে অস্বীকার করিতে পারি না, কিন্তু সাহিত্যের অন্তর্নিহিত স্বরূপ-লক্ষণের ভিতরে গভীর ভাবে প্রবেশ করিলে এই ভেদরেখা একটু একটু করিয়া কখন যে মিলাইয়া যায় তাহা বুঝিয়া ওঠা যায় না। আমরা ভবিষ্যতে যখন এ বিষয় লইয়া আরও বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিব তখন দেখিতে পাইব, সাহিত্যের ইতিহাস যত ক্রমাবর্তিত হইতেছে গন্থ-রচনা ও পদ্য-রচনার ভিতরকার আমাদের এই কাল্পনিক ভেদরেখা ততই

অস্পষ্ট হইয়া মিলাইয়া যাইতেছে। বর্তমান যুগে যত কাব্য-কবিতা রচিত হইতেছে এবং গদ্য-রচনা লেখা হইতেছে তাহাদিগকে পাশাপাশি রাখিয়া বিচার করিলে দেখিতে পাইব,—নদী আপনার সীমা অতিক্রম করিয়া শ্যামল মাঠের ভিতরে অনেকখানি ছড়াইয়া পড়িয়াছে, আবার চড়ার রূপ ধারণ করিয়া শ্যামল মাঠ নদীর অনেকখানি জুড়িয়া বসিয়া আছে।

সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে, যে কোন আকারের সাহিত্যই হোক না কেন, তাহার স্বরূপ-ধর্ম আবিষ্কার করিতে হইলে আগে সাহিত্যের স্বরূপ-ধর্ম সম্বন্ধেই সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। সাহিত্যের এই স্বরূপ-ধর্ম আবিষ্কার করিতে গিয়া আমি এখানে বিতর্কাত্মক মতামতের মহাভারত সঙ্কলন করিতে চাহি না। শুধু দুই একটি মৌলিক কথারই আলোচনা করিতে চাই।

সাহিত্যের স্বরূপ-লক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া এক দল প্রাচীন আলঙ্কারিক বলিয়াছেন যে ধ্বনিই হইতেছে কাব্যের বা সাহিত্যের আত্মা।* এই ধ্বনির স্বরূপ কি? সে আমাদের বক্তব্যকে সর্বদাই অতিক্রম করিয়া যাইতে চায়। আমরা যাহা কিছু বলি—যাহা কিছু লিখি তাহার মুখ্যার্থকে ধ্বনি শুধু অতিক্রম করিয়াই যায় না,—আমাদের বক্তব্যকে সে গৌণ করিয়া দিয়া প্রধান করিয়া তোলে একটা অকথিত মাধুর্য এবং মহিমাকে। একটু নিবিষ্ট মনে চিন্তা করিলেই দেখিতে পাইব, আমাদের যাহা কিছু সাহিত্য-সৃষ্টি তাহার স্বরূপ-ধর্মই এই যে, সে আমাদের বাচ্যার্থকে সর্বদাই অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে অনেক দূরে—অনেক গভীরে। আমাদের সমস্ত বলার ভিতরে বলাগুলি যেন কখন কোথায় পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে—তাহার ভিতর দিয়া আভাসে-ইঙ্গিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে কত না-বলা কথা। না-বলা যে কথাটা ধ্বনিত হইয়া মুখ্য হইয়া দাঁড়ায়, তাহাই সাহিত্যের লক্ষ্য, বলা কথাগুলি যেন উপলক্ষ্য মাত্র।†

আমাদের রচনা-সাহিত্যকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব, একটু গভীর এবং ব্যাপক অর্থে এই ধ্বনিই সত্যিকার রচনা-সাহিত্যের প্রাণবস্তু। আমাদের কোন লেখার ভিতরে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রধান হইয়া উঠিবে কতগুলি

---

* প্রাচীনেরা যে ব্যাপক অর্থে 'কাব্য' শব্দের ব্যবহার করিতেন, সেই ব্যাপক অর্থে আমরা আজকাল 'সাহিত্য' শব্দটি ব্যবহার করি; আমি তাই প্রাচীনদের 'কাব্য' শব্দের পরিবর্তে বর্তমানে প্রচলিত এই 'সাহিত্য' শব্দটিরই ব্যবহার করিব।

† দ্রষ্টব্য—এই লেখকের 'সাহিত্যের স্বরূপ', তৃতীয় সংস্করণ,—পৃঃ (৯৯—১০৩)

তত্ত্ব বা তথ্য, আমাদের মন যতক্ষণ প্রধানভাবে আকৃষ্ট হইবে যে সকল যুক্তিতর্কের অবতারণা করা হইয়াছে তাহার নৈয়ায়িক যাথার্থ্য, সারবত্তা এবং সূক্ষ্মত্বের প্রতি,—ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাকে আমরা খাঁটি রচনা-সাহিত্য বলিব না। সে লেখার ভিতরে আমরা লাভ করি যে সংবাদ, যে জ্ঞান, চিন্তার যে প্রসারক্ষেত্র তাহা আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে বটে, কিন্তু আমাদের সাহিত্যিক মনের সেখানে গভীর তৃপ্তি নাই। এই সকল তত্ত্ব, তথ্য, বা যুক্তিতর্ক যে কখনও সাহিত্যের সামগ্রী হইয়া উঠিতে পারে না এমন কথা বলা যায় না; তাহাদিগকে সাহিত্যের সামগ্রী হইয়া উঠিতে হইলে তাহাদিগকে নিজেদের একেবারে গৌণ করিয়া দিতে হইবে,—প্রধান করিয়া তুলিতে হইবে এই সকল তত্ত্ব, তথ্য, পাণ্ডিত্য-যুক্তিতর্কের অতিরিক্ত আর একটি জিনিসকে—তাহাদের ভিতরে বাচ্যার্থের অতিরিক্ত থাকিতে হইবে একটি ধ্বনি। জগতের শ্রেষ্ঠ রচনা-সাহিত্যের ইতিহাস খুঁজিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাইব, শ্রেষ্ঠ রচনাকারগণের ভিতরে অনেক চিন্তাশীল মনীষী ছিলেন; কিন্তু এই চিন্তাশীল পণ্ডিত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রচনাকারগণের মধ্যে তথাকথিত অপণ্ডিতের সংখ্যাই ছিল বেশী। আর যে সকল পণ্ডিতগণের রচনা সাহিত্য হিসাবে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে তাঁহাদের রচনার ভিতরে তাঁহাদের পাণ্ডিত্য বা চিন্তাশীলতাই প্রধান হইয়া ওঠে নাই,—প্রধান হইয়া উঠিয়াছে পাণ্ডিত্য এবং চিন্তাশীলতার অতিরিক্ত আর একটি জিনিস। একটি প্রত্নতাত্ত্বিক রচনা, একটি দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক রচনা এবং একটি যথার্থ সাহিত্যিক রচনার ভিতরে আমরা সর্বদা এই পার্থক্য লক্ষ্য করিতে পারি যে, পূর্বোক্ত লেখক যাহা লেখেন তাঁহাদের লেখা সেই লেখার অতিরিক্ত আর কিছুই বলে না। প্রত্নতাত্ত্বিক যদি দুর্গম পাহাড়ের গাত্র পরীক্ষা করিয়া, অথবা ভূপ্রোথিত প্রাচীন ভগ্নাবশেষের আবিষ্কার করিয়া অথবা হাজার হাজার বছরের কোনও দলিল-দস্তাবেজ খুঁজিয়া পাতিয়া কোনও নূতন তথ্যের সন্ধান পাইয়া থাকেন, তবে তাঁহার লেখার ভিতরে এই সন্ধানের সুষ্ঠুতম পরিচয়ই হইয়া উঠিবে প্রধান,—তদতিরিক্ত কিছু যদি তাহার লেখায় থাকে প্রত্নতাত্ত্বিক রচনা হিসাবে তাহা গুণের না হইয়া দোষের হইয়া থাকে। ঐতিহাসিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক সকলের ক্ষেত্রেই এই এক কথা। তাঁহারা যে তথ্য বা তত্ত্বের পরিবেশন করেন সেইখানেই তাঁহাদের কাজ নিঃশেষে ফুরাইয়া যায়; কিন্তু সাহিত্যিকের ধর্ম শুধু এইটুকু নহে, তিনি যদি প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস, দর্শন,

বা বিজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া কোন রচনা লেখেন সেখানে বলার কথাকে তিনি জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে অনেকখানি ছাড়াইয়া গিয়াছেন এবং তিনি যতখানি ছাড়াইয়া যাইতে পারিয়াছেন সাহিত্য হিসাবে তাঁহার রচনা ততখানি সার্থক হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু আমরা সাহিত্যের ভিতরে কথা-বস্তু বা বিষয়-বস্তুর অতিরিক্ত যে একটি ধ্বনির কথা বলিলাম, সেই ধ্বনিরই বা স্বরূপ কি? সাহিত্যে লেখক বা কবি সর্বদা বাচ্যার্থকে ছাড়াইয়া যান কিসের আয়োজনে? সহজ কথায় বলিতে গেলে, এ আয়োজন আনন্দের আয়োজন, আলঙ্কারিকেরা যাহার নাম দিয়াছেন রস। আলঙ্কারিকেরা তাই বলিয়াছেন যে, রসধ্বনিই হইল যথার্থ ধ্বনি এবং এই রসধ্বনিই সাহিত্যের আত্মা। অতিপুরাতন কথা হইলেও ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই 'রসাত্মকং বাক্যম্'—এই সংজ্ঞাতে আসিয়াই পৌছিতে হয়। সাহিত্য সর্বদাই তাহার বক্তব্যকে ছাড়াইয়া যায় এই রসের পরিবেশনের জন্য। সাহিত্যে কথা-বস্তু বা বিষয়-বস্তুর তাই কোথাও কোন স্বতন্ত্র মাহাত্ম্য নাই,—তাহার সকল মাহাত্ম্য রস-পর্যবসানতায়।

আমরা শুধু সাহিত্য নয়, আমাদের জগৎ এবং জীবনের দিকে ফিরিয়া তাকাইলেও এই সত্যকে আবিষ্কার করিতে পারিব। কোন বস্তু বা ঘটনার রসসত্তা তাহার প্রাতিভাসিক বহিঃসত্তাকে সর্বদাই বহু দূরে ছাড়াইয়া যায়। যে-বস্তু বা যে-ঘটনা আমাদের মনের কাছে তাহার বাহিরের রূপটিকে লইয়াই প্রধান হইয়া উঠিতে চায় তাহাকে আমরা আদর করিয়া ডাকিয়া আনিয়া বহু কাজে লাগাই, কিন্তু তাহাকে লইয়া রসের কারবার চলে না; আর যে বস্তু বা ঘটনা আমাদের কাছে আসিয়া দেখা দেয় তাহার রসমূর্তিতে একটু চাহিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব তাহার বাহিরের রূপ তলাইয়া পড়িয়াছে কতদূরে—অনেকখানিই স্মৃতিমাত্র রূপে সে হয়ত অবস্থান করিতেছে যবনিকার অন্তরালে, নিজের বহির্মূর্তিকে অপ্রধান করিয়া আড়ালে ঢাকিয়া রাখিয়া ভাবনার অনুরণনে সে দূরে দূরে ছড়াইয়া দেয় অন্তরের সুগন্ধ।

রচনাকেও যথার্থ সাহিত্য হইতে হইলে তাহার ভিতরে চাই এই রসধ্বনি; অর্থাৎ সে তাহার বক্তব্যকে অনেকখানি ছাড়াইয়া যাইবে এবং তাহা রসের আয়োজনে। এ-জাতীয় রচনা দুর্লভ, সাহিত্যের ক্ষেত্রের সার্থক রচনা-সাহিত্যও তাই একান্ত দুর্লভ। সার্থক রচনা-সাহিত্যের বিরলতার অন্যান্য সব কারণের ভিতরে একটি সাধারণ কারণ এই যে, চিরাচরিত ভাবে আমরা

সাহিত্যে গদ্যের ব্যবহারক্ষেত্র অনেকখানি সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছি। যেখানে বক্তব্যকেই বড় করিয়া তুলিবার প্রয়োজন সাধারণতঃ শুধু সেই সব ক্ষেত্রেই আমরা গদ্যের ব্যবহার করি ; বাচ্যাতিরিক্ত সৌন্দর্য-মাধুর্য প্রকাশের জন্য, বা এক কথায় রসপরিবেশনের জন্য আমরা সাধারণতঃ কাব্য-কবিতারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকি। গদ্যকে আমরা সাধারণতঃ একটা কাটাছাটা আপিসওয়ালা কেজো পুরুষের রূপ দিয়া লইয়াছি। কিন্তু ছন্দ না দিয়াও নিছক গদ্যেই যে নিছক কবিতাও রচনা করা যায় এ বিশ্বাস এবং অভ্যাসটি আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে অপেক্ষাকৃত আধুনিক। আমরা পূর্বেই আভাস দিয়াছি এবং পরে আরও বিশদভাবে দেখিতে পাইব যে একজন রচনাকারও মূলতঃ একজন কবি, এবং সত্যকারের একটি সাহিত্যিক রচনা ব্যাপক অর্থে একটি গদ্য-কবিতা। আমাদের একটা সাধারণ ধারণা এই যে, সাহিত্য সৃষ্টির ভিতরে সব চেয়ে সহজ জিনিস এই রচনা-সাহিত্য ; কিন্তু শুনিলে হয়ত অনেকেরই অদ্ভুত লাগিবে যে রচনা সাহিত্য-সৃষ্টির ভিতরে সব চেয়ে কঠিন এবং সাহিত্যের ইতিহাসে এই জাতীয় সাহিত্যেরই নমুনা পাওয়া যায় সব চেয়ে কম।* আমাদের প্রচলিত বিশ্বাসের কারণ পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, রচনা-সাহিত্যের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা এবং সঠিক ক্ষেত্র সম্বন্ধে আমরা কোনও দিনই অবহিত নই। বহু যুগ ধরিয়া রচনা-সাহিত্যের শিরোনামা লইয়া এত হরেক রকমের লেখা প্রচলিত রহিয়াছে যে, তাহার ভিতর হইতে সাহিত্য এবং অসাহিত্য ভাগ করিয়া লওয়া দায়। মোটের উপরে সুবিশুদ্ধ ভাষায় যুক্তিতর্ক সমন্বিত হইয়া যাহা প্রকাশিত হয় তাহার উপরেই আমরা অসতর্ক ভাবে রচনা-সাহিত্যের লেবেল আঁটিয়া দিয়া আসিতেছি।

আমি এখানে 'রচনা' শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। ইংরেজিতে যাহাকে Essay Literature বলা হয়, সেই অর্থেই আমি 'রচনা-সাহিত্য' শব্দটির প্রয়োগ করিয়াছি। এই অর্থে আমরা বাঙলায় রচনা, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, সন্দর্ভ প্রভৃতি কতগুলি নাম তাহাদের নিজস্ব অর্থ বৈশিষ্ট্য উপেক্ষা

* It is strange that the essay, which at first sight looks the easiest and most natural thing in the world to write, has so seldom achieved excellence. Yet it is an indisputable fact that the greatest essayist like the greatest letter-writer, is rare even than the great poet."—এলিজাবেথ ড'রলি কর্তৃক সঙ্কলিত "ইঙ্‌লিশ্‌ এসেস্‌" (English Essays) গ্রন্থের রবার্ট্‌ লিণ্ড্‌ লিখিত ভূমিকা।

করিয়া প্রয়োগ করিয়া থাকি। কিন্তু নাম ব্যবহারে এই অসতর্কতা আমাদের অনেক ভুল ধারণার মূলীভূত কারণ। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক বেকন আমাদের এই ভাষা ব্যবহারের শিথিলতাকে Idol of the Market বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে জগতের বহু দার্শনিক সিদ্ধান্তের ভ্রান্তির মূলে রহিয়াছে ভাষা প্রয়োগের ভুল। সুতরাং ইংরেজী Essay শব্দটির সমর্থক হিসাবে আমরা যে শব্দগুলির ব্যবহার করি তাহার সুস্পষ্ট অর্থ সম্বন্ধে একটু আলোচনা হওয়া দরকার।

আমরা Essay শব্দের অর্থে বাঙলায় যে শব্দটির খুব বেশী ব্যবহার করি সে শব্দটি হইতেছে প্রবন্ধ ; কিন্তু Essay শব্দটি এবং প্রবন্ধ শব্দটি ঠিক সমার্থক নহে। প্রবন্ধ শব্দটির প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থ হইতেছে 'প্রকৃষ্ট বন্ধন'। কোনও একটি প্রকৃষ্টবন্ধন-যুক্ত রচনাকেই প্রবন্ধ বলা হইয়া থাকে। প্রবন্ধ পদ্য রচনাও হইতে পারে। এই প্রকৃষ্ট বন্ধন নানা প্রকারের হইতে পারে। ছন্দের বন্ধন হইতে পারে, সর্গ-অধ্যায়াদির বন্ধন হইতে পারে, বিষয় বস্তুর অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধরূপ-বন্ধন হইতে পারে, বর্ণনার পারম্পর্য রূপ বন্ধন হইতে পারে—আবার বহু-বাক্যাদির ভিতরকার যুক্তিতর্কের নৈয়ায়িক অন্বয়রূপ বন্ধনও হইতে পারে। এইরূপ বিভিন্ন প্রকারের বন্ধনের দ্বারা সুসংবদ্ধ গদ্য-পদ্য সমস্ত রচনাকেই সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ প্রবন্ধ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এই অর্থে রামায়ণ, মহাভারত, মালতীমাধব, রত্নাবলী প্রভৃতি সকল কাব্য রচনাকেই প্রবন্ধ বলা হইয়াছে।* বিভিন্ন প্রকারে গ্রথিত সাহিত্য যেমন প্রবন্ধ শব্দের দ্বারা উপলক্ষিত হইয়াছে, রচনা-বৈশিষ্ট্য বা গ্রন্থন-বৈশিষ্ট্যকেও প্রবন্ধ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। শব্দগত, অর্থগত, বর্ণনাগত, ঘটনা-সন্নিবেশগত যে যে বিশিষ্ট ধর্মের দ্বারা বিভিন্ন জাতীয় সাহিত্য উপলক্ষিত হয় সাধারণ ভাবে সেই সকল বিশিষ্ট ধর্মসমষ্টিকেই সেই সেই জাতীয় সাহিত্যের প্রবন্ধ বলা যাইতে পারে। যেমন নাটকের ভাষা-ব্যবহার, রীতি-ব্যবহার, তাহার পঞ্চসন্ধি-সমন্বিত গর্ভ-গর্ভাঙ্কে বিভক্ত গঠন-রীতি—তাহার সমগ্র আঙ্গিক প্রভৃতি লইয়া যে একটি রচনা-বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে, আমরা তাহারই নাম দিতে পারি নাট্য-প্রবন্ধ। একখানি নাটকের ভিতরে তাহার ভাষা, ভাব, গঠন-রীতি, ঘটনা-সন্নিবেশ প্রভৃতি সকলের ভিতরেই থাকা চাই একটি সূক্ষ্ম সঙ্গতি,—এই অন্বয় বা

* প্রবন্ধে যথা মহাভারতে শান্তঃ, রামায়ণে করুণঃ মালতীমাধবরত্নাবল্যাদৌ শৃঙ্গারঃ। এবমন্যত্র।—সাহিত্যদর্পণ, চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সঙ্গতিকেই বলা যাইতে পারে প্রবন্ধৌচিত্য *। 'বক্রোক্তি-জীবিত'-কার কুন্তক তাঁহার গ্রন্থের চতুর্থ উন্মেষে 'প্রবন্ধ-বক্রতা' সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। সেখানে তিনি বলিয়াছেন যে, ইতিহাসাদিতে বর্ণিত একই ঘটনা বা একই নায়ক-নায়িকা বিভিন্ন প্রবন্ধে প্রবন্ধৌচিত্যবশে এবং নব নব চারুত্ব এবং রস সম্পাদনের সৌকর্যার্থে কবি-প্রতিভার দ্বারা বিভিন্নরূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। এ-সকল ক্ষেত্রে সুপ্রসিদ্ধ ইতিবৃত্তাদি হইতে কবির যে স্বেচ্ছাকৃত স্খলন অথবা সেই সকল ইতিবৃত্তাদির যে রূপান্তর তাহা প্রবন্ধাদির দোষের কারণ হয় না, তাহা প্রবন্ধের বক্রতা বা বৈচিত্র্য-জনিত চারুতাই বৃদ্ধি করে। †

প্রবন্ধ রচনার ভিতরে তাহার প্রত্যেকটি উপাদান এবং অংশ পরস্পরের সহিত এমন ভাবে অন্বিত বলিয়া এবং এই সকল পৃথক্ পৃথক্ উপাদান এবং অংশ আবার সমগ্রকাব্যের সহিত অন্বিত বলিয়া সমগ্র প্রবন্ধটির কাছে তাহার সকল অংশ ও উপাদান আত্মসমর্পণ করে। সকল জুড়িয়া একটা বিশেষ প্রবাহ বা পরিণতিই প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য। এইজন্য প্রবন্ধের অন্তর্গত বিশেষ কোন অংশ যদি নীরসও হয় তবে সেই অংশকে আমরা পৃথক্ ভাবে বিচার করিয়া অকাব্য বলিয়া বিবেচনা করি না; কারণ সে-ক্ষেত্রে সমগ্র প্রবন্ধের রসের দ্বারাই সেও কাব্যপদবাচ্য হইয়া ওঠে।‡

একটু লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইব, প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য-নাটকাদির এই প্রবন্ধ-লক্ষণের সহিত এরিষ্টটল্-বর্ণিত কাব্য-নাটকাদির লক্ষণের বেশ মিল

* যেমন সাধারণ আলঙ্কারিক নিয়ম এই যে, রৌদ্ররসের প্রকাশের জন্য দীর্ঘ সমাসযুক্ত শব্দের ব্যবহার করা সঙ্গত; কিন্তু নাটকে রৌদ্ররসের ক্ষেত্রেও দীর্ঘসমাসযুক্ত শব্দের ব্যবহার করা উচিত নহে, কারণ তাহা দ্বারা অভিনয়ের প্রতিকূলতা সাধন হয়; সুতরাং প্রবন্ধৌচিত্য হেতু এখানে রৌদ্ররসেও অনতিদীর্ঘ সমাসবদ্ধ শব্দের ব্যবহারই সঙ্গত। এইরূপ প্রবন্ধৌচিত্য হেতু আখ্যায়িকার শৃঙ্গাররসের বর্ণনায়ও মসৃণবর্ণের ব্যবহার নিষিদ্ধ,—কথা-সাহিত্যে রৌদ্ররসেও অত্যন্ত উদ্ধত বর্ণনাদির ব্যবহার নিষিদ্ধ।

† যেমন ভট্টনারায়ণের 'বেণী-সংহার' এবং ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' যথাক্রমে মহাভারত এবং রামায়ণ হইতে গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু উভয় গ্রন্থেই প্রবন্ধের বক্রতা বা বৈচিত্র্যজনিত চারুত্বের অনুরোধে ইতিবৃত্তকে রূপান্তরিত করা হইয়াছে, মূল রসও পরিবর্তিত করা হইয়াছে; মহাভারত এবং রামায়ণের মূল রস 'শান্ত'রস, কিন্তু 'বেণীসংহারে'র মূলরস 'বীর'রস এবং 'উত্তররাম-চরিতে'র 'করুণ'।

‡ রসবৎপদ্যান্তর্গতপদানামিব পদ্যরসেন প্রবন্ধরসেনৈব তেষাং রসবত্তাঙ্গীকারাৎ।—সাহিত্য-দর্পণ, প্রথম পরিচ্ছেদ।

রহিয়াছে। তিনিও সমগ্র কাব্যের ভিতরে একটা দৃঢ় ঐক্য—প্রত্যেক অংশের পরস্পরের সহিত এবং সকল জুড়িয়া মূলের সহিত অন্বয় এবং মূল আখ্যান-বস্তু এবং মূল রসের ভিতরে সকল অংশের আত্মনিমজ্জনের কথা বলিয়া গিয়াছেন।

সাহিত্য-সৃষ্টির ভিতরে সর্বভাবে এবং সুষ্ঠুরূপে অন্বিত এইরূপ প্রবন্ধ দুর্লভ। রাজশেখর তাঁহার 'কাব্য-মীমাংসা' গ্রন্থে বলিয়াছেন,—

মুক্তকে কবয়োঽনন্তাঃ সঙ্ঘাতে কবয়ঃ শতম্।
মহাপ্রবন্ধে তু কবিরেকো দ্বৌ দুর্লভাস্ত্রয়ঃ॥ (১০ অঃ)

অর্থাৎ মুক্তক বা ইতিবৃত্ত রচনায় কবি অনন্ত; সঙ্ঘাতে অর্থাৎ প্রবন্ধ রচনায় কবি শতাধিক পাওয়া যায় না; আর মহাপ্রবন্ধে কবি একটি দুইটিই পাওয়া যায়, তিনটি দুর্লভ। এই প্রসঙ্গে রাজশেখর আরও বলিয়াছেন যে 'অনুজ্ঝিতার্থ-সম্বন্ধ'ত্বই প্রবন্ধের প্রধান লক্ষণ। 'অনুজ্ঝিত' শব্দের অর্থ অপরিত্যক্ত; অর্থ-সম্বন্ধ কোনও রূপে পরিত্যক্ত বা ব্যাহত হয় নাই, এইরূপ রচনাকেই প্রবন্ধ বলা যাইতে পারে। রাজশেখর বলেন যে স্বেচ্ছামত রচিত সঙ্গতিরহিত অসমঞ্জস বাক্যসমূহকে প্রকীর্ণ বলা যাইতে পারে; কিন্তু অনুজ্ঝিতার্থসম্বন্ধ প্রবন্ধ দুর্লভ।—

বহ্বপি স্বেচ্ছয়া কামং প্রকীর্ণমভিধীয়তে।
অনুজ্ঝিতার্থসম্বন্ধো প্রবন্ধো দুরুদাহরঃ॥ (১০ অধ্যায়)

রীতি সম্বন্ধে বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া, গুণসমূহের কথা বিশেষ ভাবে গণনা করিয়া, শব্দার্থ সমূহে অবগাহন করিয়া এবং সুভাষিত মুদ্রার যথাযথ অনুসরণ করিয়াই নিবন্ধ বা প্রবন্ধ রচনায় প্রযত্ন করা উচিত; নতুবা এলোমেলো কতগুলি রচনাদ্বারা প্রবন্ধ রচনা হয় না। এই জাতীয় রচনা যে খুব কষ্টকর তাহার প্রধান কারণ এই, সঙ্গতি বা অন্বয়রহিত বহু কথা বলিতে বা রচনা করিতে মানুষের কোনও ক্লেশ নাই; কিন্তু অর্থবৎ অথচ বিচিত্র রকমের কথা সাধারণ মানুষের খুববেশী যোগায় না। আলঙ্কারিকগণ 'মহাবাক্য' শব্দটিকেও অনেক সময়ে প্রবন্ধ শব্দের সমার্থক হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন। পরস্পরে গভীর ভাবে অন্বিত বাক্য-সমুচ্চয়কে 'মহাবাক্য' বলে। এই অর্থে সমগ্র মহাভারতখানিকে একটি 'মহাবাক্য' বলা যাইতে পারে।

সংস্কৃতে 'প্রবন্ধ' শব্দের ব্যবহার সাহিত্যের ক্ষেত্রে বদ্ধ ছিল না; অন্যান্য

ক্ষেত্রেও ইহার ব্যবহার রহিয়াছে। তথ্য, যুক্তি ও সিদ্ধান্তের পরস্পর অন্বয়ের দ্বারা প্রকৃষ্টরূপ বদ্ধ লেখাকেও প্রবন্ধ বলা হইয়াছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রেই হোক বা দর্শনাদির ক্ষেত্রেই হোক আমরা মোটের উপরে দেখিতে পাই, কোন রচনার সকল অংশ ও উপাদান যখন কোনও একটা প্রকৃষ্ট বন্ধনের ভিতর দিয়া পরস্পর অন্বিত হইয়াছে এবং একটা সমগ্রতা লাভ করিয়াছে তখনই তাহা প্রবন্ধ আখ্যা লাভ করিয়াছে। পূর্বেই আমরা দেখিয়াছি যে, খাঁটি সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই বন্ধন বহু রকমের হইতে পারে। অন্যান্য ক্ষেত্রে তথ্যের সহিত তথ্যের পরস্পর অন্বয় এবং পারম্পর্য, যুক্তির সহিত যুক্তির অন্বয় এবং পারম্পর্য—এবং তথ্য ও যুক্তির পরস্পর অন্বয়—এবং সকল জুড়িয়া শেষ পর্যন্ত একটি সুসঙ্গত সিদ্ধান্তে গমন—ইহাই প্রবন্ধের বিশিষ্ট লক্ষণ।

'নিবন্ধ' শব্দটি সাধারণতঃ সংস্কৃত অলঙ্কার-গ্রন্থে বন্ধনযুক্ত রচনা অর্থেই গ্রহণ করা হয়; এই সাধারণ অর্থে প্রবন্ধ এবং নিবন্ধ শব্দ দুইটি অনেক ক্ষেত্রে সমার্থকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'গীতশব্দরত্নাকরে' নিবন্ধ শব্দের অর্থে বলা হইয়াছে,—"নিতরাং বন্ধঃ তাললয়াদিসহিতবন্ধনং যত্র।" গ্রন্থের বৃত্তি বা টীকাবিশেষ অর্থেও নিবন্ধ শব্দের ব্যবহার রহিয়াছে; বিশেষভাবে কোন কোন স্মৃতিগ্রন্থ সম্বন্ধীয় রচনা নিবন্ধ নামে খ্যাত।

'সন্দর্ভ' শব্দটি সম্ পূর্বক দৃভ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। দৃভ্ ধাতুর অর্থ গ্রন্থন, রচনা, সংগ্রহ, পরস্পর অন্বিত করিয়া সাজান। সম্যক্‌রূপে গ্রন্থন, রচন বা গ্রহণ এই অর্থেই সন্দর্ভ শব্দটি সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শব্দের সহিত শব্দের, অর্থের সহিত অর্থের, এবং শব্দের সহিত অর্থের সম্যক প্রকারে গ্রথিত হওয়াকেই সন্দর্ভ বলা যায়। এই অর্থে সন্দর্ভ শব্দ প্রবন্ধ ও নিবন্ধ শব্দের অনেক খানি সমার্থক। হেমচন্দ্র সন্দর্ভশব্দ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—'সন্দর্ভো রসনা গুম্ফঃ শ্রন্থনং গ্রন্থনং সমাঃ।' প্রবন্ধ ও নিবন্ধের ন্যায় পরস্পরের গূঢ়ান্বয়ই সন্দর্ভেরও বৈশিষ্ট্য। এই জন্যই অসঙ্গত বা অসমঞ্জস ক্রমরহিত বাক্য বা রচনাকে আমরা 'সন্দর্ভ-বিরুদ্ধ' বাক্য বা রচনা বলি; অন্যদিকে নিয়মিত ক্রমযুক্ত পরস্পর অন্বিত বাক্য বা রচনাকে আমরা 'সন্দর্ভ-শুদ্ধ' বাক্য বা রচনা বলি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে জীবগোস্বামীর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ষট্‌সন্দর্ভ' নামে খ্যাত। গ্রন্থারম্ভে জীব গোস্বামী বলিয়াছেন যে, এই সম্বন্ধে প্রাচীন একখানি গ্রন্থ ক্রান্তব্যুৎক্রান্তখণ্ডিত হইয়াছিল; তাহারই পর্যায় বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া তিনি এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন,—এই ক্রমযুক্ত সুসংবদ্ধ

রচনাকেই তিনি সন্দর্ভ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।* এই প্রসঙ্গে টীকাকার বলদেব বিদ্যাভূষণ বলিয়াছেন,—

গূঢ়ার্থস্য প্রকাশশ্চ সারোক্তিঃ শ্রেষ্ঠতা তথা।
নানার্থবত্ত্বং বেদ্যত্বং সন্দর্ভঃ কথ্যতে বুধৈঃ॥

গূঢ়ার্থের প্রকাশ, সারোক্তি, শ্রেষ্ঠতা, নানার্থবত্ত্ব এবং বেদ্যত্ব—এই সকল লক্ষণ-যুক্ত রচনা পণ্ডিতগণ কর্তৃক সন্দর্ভ বলিয়া কথিত হয়। গূঢ়ার্থ অর্থে সন্দর্ভ শব্দের ব্যবহার 'চৈতন্য-ভাগবতে'ও পাওয়া যায়।—

সঘনে ঢুলায় শির নাঢ়া নাঢ়া বোলে।
নাঢ়ার সন্দর্ভ কেহ না বুঝে সকলে॥
আবার—দ্বার দিয়া কীর্ত্তনের সন্দর্ভ জানিল॥ †

'রচনা' শব্দটি সাধারণতঃ নির্মাণ, সৃষ্টি, গঠন, গ্রন্থন, গুম্ফন, ভূষণ, স্থাপন, সন্নিবেশ, বিন্যাস প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গদ্য-পদ্যময় যে কোনও সাহিত্যিক সৃষ্টিকে রচনা বলা যাইতে পারে। 'অলঙ্কার-কৌস্তুভে' কবি কর্ণপূর বলিয়াছেন,—'অসাধারণচমৎকারকারিণী রচনা হি নির্মিতিঃ।'—অর্থাৎ অসাধারণ চমৎকারকারিণী রচনাই নির্মিতি। আলঙ্কারিক গ্রন্থে সাধারণ কাব্য-নির্মাণ অর্থেই রচনা শব্দের ব্যবহার বহুলভাবে পাওয়া গেলেও রচনা শব্দটির একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহারও পাওয়া যায়। শব্দের সুষ্ঠু বিন্যাসকেই অনেক স্থলে রচনা শব্দের দ্বারা বোঝান হইয়াছে। শব্দবিন্যাস বা শব্দগ্রন্থন-পারিপাট্য, পদযোজনা, রীতি প্রভৃতি বিশেষ অর্থেও রচনা শব্দের যথেষ্ট ব্যবহার পাওয়া যায়।

পূর্বেই বলিয়াছি, আমরা গদ্যময় সাহিত্যিক লেখা বুঝাইতে খুব ব্যাপকভাবে বাঙলায় প্রবন্ধ, নিবন্ধ, সন্দর্ভ এবং রচনা শব্দ প্রায় সমার্থকরূপেই ব্যবহার করিয়া থাকি। ইহার ভিতরে সাহিত্যিক মহলে 'প্রবন্ধ' এবং শিক্ষার্থী মহলে 'রচনা' শব্দটির ব্যবহার বেশী। হিন্দীতে এই অর্থে 'প্রবন্ধ' এবং 'সন্দর্ভ' শব্দের ব্যবহার থাকিলেও 'নিবন্ধ' এবং 'লেখ' কথা দুইটির ব্যবহার বেশী প্রচলিত।

---

* তস্যাদ্যং গ্রন্থনালেখং ক্রান্তব্যুৎক্রান্তখণ্ডিতম্।
পর্যালোচ্যাথ পর্যায়ং কৃত্বা লিখতি জীবকঃ॥
... ...
শ্রীভাগবতসন্দর্ভং সন্দর্ভং বশ্মি লেখিতুম্॥
(তত্ত্বসন্দর্ভ, ৫, ৭)

† দ্রঃ—জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের বাঙ্গলা অভিধান।

ওড়িয়ায় 'প্রবন্ধ' এবং অসমীয়াতে 'রচনা' শব্দের অধিক প্রচলন দৃষ্ট হয়। প্রবন্ধজাতীয় লেখা বাঙলা-সাহিত্যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে আরম্ভ হইয়াছে; উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই জাতীয় লেখা বুঝাইতে প্রবন্ধ শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায় না; প্রথমে এই জাতীয় লেখা বুঝাইতে 'প্রস্তাব' শব্দটির খুব প্রচলন ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে প্রবন্ধ কথাটির বহুল প্রচার আরম্ভ হয়। রামমোহন রায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি সে যুগের লেখকগণ নিজেদের ছোট বড় সকল লেখাকেই 'প্রস্তাব' নামে অভিহিত করিতেন। অক্ষয় দত্তের 'চারুপাঠে' ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রচনাগুলিকেও লেখক ক্ষুদ্র প্রস্তাব নামে অভিহিত করিয়াছেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রবন্ধ কথাটির ব্যবহার করিলেও 'প্রস্তাব' কথাটিরও ব্যবহার করিয়াছেন; বঙ্কিমচন্দ্রও প্রবন্ধ এবং প্রস্তাব দুইটি শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন।

মধ্যযুগের বাঙলায় কোনও এক প্রকারের প্রকৃষ্ট বন্ধন এই অর্থে প্রবন্ধ শব্দটির ব্যবহার কাব্য-কবিতার ক্ষেত্রে বহু পাওয়া যায়। যেমন 'পয়ার-প্রবন্ধ', 'লাচারী-প্রবন্ধ', 'পাঁচালী-প্রবন্ধ' প্রভৃতি। এখানে বিশেষ ছন্দোব্যবহার এবং কাব্য-রচনার ঢঙ এই অর্থে প্রবন্ধ শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রাচীন ও মধ্য-যুগের বাঙলায় প্রবন্ধ শব্দটির ব্যবহার সাহিত্যের কলা-কৌশল বা রচনা-কৌশল, বা কাব্যরচনার নানাবিধ প্রকার বুঝাইতেই সীমাবদ্ধ ছিল না,—সাধারণ ভাবে কোনও কাজের ছাঁদ, প্রকার, উপায়, কৌশল, চেষ্টা, আরম্ভ প্রভৃতি বুঝাইতেও প্রবন্ধ শব্দের বহুল ব্যবহার দেখা যায়।* উনবিংশ

---

* এ সব কাজের আজ্ঞে জাণিএ প্রবন্ধ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, তাম্বুলখণ্ড।
যতেক প্রবন্ধ সব জানহ আপণে। ঐ
কভো কেহো না কৈল যেন রস প্রবন্ধে॥ ঐ রাধাবিরহ।

সুন্দরি কানু মিলন ভেল ভঙ্গ।
নিশি-পতি-কাঁতি মলিন অব হেরিয়ে।
টুটল সব পরবন্ধ॥ গোবিন্দ দাস।
দ্বিজকুল-শবদ কতহুঁ পরবন্দ॥ পদকল্পতরু—৩০৬
হাট করি পরবন্ধ রাজা হৈলা নিত্যানন্দ ইত্যাদি। ঐ—২৩১৩
(এখানে অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠা অর্থে।)

রাধা-কর ধরি সুঘড়-শিরোমণি
নাচত কহই প্রবন্ধে যে॥ ঐ—১০৭২
আজ্ঞা মালা পাঞা মোর হইল আনন্দ।
তাহাই গ্রন্থের তবে করিল প্রবন্ধ॥ চৈতন্য-চরিতামৃত,
আদি লীলা, ৮ম পরিঃ।
(এখানে 'আরম্ভ' অর্থে; 'প্রবন্ধ' স্থলে 'আরম্ভ' এই পাঠান্তরও পাওয়া যায়।)

শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রবন্ধ শব্দটি সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা যোগরূঢ় অর্থে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। ইহার ব্যবহার গদ্যের ক্ষেত্রে সঙ্কুচিত হইল। তথ্যের অন্বয় এবং যুক্তিতর্কের ক্রমসংবদ্ধতার ভিতর দিয়া যে সকল গদ্য লেখা একটা প্রকৃষ্ট বন্ধন লাভ করিল তাহাকেই আমরা নাম দিলাম প্রবন্ধ। ইংরেজিতে যে-জাতীয় লেখাকে Treatise, Discourse বা Dissertation বলে আমাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের প্রস্তাব বা প্রবন্ধ তাহাই।

আমরা প্রবন্ধ শব্দের অর্থ ও ব্যবহার লইয়া যত আলোচনা করিয়াছি তাহার সকলের ভিতরেই এই একটি মূল লক্ষণ পাইয়াছি যে, তাহার সকল উপাদান ও অংশ পরস্পর অন্বিত এবং ক্রমবদ্ধ এবং তাহারা সমস্ত জুড়িয়া একটি রসের পরিণতি বা নৈয়ায়িক চিন্তাপ্রসূত সিদ্ধান্তের পরিণতি লাভ করে। আমাদের বাঙলা প্রবন্ধ-সাহিত্যে রসের পরিণতি অপ্রধান,—সিদ্ধান্তের পরিণতিই মুখ্যবস্তু। সকল প্রবন্ধের ক্ষেত্রেই ছোট হোক বড় হোক আমাদের একটি প্রতিপাদ্য থাকে। তথ্যপ্রমাণের যথাযথ সমাবেশে, ভাবে, ভাষায়, চিন্তার প্রাখর্যে, সমন্বয়ে এবং পরিচ্ছন্নতায় সেই প্রতিপাদ্যকে প্রতিষ্ঠিত করাই আমাদের প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এই প্রতিপাদ্য বস্তু প্রত্নতাত্ত্বিক হইতে পারে, ঐতিহাসিক হইতে পারে, ভৌগোলিক হইতে পারে, ধর্ম, রাষ্ট্র, সমাজ, সাহিত্য প্রভৃতি কিছু হইতেই তাহার বাধা নাই। হৃদয়গ্রাহী ভাষা ও রীতিতে যিনি তাঁহার প্রতিপাদ্যকে যতখানি সুস্পষ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন তিনিই তত বড় প্রবন্ধ-লেখক। প্রবন্ধের শ্রেষ্ঠত্ব নিকৃষ্টত্ব বিচারে রসধ্বনির প্রশ্ন একান্তই গৌণ, অনেক স্থলে সেটা প্রবন্ধের দৌর্বল্যরূপেই স্বীকৃত; বুদ্ধিলভ্য সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে স্থানে-অস্থানে হৃদয়ের প্রবেশাধিকার দিয়া বক্তব্যকে দুর্বল করিয়া কিছুই লাভ নাই। এই সকল কারণেই আমাদের প্রবন্ধ-সাহিত্য বলিতে 'মায় চণ্ডীপাঠ ইস্তক জুতা সেলাই' কিছুই বাদ পড়ে নাই, এবং এই জন্যই পূর্বেই বলিয়াছি যে প্রবন্ধ-সাহিত্য বলিয়া আমরা আমাদের সাহিত্যে যাহাদের বিশিষ্ট স্থান দেই, তাহা হয়ত অনেক ক্ষেত্রেই উৎকৃষ্ট বটে, কিন্তু সাহিত্য নহে।

পূর্বেই বলিয়াছি, নিবন্ধ ও সন্দর্ভ কথা দুইটি আমাদের আধুনিক বাঙলায় পূর্বব্যাখ্যাত প্রবন্ধ শব্দেরই সমার্থকরূপে ব্যবহৃত হয়। তবে সন্দর্ভ কথাটির 'সংগ্রহ' অর্থে ব্যবহার আমাদের সাহিত্যে রহিয়াছে,—যেমন, 'সাহিত্য-সন্দর্ভ', 'রচনা-সন্দর্ভ' প্রভৃতি। 'নিবন্ধ' শব্দটিকে আমরা দীর্ঘ প্রস্তাব বা দীর্ঘ প্রবন্ধ

অর্থেই ব্যবহার করি; ভবিষ্যতে আমরা আমাদের আলোচনায় এই অর্থেই শব্দটিকে ব্যবহার করিব।

রচনা শব্দটি আমাদের বাঙলায় সংস্কৃতের ন্যায়ই এখনও ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। মাল্য-রচনা, ভূষণ-রচনা, শয্যা-রচনা হইতে কবিতা, উপন্যাস, নাটক এবং প্রবন্ধ-রচনা আমাদের সবই চলে। কিন্তু রচনা শব্দটির এই ব্যাপক প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে রচনা শব্দটিরও একটি যোগরূঢ় অর্থ নির্দিষ্ট হইল। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে ভাষার পারিপাট্যে, ভাবের গাম্ভীর্যে এবং সঙ্গতিতে এবং চিন্তার পরিচ্ছন্নতায় সাজাইয়া গুছাইয়া যে সব গদ্য লেখা হইত বিশেষ করিয়া তাহাদিগকেই আমরা রচনা নাম দিতাম। পূর্বেই বলিয়াছি, ইংরেজি Essay শব্দের প্রতিশব্দ রূপে স্কুলপাঠ্য পুস্তকে এবং শিক্ষার্থিমণ্ডলেই এই শব্দটির ব্যবহার বেশী। বাঙলায় ইংরেজি Essay শব্দের প্রতিশব্দরূপে যে কয়েকটি শব্দ প্রচলিত আছে তাহার ভিতরে রচনা শব্দের প্রয়োগকেই আমরা সুষ্ঠুতম বলিয়া বিবেচনা করি। এইজন্যই আমরা আমাদের আলোচনায় ইচ্ছাপূর্বক রচনা কথাটির ব্যবহার করিতেছি। পূর্বেই বলিয়াছি যে নাটক, গল্প, উপন্যাস ব্যতীত সকল গদ্য লেখাই সাহিত্য নহে,—সাহিত্য একরূপ বিশেষ লেখা—সেই বিশেষত্বমণ্ডিত গদ্য লেখাকেই রচনা নাম দেওয়া যাইতে পারে। আমাদের রচনা শব্দটিকে বাছিয়া লইবার কারণ এই,—সাহিত্য—সে যে প্রকারেরই হোক না কেন—একটা সৃষ্টি বা নির্মিতি; কোন সৃষ্টি-ব্যাপার না হইলে কোন লেখাই কখনও সাহিত্য-পদবাচ্য হইতে পারে না। রচনা শব্দটির ভিতরে একটা সৃষ্টির কথা অনুস্যূত হইয়া আছে; রচনা বলিয়া সাহিত্যের শ্রেণীটির ভিতরেও যে একটা অসাধারণ চমৎকারিণী নির্মিতি রহিয়াছে, ঐ শব্দটির ভিতরেই তাহার বেশ একটা ইঙ্গিত আছে। এইখানেই আমরা প্রবন্ধ-সাহিত্য এবং রচনা-সাহিত্যের ভিতরে একটা ভেদরেখা টানিতে চাই। প্রবন্ধ সাহিত্যিক সৃষ্টি নহে, রচনা সাহিত্যিক সৃষ্টি। ইংরেজি Essay এবং Treatise, Discourse, Dissertation শব্দের ভিতরে যে তফাৎ রচনা এবং প্রবন্ধের ভিতরে আমরা সেই তফাৎ কল্পনা করিতে পারি। অবশ্য আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, প্রবন্ধ এবং রচনা আমাদের সাহিত্যে প্রায় সমার্থকশব্দরূপেই প্রচলিত, সুতরাং তাহাদের ভিতরে যে পার্থক্যের কথা এখানে বলিতেছি তাহা ঐতিহাসিক নহে,—তাহা অনেকখানিই অর্থগত। তবে এই অর্থগত ভেদকে অবলম্বন করিয়া আমরা

প্রবন্ধ এবং রচনার ভিতরকার এই প্রভেদকে যদি এখন হইতে মানিয়া লই, তাহা হইলে একটি সাহিত্যিক শ্রেণী হিসাবে রচনা-সাহিত্যের সংজ্ঞা এবং পরিধি আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে।

বাঙলা রচনা-সাহিত্যের জন্ম ও পরিপুষ্টি উনবিংশ শতাব্দীতে; আর আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল অনেকখানি ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবে; সুতরাং আমাদের রচনা-সাহিত্যের আলোচনায় ইংরেজি রচনা-সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ রক্ষা করিয়া চলা উচিত।

ইংরেজি সাহিত্যে Essay শব্দটি সাহিত্যিক রচনা অর্থেই ব্যবহৃত হইলেও এবং Essay ও Treatise বা Discourse-এর ভিতরে একটা তফাৎ করা হইলেও Essay শব্দটিও ইংরেজিতে অতি ব্যাপকভাবে এবং অসাবধানে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। ল্যাম্বের রচনাকেও Essay বলা হয়, বেকনের রচনাকেও Essay বলা হয়,—আবার লকের দার্শনিক তথ্য ও যুক্তিতর্ক সমন্বিত সুদীর্ঘ গ্রন্থকেও Essays on Human Understanding বলা হয়। খাটি সাহিত্যিক অর্থে, একটি বিশেষ জাতীয় সাহিত্য-রচনা অর্থে, Essay শব্দটির ব্যবহার প্রথম দেখা যায় যোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে ফরাসী লেখক মনটেইনের (Montaigne) লেখায়। Essay শব্দটিই মূলতঃ একটি ফরাসী শব্দ; ফরাসী হইতেই ইহার সাধারণ Trial বা পরীক্ষা অর্থে এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে সীমাবদ্ধ অর্থে গ্রহণ করা হইয়াছে। ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে মনটেইনের Essaies প্রকাশিত হয়। এখানে মনটেইন Essay শব্দটিকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা নূতন-জাতীয় সাহিত্য-সৃষ্টির চেষ্টা (Attempt) বা এই ক্ষেত্রে একটা পরীক্ষামূলক প্রয়োগ (Experiment) এই অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন। সাহিত্যের একটি জাতি অর্থে Essay শব্দটি স্কটল্যাণ্ডের ষষ্ঠ জেম্‌সই (James VI) প্রথম ইংরেজিতে ব্যবহার করেন; বেকনই এই শব্দটিকে একটি বিশেষ-জাতীয় সাহিত্যিক রচনা অর্থে গ্রহণ এবং প্রচলন করেন এবং মনটেইনের আদর্শে তিনিই সর্বপ্রথম ইংরেজিতে রচনাসাহিত্যের স্রষ্টা। যোড়শ শতাব্দীর প্রথম হইতেই Essay শব্দটি তাহার সাধারণ এবং বিশেষ অর্থে ইংরেজি অভিধানগুলিতে গৃহীত হইয়াছে।*

* বিভিন্ন যুগের অভিধানে Essay শব্দটির অর্থের জন্য ডব্‌লিউ. এল্‌. ম্যাক্‌ডোনাল্ড্‌ লিখিত—"বিগিনিঙ্গ্‌ অফ্‌ দি ইঙ্গ্‌লিশ্‌ এসেস্‌" (Beginning of the English Essays) গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য।

মন্‌টেইন্‌ যে-জাতীয় সাহিত্যিক রচনাকে তাঁহার স্বাভাবিক বিনয়বশতঃ শুধু মাত্র একটা সাহিত্যিক প্রচেষ্টা বা পরীক্ষা আখ্যা দিয়াছিলেন, কিছু দিনের ভিতরেই সেই জাতীয় রচনা একটি বিশেষ জাতীয় সাহিত্যিক সৃষ্টি বলিয়া স্বীকৃত হইল, এবং ইহারও যে একটা স্বতন্ত্র স্বরূপধর্ম রহিয়াছে তাহা সাহিত্যিকগণের দৃষ্টি এড়াইল না। পূর্বেই বলিয়াছি যে রচনা-সাহিত্যের ভিতরে এবং কাব্য-কবিতা, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতির ভিতরে কোন বিজাতীয় ভেদ নাই; তবে সজাতীয় ভেদ অবশ্যই রহিয়াছে। এই সজাতীয় ভেদের ভিতর দিয়াই বিভিন্ন জাতীয় সাহিত্যিক সৃষ্টির ভিতরে একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য জাগিয়াছে। এখন আমরা রচনা-সাহিত্যের এই বিশিষ্ট ধর্ম সম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

'রচনা' শব্দটি সম্বন্ধে আলোচনার সময়েই বলা হইয়াছে যে রচনা-সাহিত্যের একটি মৌলিক লক্ষণ এই, ইহা একটি সাহিত্যিক সৃষ্টি এবং এই জন্যই এই জাতীয় লেখার 'রচনা' নামটিই উপযুক্ততম নাম। সাধারণ সাহিত্য হিসাবে রচনা-সাহিত্যও তাহার বাচ্যার্থকে সর্বদাই ছাড়াইয়া যায় একটা রসের প্রয়োজনে। এই সাহিত্যের রস সর্বদাই একটা সৃষ্টি-প্রসূত রস। জ্ঞান-আহরণে আমাদের আত্মপ্রসাদ সুতরাং আনন্দ রহিয়াছে; আমাদের চিন্তা-শক্তির আলোড়নজনিত আমাদের একটা আনন্দ রহিয়াছে; কিন্তু এই সকল আনন্দ হইতে সাহিত্যের রসের একটা পার্থক্য এইখানে করা যায় যে, আমাদের সাহিত্যের আনন্দ সাহিত্য-স্রষ্টার পক্ষে একটা নিজস্ব সৃষ্টির আনন্দ এবং পাঠকের পক্ষে ইহা একটা সৃষ্টির ভিতর হইতে অমৃতের নির্যাস। এই জন্য প্রাচীন অলঙ্কারিকেরা কবিকে বা সাহিত্যিককে প্রজাপতি এই আখ্যা দান করিয়াছেন।—

অপারে কাব্যসংসারে কবিরেব প্রজাপতিঃ।

আদিকবি প্রজাপতি ব্রহ্মা এই সৃষ্টির কাব্যখানি রচনা করিয়াছিলেন। সেই বিরাট কাব্যের এখান হইতে সেখান হইতে টুকরা টুকরা গ্রহণ করিয়া কবিরূপ দ্বিতীয় প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁহার কাব্যে বিশ্ব-সৃষ্টিকে আবার নূতন করিয়া গড়িয়া লন। প্রত্যেক কবি বা সাহিত্যিকেরই বিশ্ব-সৃষ্টিকে দেখিবার জন্য একটি বিশেষ চোখ এবং গ্রহণ করিবার জন্য একটি বিশেষ মন আছে।

এই বিশেষ চোখ ও মনের সমাবেশে তাহার ভিতরে গড়িয়া ওঠে একটি বিশেষ রুচি; সাহিত্যিকের সেই রুচি অনুসারে বিশ্বসৃষ্টি পরিবর্তিত হইয়া একটি বিশেষ রূপান্তর গ্রহণ করে। এই রূপান্তরিত জগৎকেই সাহিত্যিক তাঁহার প্রতিভাবলে সৃষ্টি করিয়া লন তাঁহার সাহিত্যে,—এই জন্যই তাঁহার সৃষ্টি বিশ্বসৃষ্টি হইতে হইয়া ওঠে নূতন। 'কাব্য-প্রকাশ'কার মম্মট ভট্ট 'প্রজাপতি ব্রহ্মা' হইতে 'কবি প্রজাপতি'র একটি বৈশিষ্ট্যও বর্ণনা করিয়াছেন। 'প্রজাপতি ব্রহ্মা'র সকল সৃষ্টি নিয়তিকৃত-নিয়মের দ্বারা সর্বদা পরিচালিত, কিন্তু 'কবি প্রজাপতি'র যে 'হ্লাদৈকময়ী' 'নবরসরুচিরা' নির্মিতি তাহা 'নিয়তিকৃতনিয়ম-রহিতা' এবং 'অনন্যপরতন্ত্রা'।*

রচনা-সাহিত্যকে প্রথমে বাহির হইতে যতই এলোমেলো মনে হোক না কেন,—মূলতঃ তাহার ভিতরেও আমরা দেখিতে পাই জগতের প্রতি এবং জীবনের প্রতি একটি বিশেষ দৃষ্টি এবং তাহারই ফলে সেও হইয়া ওঠে এক জাতীয় সৃষ্টি। এই সৃষ্টি-লক্ষণটি বর্তমান থাকিলে এবং বাচ্যাতিরিক্ত একটা রস পরিবেশনের চেষ্টা থাকিলে যে-কোন বিষয়বস্তু লইয়াই রচনা-সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে পারে। একটি ঐতিহাসিক লেখার ভিতর দিয়া যদি সন-তারিখ-গুলিই পাগড়িওয়ালা বল্লমধারীর ন্যায় সজোরে মাথা নাড়া দিয়া ওঠে, তবে তাহাকে ইতিহাসের খেতাবই দিব, সাহিত্য বলিব না; কিন্তু যেখানে এই সকল সন-তারিখ এবং তৎকালে অনুষ্ঠিত ঘটনা, সেই ঘটনায় বিজড়িত দেশ, কাল, পাত্র প্রভৃতি সমগ্র উপাদানকে গ্রহণ করিয়া কোন ইতিহাসের ঘটনাকেই আবার অনেকখানি নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়া জ্ঞান-বৃদ্ধির চেষ্টা অপেক্ষা রস-পরিবেশনের চেষ্টাকেই বড় করিয়া তোলা হয়, তাহাকে রচনা-সাহিত্য আখ্যা দিতে আমাদের কোনও আপত্তি নাই। এইরূপে কোনও লেখা রাজনীতি, সমাজনীতি বা ধর্মনীতি সম্বলিতই হোক, অথবা দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি কোন গুরু বিষয়কে লইয়াই হোক—অথবা আকাশসঞ্চারী পাখীর ন্যায় কল্পনার লঘুপক্ষে-ভরকারী কতগুলি একান্ত অলস মুহূর্ত লইয়াই হোক—সব জিনিসই রচনা-সাহিত্য হইয়া উঠিতে পারে, যদি সে নূতন সৃষ্টির ভিতর দিয়া পাঠকের মনে একটা রসের অনুভূতি জাগাইয়া তুলিতে পারে। পূর্বেই বলিয়াছি, এই সৃজন ও আনন্দ পরিবেশন ব্যতীত সকল লেখাই প্রবন্ধ হইয়া যায়, রচনা হইয়া ওঠে

---

* নিয়তিকৃতনিয়মরহিতাং হ্লাদৈকময়ীমনন্যপরতন্ত্রাম্।
নবরসরুচিরাং নির্মিতিমাদধতী ভারতী কবের্জয়তি॥

না। সাহিত্যের সমালোচনাও সাধারণতঃ এই প্রবন্ধেরই অন্তর্গত; কিন্তু যিনি সত্যিকারের সাহিত্যিক তিনি সাহিত্যিক সমালোচনার নামে শুধু তথ্য এবং তত্ত্ব পরিবেশন করিয়া কিছুতেই সুখী হইতে পারেন না; তাঁহার অন্তর্নিহিত সৃজনী-প্রতিভা তাঁহার তথ্যের ও তত্ত্বের ভিতরে নূতন রক্তমাংসের জোগান দিয়া তাহাতে নূতন প্রাণ-সঞ্চার করে; সাহিত্যিক সমালোচনাও তখন হইয়া ওঠে সাহিত্যিক সৃষ্টি,—সেই জাতীয় সাহিত্যিক সমালোচনাকেই শুধু আমরা রচনা-সাহিত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারি।

রচনা-সাহিত্যের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ইহার ভিতরকার ব্যক্তি-প্রাধান্য। সাহিত্যের ইতিহাসে রচনা-সাহিত্যের আবির্ভাব অনেক পরবর্তী কালে এবং ইহার স্ফুরণ আরও পরবর্তী কালে। আমাদের বাঙলা-সাহিত্যে ত সত্যকারের রচনা-সাহিত্যের যুগ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ হইতে আরম্ভ। সুতরাং আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে রচনা-সাহিত্য একেবারেই আধুনিক, এবং এই কারণেই ইহার ভিতরে আধুনিক সাহিত্যের লক্ষণগুলির সম্যক্ স্ফুরণই অত্যন্ত স্বাভাবিক।

আধুনিক সাহিত্যের একটা সব চেয়ে বড় কথা ব্যক্তিবাদের প্রাধান্য। আধুনিক যুগটা শুধু ব্যক্তি-স্বাধীনতার যুগ নহে, ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠার যুগ। সাহিত্যের আদিযুগ এবং মধ্যযুগ কাটিয়া গিয়া কবে হইতে আধুনিক যুগ আরম্ভ হইয়াছে তাহার খোঁজ লইতে গেলে আমরা দেখিতে পাইব, যেদিন হইতে সাহিত্য-সৃষ্টি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সাহিত্য-স্রষ্টার ব্যক্তি-পুরুষেরই প্রকাশরূপে দেখা দিতে লাগিল, সেই দিন হইতেই আধুনিকতার যুগ-পত্তন। আজকালকার কাব্য-কবিতাই যে শুধু ব্যক্তিবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত তাহা নহে, ব্যক্তিবাদই আজকালকার সব জাতীয় সাহিত্য-সৃষ্টির প্রধান সুর। সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা নাটককেই সর্বাপেক্ষা অধিক বস্তুনিষ্ঠ বলিয়া এতদিন জানিতাম, —কিন্তু সেই নাটকও এখন অনেকখানি প্রত্যক্ষভাবেই বহির্ঘটনা ও চরিত্রে রূপায়িত নাট্যকারের ব্যক্তিসত্তারই স্পন্দন-রূপ গ্রহণ করিতেছে।

অবশ্য সৃষ্টির ভিতর দিয়া লেখক এবং পাঠকের ভিতরে যে একটা রসের যোগ,—একটা হৃদয়ের সংবাদ তাহা সকল সাহিত্যেরই মূল ধর্ম। একের রস-প্রেরণা এবং অন্যের রসাস্বাদের ভিতর দিয়া জাগিয়া ওঠে কবি-হৃদয়ের সহিত সম-বাসনা-বাসিত সহৃদয় পাঠকের হৃদয়ের নিবিড় যোগ, এই জন্যই সাহিত্য 'সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী'। তথ্য, তত্ত্ব ও পাণ্ডিত্যের ভিতর দিয়া একের সহিত

অপরের বুদ্ধির যোগ ঘটিতে পারে, হৃদয়ের যোগ ঘটে না, তাই তাহারা সাহিত্যের উপাদান নয়; রসের যোগেই ঘটে হৃদয়-সংযোগ, হৃদয়-সংযোগে জাগে দুইটি হৃদয়ের রস-সংবাদ,—এই হৃদয়ের সংবাদই সাহিত্যের 'সাহিত্য'। প্রাচীনেরা অবশ্য শব্দের সহিত শব্দের সাহিত্য বা সঙ্গতি, অর্থের সহিত অর্থের সাহিত্য এবং শব্দের সহিত অর্থের সাহিত্য এবং সমগ্র বাচ্যবাচক জুড়িয়া যে একটা সূক্ষ্ম সঙ্গতি বা ঔচিত্য ইহাকেই 'সাহিত্য' বলিতেন। আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথ এই সাহিত্য কথাটিকে আরও একটি ব্যাপক অর্থে গ্রহণ এবং ব্যাখ্যা করিয়াছেন। হৃদয়-সংবাদের ভিতর দিয়া লেখক এবং পাঠকের যে অন্তরঙ্গ যোগ তাহাকেই তিনি বলিয়াছেন সাহিত্য। "সে যে কেবল ভাবে ভাবে ভাষায় ভাষায় গ্রন্থে গ্রন্থে মিলন তাহা নহে,—মানুষের সহিত মানুষের, অতীতের সহিত বর্তমানের, দূরের সহিত নিকটের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ যোগসাধন সাহিত্য ব্যতীত আর কিছুর দ্বারাই সম্ভবপর নহে।" (সাহিত্য, পৃঃ ১০৬)

এই হৃদয়-সংবাদ ব্যতীত যখন সাহিত্য হয় না, তখন সকল যুগের সাহিত্যের ভিতরেই যে সাহিত্যকার এবং পাঠকের ভিতরে একটা হৃদয়-বিনিময় রহিয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য; কিন্তু প্রাচীন এবং মধ্যযুগের সাহিত্যে এই হৃদয়ের সংবাদটা অনেকখানি ছিল পরোক্ষ। লেখক তাঁহার রসানুভূতিকে তাঁহার বর্ণিত বিষয়-বস্তুর ভিতরেই ছড়াইয়া দিয়া নিজেকে যথাসম্ভব ঢাকিয়া রাখিতেন যবনিকার অন্তরালে, পাঠকের প্রত্যক্ষ কারবার ছিল কাব্যবর্ণিত বিষয়বস্তুর সহিত। কিন্তু লেখক এবং পাঠকের মধ্যবর্তী এই যবনিকাটি সাহিত্যের ইতিহাসের আবর্তনের সহিত সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতররূপ ধারণ করিয়া এখন প্রায় অদৃশ্য হইয়া যাইতে বসিয়াছে; এখন তাই লেখক এবং পাঠকের হৃদয়সংবাদ অনেকখানিই প্রত্যক্ষ; আর এই প্রত্যক্ষ হৃদয়-সংবাদ স্পষ্টতম হইয়া উঠিতেছে পদ্যে লিরিক্ কবিতায় এবং গদ্যে রচনা সাহিত্যে। এই জন্যই 'রচনা'কে অনেকে নাম দিয়াছেন গদ্য-লিরিক্।

রচনা-সাহিত্য তাই লেখকের একান্তই নিজস্ব কথা; সে যতখানি লেখকের নিজস্ব ততখানিই সে সার্থক। তাঁহার জীবনের সকল খুঁটি-নাটি হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তরের অন্তস্তলে নিহিত সকল গভীর কথাকে মিলাইয়া অকপটে যখন তিনি তাঁহার লেখার ভিতর দিয়া নিজেকে প্রকাশ করিয়া তুলিতে পারিবেন—জীবন্ত এবং প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিতে পারিবেন পাঠকের নিকটে সকল দোষে-গুণে মণ্ডিত তাঁহার ভিতরকার মানুষটিকে, সেই লেখাই হইবে যথার্থ রচনা।

আমরা রচনার ভিতর শুধু কতগুলি সর্বজনীন এবং সর্বকালিক কথা শুনিতে চাই না,—এখানে আমরা পাইতে চাই একটি বিশেষ সময়ের একটি বিশেষ মানুষকে। তাঁহাকে যে খুব বড় হইয়াই দেখা দিতে হইবে আমাদের দাবী সেরূপ নয়, আমাদের দাবী, তাঁহাকে অকৃত্রিমরূপে দেখা দিতে হইবে—তাঁহাকে তাঁহার রচনার ভিতর দিয়া আমাদের 'আপনার লোক' হইতে হইবে।

সাধারণতঃ আমাদের রচনা-সাহিত্য সম্পর্কে ধারণা এই যে, উহা এক-প্রকারের সাধারণ বক্তৃতা-মঞ্চের বক্তৃতা। পাঠকগণ যেন হাজার হাজার শ্রোতার ন্যায় দল বাঁধিয়া ঠেলাঠেলি করিয়া ভিড় করিয়া আছে,—লেখক যেন অতি উচ্চমঞ্চ হইতে নিতান্ত কৃপাপরবশ হইয়া গুরুগম্ভীর স্বরে সকলের উপযোগী করিয়া মূল্যবান্ বাক্য বর্ষণ করিতেছেন। কিন্তু যে রচনা সাহিত্যের একটা অতি উচ্চস্তরে উন্নীত হয় তাহার প্রকৃতি আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব, তাহা এইরূপ বারোয়ারী জিনিস নহে, তাহা একান্ত নিভৃতে লেখক এবং পাঠকের হৃদয়-সংবাদ।* পাঠক যেন রচনা পড়িতে পড়িতে এ-কথা কখনও মনে না করে যে, ইহা শুধু তাহার জন্য লেখা হয় নাই,—যে অগণিত ভিড়ের দিকে তাকাইয়া এগুলি লেখা হইয়াছে সে তাহার ভিতরে নগণ্য একজন মাত্র; পরন্তু সে যেন সর্বদার জন্য এই কথাটিই অনুভব করে যে, লেখক যাহা কিছু বলিতেছেন তাহা শুধু তাহার মুখ তাকাইয়া তাহার জন্যই বলিতেছেন। অন্তরঙ্গ বন্ধু যেমন করিয়া একটি পরম মুহূর্তে নিভৃত নির্জনে অপর বন্ধুর নিকট নিজের অন্তরের সঞ্চিত সুখদুঃখ, আশা-নিরাশার কথাগুলি অকপটে ব্যক্ত করিয়া দেয়, যেমন করিয়া হৃদয়ের নিভৃততম কক্ষের দুয়ারও উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়, রচনাকারও তেমন করিয়া পাঠকের নিকটে আপনার হৃদয়কে উন্মুক্ত করিয়া দেন। রচনার ভিতর দিয়া লেখক এবং পাঠকের ভিতরকার এই যে পরম অন্তরঙ্গ যোগ, ইহা ব্যতীত রচনা সত্যকারের সাহিত্যই হইয়া উঠিতে পারে না। রচনার প্রধান উপাদানই এই হৃদয়ের সংবাদ। তথ্য, তত্ত্ব ও পাণ্ডিত্যের চাপে এই হৃদয়ের সংবাদটি ব্যাহত হইবারই সম্ভাবনা,—এই জন্যই এই সকল জিনিস সর্বদা রচনার রসের পরিপূরক না হইয়া বরঞ্চ সময়ে সময়ে রস-ভঙ্গেরই কারণ হইয়া থাকে।

---

* Most of us think of the ideal essay as a kind of private rather than of public talk. The talk of the critics is usually as public as if they were addressing us from a platform.—লিণ্ড্

ইউরোপীয় রচনা-সাহিত্যের জনক মন্‌টেইন্‌ও তাঁহার রচনা-গ্রন্থের ভূমিকায় রচনার ভিতরে লেখকের অকপট আত্ম-প্রকাশকেই বড় করিয়া দেখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"পাঠক, তোমার জন্য একখানি অকপট গ্রন্থ রহিয়াছে; প্রারম্ভেই এ গ্রন্থ তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছে যে, এ গ্রন্থের পরিকল্পনার ভিতরে আমি একটা পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ছাড়া আর কিছুই সাধন করিতে চাই না। আমার দান বা আমার গৌরবের কথা আমি কিছুই ভাবি নাই।...আমি ইহাকে আমার আত্মীয় এবং বন্ধুগণের একটি বিশেষ প্রয়োজনের জন্য উৎসর্গ করিয়াছি; ইহার ফলে, আমাকে তাহারা হারাইবার পরেও (আমাকে তাহারা শীঘ্রই নিশ্চয় হারাইবে) ইহার ভিতরে (অর্থাৎ আমার গ্রন্থের ভিতরে) আমার পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং রুচি-মর্জির কতকগুলি দিক পুনরুদ্ধার করিতে পারিবে; এই উপায়ে তাহারা আমার সম্বন্ধে তাহাদের যে জ্ঞান ছিল তাহা সমগ্রভাবে এবং আরও জীবন্তভাবে রক্ষা করিতে পারিবে।......আমি চাই, যত্নচেষ্টা এবং কৃত্রিমতা ব্যতীত আমি আমার নিজের সত্যকার সাদাসিধা এবং সাধারণ আচার-ব্যবহারের ভিতর দিয়া যেরূপে প্রতিভাত হই, সকলে আমাকে আমার রচনার ভিতরে যেন ঠিক সেইরূপই দেখিতে পায়; কারণ এখানে আমি নিজেকেই নিজে অঙ্কিত করিতেছি। বাস্তব জীবনের মত করিয়াই আমার দোষগুলি যেন সেখানে পঠিত হয়, আমার সকল অপূর্ণতাও যেন সেইভাবে পঠিত হয়, এবং জনসাধারণের শ্রদ্ধা আমাকে যে স্বাভাবিক রূপ দান করিয়াছে, আমার সেই রূপই যেন পঠিত হয়।...হে পাঠক, এইরূপে আমার পুস্তকের বিষয়-বস্তু আমিই"।*

---

* "Reader, thou hast here an honest book: it doth at the outset forewarn thee that, in contriving the same I have proposed to myself no other than a domestic and private end. I have had no consideration at all either to my service or to my glory,......I have dedicated it to the particular commodity of my kinsfolk and friends, so that, having lost me (which they must do shortly) they may therein recover some traits of my conditions and humours, and by that means preserve whole, and more lifelike, the knowledge they had of me....... I desire therein to be viewed as I appear in mine own genuine, simple and ordinary manner, without study and artifice: for it is myself I paint: my defects are therein to be read to the life, and my imperfections and my natural form, so far as public reverence hath permitted me..... Thus, reader, myself am the matter of my book."—'দি বিগিনিঙ্‌ অব্‌ দি ইংলিশ্‌ এসেস্‌'—(পৃঃ ২১—২২)।

মন্‌টেইনের এই স্বীকারোক্তিতে রচনার আসল রূপটিই প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তম রচনার ভিতরে লেখক পাঠককে অতি অন্তরঙ্গ বন্ধুর ন্যায় ডাকিয়া বলেন,—ইহার ভিতরে আমি আমার মনের কথাগুলিকেই অনাড়ম্বরে খানিকটা অগোছালভাবে খুলিয়া বলিয়াছি,—তাহার ভিতর দিয়া তুমি সন্ধান পাইবে ভালোতে-মন্দতে, দোষে-গুণে মিশ্রিত আমার নিরাবরণ এবং নিরাভরণ প্রাণ-পুরুষের—এই নিবিড় পরিচয়ের ভিতর দিয়া যে উভয় হৃদয়ের সৌহার্দ্যের বন্ধন, ইহাই এখানে পরম লাভ। রচনা-সাহিত্যের বিষয়-বস্তু যাহাই হোক,—সে আত্ম-জীবনীই হোক, ভ্রমণ-কাহিনীই হোক, জীবনের কোন তুচ্ছ ক্ষুদ্র ঘটনার বিবৃতিই হোক, অথবা সাহিত্যিক সমালোচনা, সামাজিক সমস্যা বা ধর্ম-ইতিহাস প্রভৃতি কিছু হোক,—লেখার ভিতর দিয়া লেখক-হৃদয়ের একটা অকৃত্রিম স্পর্শ চাই; নতুবা সে লবণহীন ব্যঞ্জন।

সর্বজাতীয় সাহিত্যের একটা প্রধান লক্ষণ এই যে, তাহার বিষয়-বস্তু প্রতিভা-স্পর্শে সর্বদাই একটা সাধারণীকৃত রূপ পরিগ্রহ করে। এই সাধারণী-কৃতির ভিতর দিয়াই লেখক এবং পাঠকচিত্তের সংবাদ সম্ভব হইয়া ওঠে। রচনার প্রধান বিষয়-বস্তু 'আমি' সর্বদাই এইরূপ একটা সাধারণীকৃত রূপে আসিয়া দেখা দেয়; তখন যে-কারণে সাধারণ মানব-চরিত্র আমাদের কাছে অতিশয় কৌতূহলের বস্তু হইয়া ওঠে, সেই কারণেই নানারূপ দোষ-গুণ এবং উৎকেন্দ্রিকতা লইয়াই লেখক পাঠকের নিকট একটি রহস্য ও কৌতূহলের প্রতীক হইয়া থাকেন। তখন আমরা দেশকালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন একটি বিশেষ ব্যক্তি-সত্তাকে জানিবার জন্যই উৎসুক হইয়া উঠি না; সেই বিশেষ ব্যক্তি-সত্তাটি তখন সাধারণ মানবচরিত্রেরই একটি কৌতূহলময় বিশেষ রূপ বলিয়া এই সাধারণীকৃত রূপেই লেখক আমাদের মন প্রীতি ও কৌতূহলে ভরিয়া দেন।

এই প্রসঙ্গে আমাদের আরও মনে রাখা উচিত যে রচনার ভিতর দিয়া লেখকের যে আত্ম-প্রকাশ ইহা সাহিত্যের বেদীতে বা গদিতে উদগ্র 'অহং'-এর প্রতিষ্ঠা নহে! আমরা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দেখিতে পাই, যেখানেই কোন 'অহং' তাহার উদগ্রমূর্তি লইয়া আমাদের নিকটে নিজেকে জাহির করিতে আসে, আমরা হয় করি তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, নতুবা করি তাহাকে অবজ্ঞা এবং উপেক্ষা; কিন্তু সেই 'অহং'কেই আমরা আদর করিয়া বরণ করিয়া লই আমাদের হৃদয়ক্ষেত্রে যখন সে আমাদের নিকটে আসে একান্ত আত্মীয় বেশে—সহৃদয় বন্ধুর বেশে। রচনার ভিতরে রহিয়াছে আত্ম-নিবেদন, আত্মম্ভরিতা

নহে। অনুরাগে, সারল্যে, অকপটতায় এবং অমায়িকতায় লেখক এখানে হইয়া ওঠেন স্নিগ্ধ প্রীতিভাজন। রচনার একটা প্রধান গুণ তাই গভীর সহানুভূতি। লেখক অতিদূরে একটি অভ্রভেদী মূর্তির মতন দাঁড়াইয়া অবজ্ঞা এবং তাচ্ছিল্যভরে ডাকিয়া কথা বলেন না,—আমাদের সমস্তরে দাঁড়াইয়া কানের কাছে মুখ রাখিয়া মনের কথা খুলিয়া বলেন। রচনার ভিতর দিয়া লেখক হয়ত কোনও যুগের সমাজ, সাহিত্য, নীতি, ধর্ম প্রভৃতির সমালোচনা করিতে পারেন, বিদ্রূপও করিতে পারেন, কিন্তু সব জিনিসই তিক্ত হইয়া যায় যদি ইহাদের পিছনে না থাকে লেখকের সহবেদনশীল চিত্ত।

আর রচনার ভিতরে যে লেখকের আত্ম-প্রকাশ তাহার ভিতরে যেমন উগ্রতা নাই,—তেমন কোন জোর-জবরদস্তিও নাই। লেখক স্বভাবতঃ বিনয়ী, নম্র,—প্রখর আলোকে নিজেকে স্পষ্ট করিয়া জাহির করিতে সঙ্কুচিত; তাঁহার হৃদয়ের স্পর্শ তাঁহার সমগ্র লেখার ভিতরে ছড়াইয়া থাকে পাথরের ফাটলের মাঝে মাঝে সোনার রেখার মত; বিষয়-বস্তুর বর্ণনায়,—এখানে সেখানে দু'-একটি 'মন্তব্যে',—তাঁহার প্রকাশভঙ্গিতে, বচন-বিন্যাসে, হাস্যে-পরিহাসে, সমস্তের ভিতর দিয়া তাঁহার অন্তর্নিবাসী পুরুষটি যেন নিজেকে নানা ভাবে ছড়াইয়া দেয়,—সেই ছড়ান পুরুষটিকে পাঠক আবার একস্থ করিয়া লয় তাহার মনের ভিতরে।

এই জন্য দেখিতে পাই, ইংরেজি সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রচনাকাররূপে খ্যাত ল্যাম্ব্। বেকন্ হইতেও ল্যাম্ব্‌কে অনেকেই উচ্চ আসন দান করেন। বেকন্ চিন্তাশীল, প্রাজ্ঞ সহৃদয়ও বটেন,—কিন্তু ল্যাম্বের ন্যায় 'আপন জন' নহেন। কার্‌লাইল্, ইমার্‌সন্ প্রভৃতি মনীষী—শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি,—কিন্তু কাহাকেও ল্যাম্বের মতন এতখানি আপন করিয়া লইতে পারা যায় না। উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতেও ইংরেজি সাহিত্যে অনেক সার্থক রচনাকার হইয়াছেন বা হইতেছেন,—কিন্তু তাঁহাদের ভিতরেও মাঝে মাঝে বেশ চিন্তার প্যাঁচ-গোছ এবং বুদ্ধির ঝাঁজ দেখিতে পাওয়া যায়,—কিন্তু এই সব বিতৃষ্ণার কারণ ল্যাম্বের ভিতরে কিছুই নাই—তাই তিনি সর্বাপেক্ষা সার্থক রচনাকার।

সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে জগতে এবং জীবনে এমন কোন বিষয় নাই যাহা লইয়া রচনা-সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে না পারে; কিন্তু ভাল রচনা-সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য মানুষের জীবনের সঞ্চয়—যাহাকে আমরা বলি তাহার অভিজ্ঞতা এবং প্রজ্ঞা। জগৎ এবং জীবন হইতে লেখক সঞ্চয়

করিয়াছেন বহু কথা, বহু রত্ন; জীবনের এই পুঁজি লইয়া লেখক আপনাতে আপনি কিছুতেই তৃপ্ত থাকিতে পারেন না,—আপন-জনকে ডাকিয়া শুনাইতে ইচ্ছা করে; তখন একটি কোনও বিশেষ বিষয়-বস্তুকে উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া লেখক নিঃশেষে বিলাইয়া দেন তাঁহার সকল পুঁজি-পাটা। আসল কথা, রচনার শ্রেষ্ঠ উপাদান সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশায় ভরা জীবনের বহুবিচিত্র রহস্যময় স্মৃতি। কোনও এক ভাবঘন প্রশান্ত মুহূর্তে আমরা কোনও একটি বিষয়-বস্তুকে অবলম্বন করিয়া ডুবিয়া যাই আমাদের হৃদয়ের অতল তলে—সেই স্মৃতির দেশে, সেখান হইতে আহরণ করি সপ্তরঙের মণি-মাণিক্য; বাহিরে আনিয়া তাহাদিগকে যত টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙিয়া দেখিতে চাই, ততই ঠিক্‌রাইয়া পড়ে সুকুমার বর্ণ বৈচিত্র্য, তাহা লইয়াই অপরূপ এবং অমূল্য হইয়া ওঠে আমাদের রচনা। অন্তরের গভীর দেশে মাঝে মাঝে এইরূপ আত্ম-নিমজ্জন এবং সেখান হইতে জীবনের সকল পুঁজি হইতে বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটি মণি-মাণিক্য আনিয়া একান্ত আপনার জনকে নিভৃতে উপহার দান—ইহাই সত্যকারের রচনা।* জীবনের অভিজ্ঞতাকে আমরা রঙিন করিয়া লই আমাদের কল্পনা দ্বারা,—প্রজ্ঞার প্রাখর্যকে কমনীয় করিয়া লই হাস্যের স্নিগ্ধতা দ্বারা—সমালোচনাকে সরস করিয়া তুলি সহানুভূতিতে। এই অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার সহিত কল্পনা হাস্য এবং সহানুভূতি মিশ্রিত হইয়া আমাদের রচনা হইয়া ওঠে পরম আস্বাদ্য।

কিন্তু এই সকল জাতীয় উপাদানের ভিতরে থাকা চাই একটা হৃদয়ের সারল্য—একটা আন্তরিকতা; কারণ, আন্তরিকতা সর্বপ্রকার সাহিত্যেরই একটা গোড়ার কথা। মানুষের আনন্দ আমাদের হৃদয়ে আনন্দের উদ্রেক করে না, মানুষের বেদনা আমাদের অশ্রু আকর্ষণ করে না,—মানুষের হাসি আমাদিগকে সরস করে না যতক্ষণ না সেই আনন্দ, সেই বেদনা, সেই অশ্রুর ভিতরে স্পষ্ট হইয়া ওঠে একটি গভীর আন্তরিকতা। মানুষের দুর্লভ গুণগুলির ভিতরে প্রধান গুণ এই আন্তরিকতা এবং ইহাই খাঁটি রচনা-সাহিত্যের

* তুলনীয়—"As to what makes a good essay, I do not think any one ever has discovered, or will ever discover, the recipe. It is a kind of lucky dip into experience or into fantasy—often into both. The ordinary essayist dips again and again, and seldom brings up anything worth showing to his neighbours. Lamb dipped again, and almost invariably came back with a parcel of treasure."—লিণ্ড।

দুর্লভতার একটি প্রধান কারণ। অন্য জাতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই অকৃত্রিম সরল প্রাণের অভাবকে আমরা খানিকটা হয়ত ভরাট করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতে পারি ছন্দোবন্ধ, ভাষার চাতুর্য, নানাপ্রকার কলাকৌশলের দ্বারা—যদিও সে ক্ষেত্রেও আমরা প্রায়ই লাভ করি ব্যর্থতা; কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে রচনা স্বভাবতঃই নিরাভরণা,—অলঙ্কার-প্রাচুর্য তাহার পক্ষে কুৎসিত,—ছলাকলা নিন্দার্হ, বাহ্যাড়ম্বর এবং চাতুর্য অশ্রদ্ধেয়; সুতরাং এই সকলের অভাবকে রচনায় ভরিয়া তুলিতে হয় একমাত্র প্রাণের দানে—হৃদয়ের অকৃত্রিমতায় এবং গভীরতায়। ভারতচন্দ্র আর কিছু পারুন আর না পারুন, ছন্দ, শব্দালঙ্কার এবং অর্থালঙ্কার লইয়া যাদু খেলিয়া একেবারে ভেল্কি লাগাইয়া দিয়াছেন, এবং তাহা দ্বারা কবিখ্যাতিও তাঁহার লাভ হইয়াছে; কিন্তু রচনা-ক্ষেত্রে সেই কৌশল অবলম্বন করিয়া মেকলে সাহেব বেশীক্ষণ আসর জমাইতে পারেন নাই, তাঁহাকে পিছনে পড়িয়া যাইতে হইয়াছে; ল্যাম্ব এই আন্তরিকতার পরিচয় দিতে পারিয়াছিলেন সব চেয়ে বেশী, এই কারণেই তাঁহার রচনার ভাষাগত এবং রীতিগত প্রাচীনগন্ধিতা সত্ত্বেও এ ক্ষেত্রে তিনিই রহিয়া গেলেন রাজা।

ভাল রচনার ভিতরে সর্বদাই একটা ঘরোয়া আবেষ্টনী রহিয়াছে। শুধু ঘরোয়া ভাব নহে, রচনার ভিতরে আর একটা রহিয়াছে এলোমেলো ভাব, কিছুই যেন খুব সতর্কে এবং সযত্নে সাজানো গুছানো নহে। ইহার কারণ এই, ঘরোয়া জীবনের যে এলোমেলো রূপ তাহাই আমাদের সত্যকারের রূপ,—আর সভার মাঝখানে আমাদের যে সাজানো গুছানো সভ্যরূপ ওটা অনেক ক্ষেত্রেই একটা কৃত্রিম আরোপিত রূপ। আমাদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার ভিতরে সাধারণতঃ এই একটা দ্বৈতরূপ রহিয়াছে; যতক্ষণ ঘরে থাকি ততক্ষণ স্বমূর্তিতে ঠিক 'আমি' থাকি,—তখন আর সর্বদার জন্য সাজিয়া গুজিয়া বসিয়া থাকি না, রীতিমাফিক চলাফেরা করি না, ওজন মাপিয়া মিহিচালে কথা বলি না, সময় মাপিয়া ভালোবাসি না—ঠোঁট চাপিয়া নিঃশব্দে হাসি না,—তখন অকৃত্রিম নিরাভরণ রূপে, বেকায়দামাফিক সহজ চালচলনে, মনখোলা কথায়, বেহিসাব স্নেহপ্রীতিতে, প্রাণভরা উচ্চ হাসিতে একটা রক্তমাংসের সজীব মানুষ হইয়া উঠি। আর যখন ঘর ছাড়িয়া বাহির হই, তখন হয় বলি ব্যবসায়ের লাভলোকসানের কথা, না হয় মাতি অন্য আরও পাঁচ রকমের বিরাট্ বিরাট্ সমস্যায়, তখন ভাষা ব্যবহার করি অনেক সময়ই মনের ভাব

অপ্রকাশ রাখিতে,—বক্রহাসিতে প্রকাশ পায় দুর্বোধ্য ক্রৌর্য,—নিয়মমাফিক চালচলন, কাজকর্ম সকলের ভিতর দিয়া নিরন্তর চলিতে থাকে আমাদের 'আমি'র আসলরূপটি ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা। প্রবন্ধের ভিতরে এই ঘরোয়া ভাব নাই, সেখানে শুধু জ্ঞানী গুণী সভ্যলোকের বড় বড় সভা-সমিতির ব্যাপার; এই সভা-সমিতির আইন-কানুন ভঙ্গ করিয়া প্রবন্ধের ভিতরে যতখানি আসিয়া পড়িতে পারে এই ঘরোয়া ভাব ততই সে যায় রূপান্তরিত হইয়া, ততখানিই সে হইয়া ওঠে রচনার নিকট-আত্মীয়। প্রবন্ধ মানুষের কথাকে এবং মানুষের সেই কথার ভিতর দিয়া মানুষের আন্তররূপকে যতখানি পারে বাঁধিতে চায় রীতি-নীতি আইন-কানুন যুক্তিতর্কের বেড়াজাল-রূপ প্রকৃষ্ট বন্ধনে; রচনা মানুষের কথাকে—তথা মানুষের আন্তর রূপটিকে ততখানি দিতে চায় মুক্তি—অযত্নগ্রথিত সহজ জীবন-যাত্রার পথে। আমাদের বক্তৃতার ভাষা—আমাদের কাজের কথার ভাষা প্রতিপদে সংলগ্ন,—তাহার ভিতর দিয়া আমাদের সহজতম প্রকাশ নাই; কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন ঘরোয়া জীবনের কথা অনেক ক্ষেত্রে অসংলগ্ন, আমরা আমাদের প্রিয়তম বন্ধুর সহিত নিরালায় বসিয়া কথা বলি অনেকখানি অসংলগ্ন ভাষায়,—অসংবদ্ধ রীতিতে এবং স্খলিত-'ন্যায়ে'; কিন্তু মজা এই,—এইখানে আমাদের আসল সত্তাটির পরিচয় মেলে সবচেয়ে বেশী। ঘরোয়া জীবনের কথা যতই আপাত-অসংলগ্ন হোক না কেন, তাহা একেবারে অন্বয়-বিহীন এবং অর্থ-বিহীন প্রলাপ-উক্তি নহে,—তাহারা সকলে একটি গভীর অন্বয়ে বিবৃত হইয়া থাকে আমাদের ব্যক্তি-পুরুষের স্পন্দনে, সেই গভীর অন্বয় আপাত-চপল কথাকে দান করে গভীর অর্থ,—উহা জীবনেরই মর্মার্থ।

রচনার মূল কেন্দ্র থাকে লেখকের একটি বিশেষ মানসিক অবস্থানের ভিতরে—ইংরেজিতে যাহাকে বলে 'মুড' (mood); আর একটু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নামিয়া তাহার নাম দেওয়া যাইতে পারে আমাদের মেজাজ-মর্জি। ভালভাল রচনা আপাততঃ যত স্খলিতবন্ধ এলোমেলো বলিয়া মনে হয়, একটু গভীর ভাবে লক্ষ্য করিলে সেরূপ মনে হইবে না। রচনায় ভিতর সাধারণতঃ একটা ভাবদৃষ্টির সন্ধান পাওয়া যায়,—তাহাই সহজ গতিতে আঁকা-বাঁকা হইয়া গড়াইয়া-পড়া এবং ছড়াইয়া-পড়া চিন্তা ও বাক্যের ধারাগুলিকে একটা সংহতি দান করে,—আর এই সংহতিই রচনা-সাহিত্যকে দান করে তাহার উপর উপর ভাসমান অর্থ হইতে একটি গভীরতর অর্থ।

কিন্তু রচনার পশ্চাতে লিরিক্ কবিতার ন্যায় একটি ভাবদৃষ্টি বর্তমান থাকিলেও উভয়ের ভিতরে একটু তফাৎ রহিয়াছে। রচনার ভাবদৃষ্টি লিরিক কবিতার ভাবদৃষ্টির ন্যায় সংহত এবং একাগ্র নহে। লিরিক কবিতার ভাব অনির্বচনীয়তা-হেতু সঙ্গীতাশ্রয়ী, রচনার ভাব ভাবনাশ্রয়ী। এ-ক্ষেত্রে অবশ্য উভয়ের আয়তনের প্রশ্নকেও বাদ দেওয়া যায় না। লিরিক কবিতা এবং রচনার সাধর্ম্য এবং পার্থক্য সম্বন্ধে পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের রচনা-সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিব,—সুতরাং এ বিষয়ে বর্তমানে আর বিশদ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না।

রচনার ক্ষেত্রে লিরিক কবিতার ক্ষেত্র অপেক্ষা প্রসঙ্গচ্যুতি অনেক বেশী। লেখক যেন পথ চলিতে চলিতে এদিকে সেদিকে তাকাইয়া প্রসঙ্গের ভিতর প্রসঙ্গান্তরের সমাবেশ করিয়া অনবধানে পদক্ষেপ করিতেছেন; কিন্তু চলিতে চলিতে মোহ ও কৌতূহল বশতঃ এপথে সেপথে ঢুকিয়া পড়িয়া লেখকের যতই প্রসঙ্গচ্যুতি ঘটুক না কেন, তিনি ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া আবার ঠিক পথেই অগ্রসর হন,—মোহ ও কৌতূহল তাঁহাকে কোন দিনই একেবারে দিগ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিতে পারে না।

রচনার অন্তর্নিহিত ভাবদৃষ্টির এই আপেক্ষিক অসংহতির জন্য এবং রচনার প্রকাশভঙ্গির আপাত-অসংলগ্ন রূপের জন্যই বোধহয় ডক্টর জন্‌সন্ এই শ্রেণীর লেখাকে 'একরাশ অজীর্ণ কথা' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। রচনার ভিতরে কোন মূল ভাবদৃষ্টি আদৌ থাকে কিনা সে বিষয়ে আরও অনেকে সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। হরেক রকমের রচনার ভিতরে এই ভাবদৃষ্টিটি যে সর্বত্র স্পষ্ট নয়, একথা স্বীকার করিলেও রচনার ভিতরে কোন ভাবদৃষ্টি থাকে না এবং থাকিবার প্রয়োজনও করে না এ জাতীয় মতকে স্বীকার করিতে আপত্তি আছে। আদৌ কোন ভাবদৃষ্টি না থাকিলে শুধু অলস মুহূর্তের কতগুলি অসংলগ্ন কথা জড় করিলেই খাঁটি রচনা গড়িয়া উঠিতে পারে না। এই জন্যই সুবিন্যস্ত, যুক্তিতর্ক- ও সিদ্ধান্তসমন্বিত কতগুলি জ্ঞানগর্ভ কথাও যেমন ভাল রচনা হইয়া উঠিতে পারে না,—কোনও ভাবদৃষ্টিহীন নিছক ঘরোয়াভাবে বলা কতগুলি এলোমেলো বর্ণনা বা আত্ম-বিবৃতিও তেমনি উৎকৃষ্ট রচনা বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর রচনার নাম দিয়াছেন 'বাজে কথা'; শ্রীযুত প্রমথ চৌধুরী ইহার নাম দিয়াছেন 'খেয়াল খাতা'; আমরা পরবর্তী কালে দেখিতে পাইব, এই 'বাজে কথা' এবং 'খেয়াল খাতা'র স্বরূপ

বর্ণনা করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ ও প্রথম চৌধুরী পূর্বালোচিত রচনা-ধর্মেরই বিদগ্ধোচিত নিপুণ বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রায় সব জাতীয় রচনা-সাহিত্যের ভিতরে প্রকৃতিতেই একটা অসম্পূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে। মন্‌টেইন্ এই জাতীয় লেখার যখন Essay নামকরণ করিলেন তখন এই অসম্পূর্ণতার কথাও বোধ হয় তাঁহার মনে ছিল; কারণ আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, Essay কথাটির ভিতরে একটা 'প্রচেষ্টা'র ভাবই নিহিত রহিয়াছে—ইহা সুসম্পন্ন সর্বাঙ্গসুন্দর কোন লেখা নহে—একটা পরীক্ষা-মূলক চেষ্টা মাত্র।* মন্‌টেইনের পরবর্তী কালের লেখকগণের হাতেও রচনার এই অসম্পূর্ণ রূপটি রক্ষিত হইয়াছে; অর্থাৎ এরিষ্টট্‌ল্ যেমন বলিয়াছিলেন যে, সাহিত্যে বর্ণিত বিষয়বস্তুর একটি আদি, মধ্য ও অন্ত থাকিতে হইবে, রচনার ভিতরে আমরা তেমন করিয়া কোন কিছুরই আদি, মধ্য এবং অন্তকে স্পষ্ট করিয়া পাই না। কিন্তু আদি মধ্য এবং অন্তযুক্ত অতি সুসংবদ্ধ এবং সুসম্পন্ন লেখা না হইলেও রচনা যে কোনও খাপছাড়া প্রলাপ নয়, একথা বলিয়া দেওয়া বোধহয় বাহুল্য মাত্র।

খাঁটি রচনার এই অসম্পূর্ণ প্রকৃতির এবং তাহার পূর্ববর্ণিত ঘরোয়া আবেষ্টনীর সহিত তাহার আরও একটা সাধারণ প্রকৃতি আমরা লক্ষ্য করিতে পারি; তাহা এই যে, রচনার ক্ষেত্রে আমরা কখনই যেন তেমন গুরুগম্ভীর নই,—ইহার সর্বত্রই রহিয়াছে একটা হাল্কা মনের অনাড়ম্বর প্রকাশ। ইহার ভিতরে এক রকমের একটা পল্লবগ্রাহিতা রহিয়াছে, আর মজা এই, এই পল্লবগ্রাহিতা অন্যক্ষেত্রে যতই দোষের হোক, রচনার ক্ষেত্রে সে যেন আনিয়া দেয় একটা অভিনব চারুত্ব। ইহার কারণ এই মনে হয় যে, আমাদের জীবনের গুরুগম্ভীর দিকটার ভিতরেই যে সর্বদা উজ্জ্বল হইয়া ওঠে জীবনের সব সত্য, সৌন্দর্য, মাধুর্য এ ধারণা হয়ত ঠিক নহে। সে সত্যের একটা সহজ অনাড়ম্বর প্রকাশ রচনার হাল্কা চালে—কল্পনার লঘুপক্ষে তাহার গতি। জীবনের সত্য এখানে সর্বদা ভয়ানক ভাবে 'গহ্বরেষ্ঠ' হইয়া ওঠে না,—লঘু নির্মল আনন্দের ছোঁওয়া লাগিয়া সত্য এখানে কমনীয় এবং সহজ-গ্রাহ্য হইয়া

---

* "Etymologically the word essay indicates something tentative, so that there is a justification for the conception of incompleteness and want of system." "দি ইংলিশ্ এসে এ্যাণ্ড এসেয়িষ্ট্‌স্" (The English Essay and Essayists), হিউ. ওয়কার।

ওঠে। রচনার পূর্ববর্ণিত ঘরোয়া আবেষ্টনীর ভিতরেই রহিয়াছে তাহার এই হাল্কা চালের দ্যোতনা। রচনার বিষয়বস্তু, অথবা তাহার কোন একটা বিশেষ দিক লইয়া আমরা কথনই বিচার, চিন্তা বা গবেষণা করিতে বসি না; কোনও একবস্তুতে বা একচিন্তায় আমাদের মনকে গভীর ভাবে নিবিষ্ট না করিয়া আমরা যেন লঘু মনের খুশিতে চলমান বস্তু-প্রবাহ বা জীবন-প্রবাহের দিকে তাকাইতে তাকাইতে চলি।*

আমাদের বাঙলা-সাহিত্যে অবশ্য এই হাল্কা চালের রচনা কম,—ভাবস্থ রচনাই বেশী; পাশ্চাত্ত্য আদর্শে এই হাল্কাচালটি কিন্তু খাঁটি রচনার অপরিহার্য ধর্ম, এই জন্য গভীর চিন্তাশীল লেখাকে আজকালকার দিনে পাশ্চাত্ত্য আদর্শে খাঁটি রচনা বলিয়াই স্বীকার করা হয় না। ইংরেজি রচনাকারগণের নামের তালিকা হইতে বেকনের নামটিও বাতিল হইবার উপক্রম হইয়াছে। কিন্তু আমাদের পরবর্তী ঐতিহাসিক আলোচনায় আমরা দেখিতে পাইব, বাঙলা রচনা-সাহিত্য এ-ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য রচনা-সাহিত্যের আদর্শকে অবলম্বন করিয়াই গড়িয়া ওঠে নাই, এ-ক্ষেত্রে বাঙলা সাহিত্যের স্বাধীন ইতিহাসের ভিতর তাহার স্বধর্ম রহিয়াছে। এই ইতিহাসের আলোচনায় আমরা দেখিতে পাইব, কল্পনার লঘুপক্ষে বিহারজনিত রচনা অপেক্ষা ভাবস্থ ভাবনা অবলম্বনে লিখিত রচনাই আমাদের বেশী। জীবনের পথে লঘুদৃষ্টিতে তাকাইতে তাকাইতে যে মাধুকরী, তাহা লইয়া আমাদের রচনা গড়িয়া ওঠে নাই,—রচনা যেখানে খাঁটি সাহিত্যিক রচনা হইয়া উঠিয়াছে সেখানে সাধারণতঃ বিষয়ের সহিত লেখকের একটা গভীর 'তন্ময়তা' রহিয়াছে; লেখকের যে আত্ম-প্রকাশ তাহা এই 'তন্ময়তা'র ভিতর দিয়া। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার বহু রচনায় পাশ্চাত্ত্য আদর্শ এবং রীতি গ্রহণ করিলেও দেখিতে পাইব, যেখানে তাঁহার রচনা জমিয়া উঠিয়াছে সেখানেই তিনি ধীরে ধীরে তন্ময় হইয়া আসিয়াছেন। আমাদের রচনাকারগণ এই তন্ময়তা-লব্ধ ভাবকেই ভাবনার ভিতর দিয়া বিকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন, এবং তাহার ভিতর দিয়া নিজেকেও বিকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন। ইউরোপীয় সমালোচকগণের ভিতরেও আজকাল কেহ কেহ এই ভাবনিষ্ঠাকেই রচনার অপরিহার্য ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিতেছেন।†

* "It is the humour of Essays......rather to glance at all things with running conceit than to insist on any."—টিউভিল্ (Tuvil)।

† "The comparison makes us suspect that the art of writing has for

লিরিক্‌-ধর্মাক্রান্ত বলিয়া রচনার আয়তন স্বভাবতঃই স্বল্পপরিসরের হয়। মনের ছোট্ট খুশী বা ছোট্ট বেদনা লইয়া আমরা মহাভারত রচনা করিতে পারি না; তাহা করিতে চেষ্টা করিলে একদিকে তাহার ভিতরে আসিয়া পড়িবে চিন্তা, যুক্তি ও তর্কের আধিক্য—অন্যদিকে আসিয়া পড়িতে চাহিবে কৃত্রিমতা এবং কৃত্রিমতা ঢাকিয়া রাখিবার জন্য একটা ক্লিষ্টতা। জীবনের তুচ্ছ ক্ষুদ্র বিষয়গুলিকেও রসঘন করিয়া তুলিতে হইলে বহুক্ষণ বসিয়া তাহাকে ইনাইয়া-বিনাইয়া বলিবার অবসর নাই, কারণ তাহা করিলে মন বক্তব্যের অনর্থক বিস্তারহেতু বিরস এবং ভারাক্রান্ত হইয়া ওঠে। রচনা-সাহিত্যের ভিতরে সর্বদাই তাই পরিধির একটা পরিমিতি রহিয়াছে। প্রবন্ধের ক্ষেত্রে আয়তন কিছু দীর্ঘতর হয়; সে ক্ষেত্রেও সাহিত্যিক প্রবন্ধের একটা সম্পূর্ণ পরিমিতি থাকা উচিত, নতুবা একখানি দীর্ঘ গ্রন্থ হইতে প্রবন্ধকে আমরা পৃথক করিতে পারি না। প্রবন্ধের ক্ষেত্রেও তাহার নাতিদীর্ঘত্ব তাহার সাহিত্য গুণেরই পরিপোষক।

ভাল রচনার গঠনরীতি কিরূপ হওয়া উচিত এ বিষয়ে উপদেশের অন্ত নাই। কি-রকম বিশিষ্ট বিশিষ্ট রীতি এবং সালঙ্কার ওজস্বিনী ভাষা প্রয়োগ করিতে হইবে, তথ্য- এবং যুক্তিতর্ক-পরম্পরাকে কি ভাবে সাজাইয়া গুছাইয়া মূল সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছিতে হইবে, এ-বিষয়ে পাঠশালার গুরুমহাশয় হইতে আরম্ভ করিয়া কেহই কিছু কম ওয়াকিফ্‌হাল নহেন। কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, সত্যকারের রচনাসাহিত্য কোনও নৈয়ায়িক পন্থায় কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হয় না, সুতরাং রচনার গঠনরীতি সম্পর্কে আশৈশব যে সকল উপদেশ-বাহুল্যদ্বারা আমাদের মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত তাহার খুব অল্প অংশই খাঁটি রচনা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সে সকলের দ্বারা আমরা পরীক্ষার খাতায় এবং সাময়িক পত্রে যাহা কিছু রচনা করি তাহা সকলই প্রবন্ধজাতীয়। আমরা দেখিয়াছি, রচনাসাহিত্যের কাজ নিকটতম বন্ধুর মত হৃদয়ের

---

backbone some fierce attachment to an idea. It is on the back of an idea, something believed in with conviction or seen with precision and thus compelling words to its shape, that the divine company which includes Lamb and Bacon, and Mr. Beerbohm and Hudson, and Vernon Lee and Mr. Conard, and Leslie Stephen and Butler and Walter Pater reaches the further shore,"—ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌-এর 'কমন্‌ রিডার' (দি মডার্ণ এস্‌সে, পৃ ২৮১)।

কোমল-গভীর নিভৃত কোণটিকে পাঠকের নিকটে একান্ত অসঙ্কোচে উন্মুক্ত করিয়া ধরা ; আর সাহিত্যের বাহিরের রূপটি যখন তাহার ভাবধর্মের বাহন, তখন রচনার শ্রেষ্ঠ গঠনরীতি খোলা মনে কথা বলিবার রীতি। ইউরোপীয় রচনা-সাহিত্যে তাই কথোপকথনের রীতিকেই শ্রেষ্ঠ রচনারীতি বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। এই খোলামনে কথা বলিবার ভিতরে কোথাও কোন শক্ত বাঁধন নাই ; মন হাস্যে পরিহাসে, বেদনায় অশ্রুতে, আত্মনিমজ্জনের গভীরতায় নিজেকে যেমন করিয়া দৈনন্দিন সংসার-যাত্রার তুচ্ছ ক্ষুদ্র বিষয়গুলিকে অবলম্বন করিয়া একান্ত সহজভাবে প্রকাশ করে, ভাল রচনা-সাহিত্যের প্রকাশধর্মও তাহাই। তবে পূর্বেই বলিয়াছি, এত এলোমেলো আলাপ-প্রলাপ, হাসি-উচ্ছ্বাস,—নৈরাশ্য-বেদনা, গাম্ভীর্য-চপলতা—ইহারা একেবারেই ছন্নছাড়া, খাপছাড়া নহে, ইহাদের সকলের পশ্চাতে থাকে একটা বিশেষ মানসিক অবস্থান, একটা বিশেষ ভাবদৃষ্টি—যে সকল আপাতবিচ্ছিন্ন উপাদানগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া তোলে একটা ঐক্যের বন্ধনে।

রচনা-সাহিত্য আর একপ্রকার সাহিত্যের সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত—ইহা পত্র-সাহিত্য। বাঙলা-সাহিত্যে অবশ্য বিশুদ্ধ পত্র-সাহিত্যের পরিমাণ এত কম যে তাহাকে এক পৃথক শ্রেণীভুক্ত না করিয়া রচনা-সাহিত্যের অন্তর্গত করিয়াই আলোচনা করা যাইতে পারে। রচনা-সাহিত্যের আকৃতি এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে উপরে যত আলোচনা হইয়াছে তাহা হইতেই পত্র-সাহিত্যের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা বোঝা যাইবে ; এই ঘনিষ্ঠতার জন্যই পৃথিবীর অন্যান্য সাহিত্যে পত্র-সাহিত্য অনেক স্থানে উৎকৃষ্ট রচনা-সাহিত্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। আমরা যখন পত্র লিখি তখন তাহার পাঠকরূপে সমগ্র বিশ্ববাসী আমাদের মনে জাগিয়া ওঠে না ; আমরা পত্র লিখি একজনের মুখ স্মরণ করিয়া—সে আমাদের একান্ত প্রিয়জন। সেই একান্ত প্রিয়জনের নিকট কি লিখি ?—লিখি মনের কথা,—জগৎ হইতে এবং জীবন হইতে যতটুকু রত্ন সংগৃহীত হইয়া রহিয়াছে অন্তরের গভীরে, একটু একটু করিয়া সেখানে ডুবিয়া গিয়া আহরণ করি সেই রত্ন—তাহাই আনিয়া নিঃশেষে আবার উপহার দেই প্রিয়জনকে। যাহা কিছু সেখানে লিখি তাহা সম্পূর্ণই আমার কথা, অন্যান্য যত বস্তুর কথা বা ঘটনার কথা সেখানে লিখি তাহা উপলক্ষ্য মাত্র—লক্ষ্য আমার মনের প্রকাশ—আমার সমগ্র ব্যক্তিসত্তার প্রকাশ। নিজেকে কোথাও বাদ-সাদ দিয়া, কাটিয়া-ছাটিয়া, ঢাকিয়া-চাপিয়া,

সাজাইয়া-গুছাইয়া বলিবার কোন প্রয়োজনই বোধ করি না; নির্ভয়ে, অসঙ্কোচে, অকুণ্ঠিত চিত্তে নিজেকে প্রকাশ করি, লিপির প্রতি ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া ওঠে এক হৃদয়ের সহিত অন্য হৃদয়ের নিবিড় যোগ। বহু দূর দেশ-দেশান্তর হইতে হয়ত প্রিয়জনকে পত্র লিখিতেছি,—লিখিতেছি কত দেশের কথা,—তাহার প্রাকৃতিক এবং ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা—সে দেশের লোকজন, আচার-ব্যবহার, সমাজ-শিক্ষা, রাষ্ট্র-ধর্মের কথা; কিন্তু তাহাদিগকে কখনই শুধু সংবাদের মত করিয়া লিখি না,—তাহার সকলের ভিতরে মিলাইয়া মিশাইয়া বিলাইয়া দিই আপনাকে।

পত্র লেখার রীতি কি? গুরু-গম্ভীর চাল,—না সালঙ্কার এবং সাড়ম্বর ভাষা,—না সুচতুর বাক্য-বিন্যাস? ইহার কিছুই নহে। নিজেকে একেবারে একটা রক্তমাংসের গোটা মানুষরূপে প্রকাশ করা। ইহার ভিতরে থাকিতে পারে আপাত-অসংলগ্নতা—মাঝে মাঝে প্রসঙ্গ-চ্যুতি—কিন্তু অকৃত্রিম প্রীতিতে, হাস্যে-পরিহাসে, দুঃখে-বেদনায়, আলাপে-উচ্ছ্বাসে সমস্ত লেখা যেন জীবন্ত হইয়া ওঠে; এই রীতিই রচনার উত্তম রীতি।

হৃদয়ের অকৃত্রিমতাই রচনার ন্যায় পত্র-সাহিত্যেরও প্রাণবস্তু, এবং এই জন্যই জগতের সাহিত্যে খাঁটি রচনা-সাহিত্য যেরূপ বিরল, খাঁটি পত্র-সাহিত্যও সেইরূপ বিরল। পূর্বেই বলিয়াছি, জীবনে যেটা আমাদের দুর্লভ বস্তু, তাহা পাণ্ডিত্য নহে, চাতুর্য নহে—উহা বিশুদ্ধ আন্তরিকতা।

———

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাঙলা প্রবন্ধ ও রচনার উৎপত্তি

আমরা আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনায় রচনা-সাহিত্যের একটা রূপ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছি, এখন আমরা বাঙলায় এই রচনা-সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা প্রবন্ধ এবং রচনার ভিতরে কতগুলি মৌলিক পার্থক্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, এবং এ-কথাও বলিয়াছি যে, আমরা আমাদের রচনা-সাহিত্য সম্বন্ধে যে কোনও সুদৃঢ় এবং সুস্পষ্ট মতামত গ্রহণ করিতে পারি না তাহার একটা প্রধান কারণ প্রবন্ধ এবং রচনার মৌলিক ভেদ বিস্মরণ, এবং তাহারই ফলে একের দোষগুণ অন্যে আরোপ। তবে আমরা প্রবন্ধ এবং রচনার ভিতরে যে পার্থক্য দেখাইয়াছি তাহা তত্ত্বের ক্ষেত্রে যতই স্পষ্ট হোক ইতিহাসের ক্ষেত্রে কোথাও তেমন স্পষ্ট নহে। ইতিহাসের ভিতরে দেখিতে পাইব, বহুক্ষেত্রেই প্রবন্ধ এবং রচনা অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হইয়া রহিয়াছে এবং সাহিত্য হিসাবে আমাদের কাছে যে তাহার মূল্যবোধ তাহাও যৌগিক।

রচনা-সাহিত্যের উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব, রচনা-সাহিত্যের উদ্ভব প্রবন্ধ হইতে এবং বহুদিন পর্যন্ত তাহারা চলিয়াছে এক হইয়া; তাহাদের ভিতরে মৌলিক বিভেদ অনেক পরবর্তী কালের জিনিস। গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসের প্রথম দিকে আমাদের গদ্যলেখা প্রবন্ধের মূলধর্ম অবলম্বন করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল; যত দিন যাইতে লাগিল ততই প্রবন্ধের ভিতরে একটু একটু করিয়া রচনার লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইতে লাগিল; ক্রমে সেই লক্ষণগুলিই বিকাশ লাভ করিয়া একটা বিশেষ পরিণতি লাভ করিল; তখনই ঘটিতে লাগিল প্রবন্ধ ও রচনার ভিতরে বিচ্ছেদ এবং স্থানে স্থানে রচনা প্রবন্ধ হইতে অনেকখানি বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র মহিমায় দেখা দিল। ইউরোপের রচনা-সাহিত্যের উৎপত্তির ইতিহাসও অনেকখানি এইরূপ।* ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে ফরাসী লেখক মন্‌টেইন্‌ যে একটি

* এই প্রসঙ্গে প্রাগুক্ত "দি বিগিনিং অফ দি ইংলিশ এসেস্‌" বইখানি দ্রষ্টব্য।

বিশিষ্টধর্মী রচনা-সাহিত্য গড়িয়া তুলিলেন তাহার কাঠামো যে পূর্বে কিছুই ছিল না একথা বলা যায় না; অবশ্য পূর্ববর্তী কাঠামোর উপরে তাঁহার দান অনেকখানি, সেকথা অস্বীকার কথা যায় না।

সর্বদেশের রচনার মূল উৎস খুঁজিতে গেলেই আমরা দেখিতে পাইব, প্রাচীন নীতিবাক্যগুলিই রচনার আদিম উৎস। আমরা দেখিয়াছি যে রচনা-সাহিত্যের বিষয়-বস্তুর একটা বৈশিষ্ট্য এই, সে মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ। এই নীতিবাক্যগুলিও তাহাই। প্রাচীনেরা তাঁহাদের সমগ্র অভিজ্ঞতার দ্বারা লাভ করিয়াছিলেন জীবনের যে সকল সত্য তাহাই রক্ষিত হইয়াছে এই নীতিবাক্যগুলির ভিতরে। এই নীতিবাক্যগুলিই ক্রমে ক্রমে বিস্তার লাভ করিয়া রচনার আদিরূপ গ্রহণ করিতেছিল। মন্‌টেইনের পূর্বে রচনাকার হিসাবে ল্যাটিন লেখক সিসারো (Cicero, ১০৬—৪৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ) এবং তাঁহার পরে সেনেকার (Seneca, ৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ হইতে ৬৫ খ্রীষ্টাব্দ) নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। সিসারো এবং সেনেকার লেখায় রচনা-সাহিত্যের অনেক লক্ষণ অস্ফুটরূপে বর্তমান রহিয়াছে। তাহার পরই আমরা নাম করিতে পারি প্রাচীন গ্রীক্ লেখক প্লুটার্কের (Plutarch ৪০—১২০ খ্রীষ্টাব্দ)। এই সকল পূর্বসূরিগণ তাঁহাদের অভিজ্ঞতা এবং প্রজ্ঞা মিলাইয়া যে সকল রচনা লিখিয়া গিয়াছেন তাহার ভিতরে তাঁহারা তাঁহাদের জ্ঞানভাণ্ডারই শুধু আমাদের কাছে গচ্ছিত রাখিয়া যান নাই,—তাহার ফাঁকে ফাঁকে রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের ব্যক্তিত্বেরও ছাপ। কিন্তু এই সকল প্রজ্ঞামূলক রচনা হইতেই ইউরোপীয় সাহিত্যে রচনা-সাহিত্যের উদ্ভব হইলেও এই পূর্বভিত্তির উপর মন্‌টেইন্ তাঁহার প্রতিভাবলে অনেকখানি যেন সাহিত্যের একটি অভিনব শ্রেণীর সৃষ্টি করিয়া লইলেন,—এবং পরবর্তিগণ অল্পবিস্তর এই মন্‌টেইনের আদর্শেই প্রভাবিত হইয়া তাঁহাদের রচনা-সাহিত্য গড়িয়া তুলিয়াছেন।

আমাদের বাঙলা-সাহিত্যের ইতিহাস সন্ধান এবং আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, গদ্য-সাহিত্যই আমাদের গড়িয়া উঠিয়াছে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে,—রচনা-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে আরও পরে, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আমাদের গদ্য ভাষা একটু একটু করিয়া প্রবন্ধের উপযোগী হইয়া উঠিতেছিল; তারপর হইতে সেই প্রবন্ধের ভিতর দিয়াই একটু একটু করিয়া প্রকাশ পাইতেছিল রচনার লক্ষণ;

সেই ক্রমবিবর্তমান রচনা-লক্ষণগুলির উপরে আসিয়া পড়িল ইংরেজি রচনা-সাহিত্যের প্রভাব। ক্ষেত্রে উপ্ত বীজ যেমন উপর হইতে এক পশলা বৃষ্টি পাইলে নবীন সঞ্জীবতা ধারণ করিয়া প্রচুর ফসল ফলাইতে থাকে, পাশ্চাত্ত্য রচনা-সাহিত্যের প্রভাবে আমাদের রচনা-সাহিত্যও তেমনই নবীন সঞ্জীবতা লাভ করিয়া শীঘ্রই একটা বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিল।

আপাতদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে রচনা-সাহিত্য বা তাহার কোনও প্রাগ্‌ভাব আমরা আমাদের প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে দেখিতে পাই না। কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইব, রচনা-সাহিত্যের প্রাগ্‌ভাব —অর্থাৎ প্রবন্ধের নমুনা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে একেবারে দুর্লভ ছিল না। অবশ্য প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে, অর্থাৎ সংস্কৃতে, গদ্যের অংশ ছিল অপেক্ষাকৃত কম; ধর্মনীতি, বিজ্ঞান, রাজনীতি, কৃষি, জ্যোতিষ প্রভৃতি সকলেরই সাধারণ বাহন ছিল ছন্দ। সংস্কৃত সাহিত্যে প্রবন্ধের নমুনাও তাই এখানে সেখানে যাহা ছড়াইয়া রহিয়াছে তাহাও ছন্দে; কিন্তু যাহা কিছু ছন্দে রচিত হয় তাহাই কবিতা নহে। এই ছন্দের বহিরাবরণ একটু ফাঁক করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইব, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের বহুস্থানে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ-সাহিত্যের নমুনা রহিয়াছে। প্রাচীন যুগে আমাদের দেশে কোনও মুদ্রণ-প্রণালী প্রচলিত ছিল না—লিখন-পদ্ধতিও ছিল অপেক্ষাকৃত বিরল। বেদ-বেদাঙ্গ, রাজনীতি, সমাজনীতি, ব্যাকরণ, সাহিত্য প্রভৃতি সকলই মেধা দ্বারা স্মৃতির পাতে লিখিয়া রাখিতে হইত। এই কার্য গদ্য অপেক্ষা পদ্যেই অনেক সহজ, এই জন্যই প্রাচীন প্রায় সব কিছুই পদ্যে লেখা। প্রাচীন প্রবন্ধও তাই পদ্যে।

কোনও বিশেষ সিদ্ধান্ত লাভের জন্য সুনিপুণ যুক্তিতর্ককে সাজাইয়া গুছাইয়া গদ্য লেখার নমুনা আমরা সংস্কৃতের ভাষ্যকারগণের লেখায় বহু পাই। এই ভাষ্যগুলির ভিতরে আমরা খুঁজিলে অনেক সময়ে দেখিতে পাইব, মূল সিদ্ধান্তের অন্তর্গত বহু বিষয় সম্পর্কে ভাষ্যকারগণের মতামত পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। আমরা এই বিভিন্ন প্রসঙ্গকে পৃথক্ পৃথক্ এক একটি নাম দিয়া যদি প্রকাশিত করি তবে অনেক স্থানে দেখিব, তাহারা এক একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ প্রবন্ধ হইয়া উঠিয়াছে।* শঙ্করাচার্যের

* এই প্রসঙ্গে প্রিচ্চার্ড (Pritchard) সম্পাদিত "গ্রেট্ এসেস অফ্ অল্ নেশন্‌স" (Great Essays of All Nations) গ্রন্থে প্রাচীন ভারতীয় রচনা-সাহিত্য সম্বন্ধে টমাস্ সাহেবের মতামত দ্রষ্টব্য।

এই জাতীয় আলোচনার ভিতরে ভাষাও অনেকাংশে সাহিত্যের ভাষা হইয়া উঠিয়াছে।

সংস্কৃত সাহিত্যের ভিতরে মহাভারত গ্রন্থখানিকে একখানি রচনার না হোক, প্রবন্ধের কোষগ্রন্থ বলা যাইতে পারে। মহাভারতে 'রাজধর্মানুশাসন পর্ব', 'আপদ্ধর্ম পর্ব', 'মোক্ষধর্ম পর্ব', 'অনুশাসনিক পর্ব', 'অনুগীতা পর্ব' প্রভৃতি পর্বগুলি সত্য সত্যই জগতের এবং জীবনের বিভিন্ন বিষয়ের অবলম্বনে অসংখ্য প্রবন্ধসমষ্টি। এই প্রবন্ধগুলিকে পৃথক পৃথক্ ভাবে রাখিয়া বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাইব, ইহার ভিতরে বহু স্থানে এমন প্রবন্ধের সন্ধান পাওয়া যায় যাহা সিসারো, সেনেকা বা প্লুটার্ক প্রভৃতির লেখা হইতে অধিক মূল্যবান। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, রচনার বিষয়বস্তু সর্বদাই আমাদের অভিজ্ঞতা এবং প্রজ্ঞার উপরে প্রতিষ্ঠিত। মহাভারতের এই সকল পর্ব হইতে যে সকল রচনা খুঁজিয়া বাহির করা যায় তাহাও প্রতিষ্ঠিত বাসুদেব, ব্যাস, ভীষ্ম প্রভৃতি অভিজ্ঞ এবং প্রাজ্ঞ মনীষিগণের অভিজ্ঞতা এবং প্রজ্ঞার উপরে। ভীষ্মদেব যেখানে শরশয্যায় শায়িত থাকিয়া যুধিষ্ঠিরকে ধর্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি জীবনের সর্বক্ষেত্রের সম্পর্কে উপদেশ দান করিয়াছেন সেখানে তাহার প্রতিটি কথা ভীষ্মের প্রজ্ঞার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। মহাভারতের ভিতরে সাহিত্যিক রচনার প্রাক্‌রূপ এই জাতীয় প্রবন্ধের নমুনা স্বরূপে 'রাজধর্মানুশাসন পর্বে' সপ্তনবতিতম অধ্যায়ে 'রাজধর্ম' সম্বন্ধে আলোচনা, ঐ পর্বের নবাধিকশততম অধ্যায়ের 'সত্য ও মিথ্যা' সম্বন্ধে আলোচনা এবং 'মোক্ষধর্ম পর্বে'র 'মোক্ষের অন্তরায়' সম্পর্কিত আলোচনার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের ভিতরে রচনা-সাহিত্য—অন্ততঃ প্রবন্ধের নমুনা অনেক পাওয়া গেলেও তাহাদিগকে আমরা বাঙলা রচনা-সাহিত্যের কোনও পূর্বস্তর বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না; কারণ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ধারার সহিত আমাদের বাঙলা ভাষা বা সাহিত্যের কোনও একটানা অবিচ্ছিন্ন যোগ নাই। ভারতীয় সমাজের যে 'সংস্কৃত জীবন' তাহার অভিজাত সভ্যতা ও সংস্কৃতি সহ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ভিতর দিয়া নিজেকে প্রকাশ করিয়াছিল, বাঁধভাঙা জলের ন্যায় সমস্ত সংস্কারের নিয়ন্ত্রণকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বচ্ছন্দগতিতে তাহারই পাশে সমাজের সাধারণস্তরে ছুটিয়া চলিয়াছিল প্রাকৃত জীবন এবং প্রাকৃত ভাষা ও সাহিত্য। ভাষা ও সাহিত্য হিসাবে আমাদের

সাক্ষাৎ যোগ এই প্রাকৃত ধারার সহিত। এই জন্যই দেখি, সংস্কৃতের কাব্য-কবিতা, নাটক প্রভৃতি যতই সমৃদ্ধ হোক না কেন, বাঙলা-সাহিত্যে তাহার কোনও ক্রমপরিণতি নাই,—বাঙলা-ভাষার জন্মক্ষণ হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙলা-সাহিত্যের ভিতরকার বিভিন্ন জাতীয় সাহিত্যও নবজন্মের পর নূতনভাবে বর্ধিত হইয়া উঠিয়াছে। এই ক্রমবিবর্ধনের ভিতরে সে মাতৃস্বসার নিকট হইতে সাদর উপহার হিসাবে যতই উপজীব্য এবং রত্নসম্ভার লাভ করুক না কেন, মাতৃস্তন্যই তাহার প্রধান উপজীব্য। সুতরাং বাঙলা-সাহিত্যে রচনার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস সন্ধান করিতে হইলে আমাদের অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা গদ্যসাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাসের ভিতর দিয়াই তাহাকে প্রধানতঃ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

বাঙলা সাহিত্যে সত্যকার রচনা-সাহিত্যের যুগ আরম্ভ হইয়াছে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে; ইহার পূর্বে চলিয়াছে প্রবন্ধের যুগ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ এই প্রবন্ধের যুগ। ঐতিহাসিক ক্রমে বাঙলা রচনা-সাহিত্যের আলোচনায় একটা কথা আমাদের বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখা উচিত যে, পাশ্চাত্ত্য রচনাদর্শের সহিত আমাদের রচনাদর্শকে সম্পূর্ণভাবে মিলাইয়া বিচার করিতে গেলে আমরা হয়ত স্থানে স্থানে অবিচার করিব। মন্‌টেইন্‌ পাশ্চাত্ত্য রচনার যে একটা আদর্শ এবং ধরণ প্রবর্তিত করিয়া যান, পরবর্তী কালের পাশ্চাত্ত্য রচনা-সাহিত্য মোটামুটিভাবে সেই আদর্শ এবং ধরণকে স্বীকার করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বাঙলা-সাহিত্যে আমরা মন্‌টেইনের ন্যায় কোন যুগ-প্রবর্তকের নাম করিতে পারি না; এই জন্যই বাঙলা রচনা-সাহিত্য কোনও সুনির্দিষ্ট আদর্শ বা ধরণকে লক্ষ্য করিয়া সুনির্দিষ্ট পথে গড়িয়া ওঠে নাই। ক্রমবিবর্তনের পথে বাঙলা-রচনার একটা স্বধর্ম রহিয়াছে, উহা পাশ্চাত্ত্য রচনাদর্শের যতই নিকটবর্তী হোক, সর্বাংশে এক নহে। বাঙলা রচনা-সাহিত্যের উদ্ভব যেমন প্রবন্ধ-সাহিত্য হইতে, সাহিত্যের ইতিহাসেও এই প্রবন্ধ-সাহিত্য এবং রচনা-সাহিত্য রহিয়াছে বহু স্থানেই অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হইয়া। আমরা আমাদের পরবর্তী আলোচনায়—বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের রচনার আলোচনায় দেখিতে পাইব, আমাদের রচনার আস্বাদনের ভিতর রসের একটা বিমিশ্রতা রহিয়াছে; এই বিমিশ্র আস্বাদনের পশ্চাতে রহিয়াছে যে বিমিশ্র রূপ তাহার ভিতরে প্রবন্ধ-লক্ষণ এবং রচনা-লক্ষণও অলক্ষ্যভাবে যুক্ত হইয়া আছে।

বাঙলা প্রবন্ধ-সাহিত্য হইতেই যখন রচনা-সাহিত্যের উদ্ভব, তখন প্রথমে এই প্রবন্ধ-সাহিত্যের উৎপত্তি এবং পরিণতি সম্বন্ধেই আলোচনা করা যাক। বাঙলার এই প্রবন্ধ-সাহিত্যের ইতিহাসকে শুধু গদ্য-সাহিত্যের ভিতরেই খুঁজিলে আমরা পূর্ণ সত্যকে লাভ করিতে পারিব না। পূর্বে যেমন দেখিয়াছি, সংস্কৃত সাহিত্যের ভিতরে বহু প্রবন্ধ পদ্য-রচনার ভিতরেই ইতস্ততঃ ছড়াইয়া আছে, বাঙলায়ও সেইরূপ কিছু কিছু প্রবন্ধ পদ্যবন্ধে রচিত গ্রন্থগুলির ভিতরে ছড়াইয়া আছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করিয়া বৃন্দাবনদাস-কৃত 'চৈতন্য-ভাগবত' এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ-কৃত 'চৈতন্য-চরিতামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকল গ্রন্থ ছন্দে রচিত হইলেও মূলতঃ এগুলি জীবন-চরিত; অবশ্য বর্ণনার মাধুর্যে এবং ভক্তিরসের সিঞ্চনে এই জীবন-চরিতই বহুস্থানে কাব্যের ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। যে-সকল কারণে সংস্কৃতে রচিত প্রায় সকল গ্রন্থই ছন্দে রচিত, সেই সকল কারণের সহিত আরও কতকগুলি দৈশিক প্রথা যুক্ত হইয়া প্রাচীন এবং মধ্য-বাঙলার সাহিত্যকে একটানা ছন্দে ভাসাইয়া আনিয়াছে। এই চরিত-গ্রন্থগুলি একদিকে যেমন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব এবং তাঁহার সমসাময়িক এবং পরবর্তী প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবগণের জীবন-কাহিনীতে পূর্ণ, অন্যদিকে বহু ভ্রমণকাহিনী এবং তত্ত্বালোচনায় ভরপুর। এই সকল জীবনবৃত্তান্ত, ভ্রমণ-কাহিনী, বা তত্ত্বালোচনার ভিতরে এমন অনেক বর্ণনা পাওয়া যায় যাহা অনেকখানি আত্মসম্পূর্ণ, কৌতূহলোদ্দীপক, বর্ণনার পারম্পর্যে এবং যুক্তিতর্কের সুসঙ্গতিতে অন্বিত। ইহা ব্যতীত এই সকল কাব্যাংশের ভিতরে রচয়িতৃগণের একটা প্রাণস্পর্শও অনেক স্থানে অনুভবযোগ্য। এই সকল বাকাংশকে মূলকাব্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সাবলীল গদ্যে পরিবর্তিত করিয়া লইলে আমরা শুধু 'প্রবন্ধ-সাহিত্য' নয় 'রচনা-সাহিত্যে'রও কিছু কিছু প্রাচীন নমুনা পাইতে পারি। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ষোড়শ শতাব্দীর লোক না হইয়া বিংশ শতাব্দীর লোক হইলে ভাল রচনাকার না হইলেও ভাল প্রবন্ধকার হিসাবে যে খ্যাতি লাভ করিতে পারিতেন তাহাতে আমাদের সংশয় নাই।

সাধারণভাবে আমাদের ভিতরে একটা অস্পষ্ট এবং অদ্ভুত বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, ইউরোপীয় বণিক এবং ধর্মযাজকগণ এদেশে আসিয়া প্রয়োজনের তাগিদে বাঙলাগদ্য-রূপ একটা 'অপূর্ববস্তু'কে নির্মাণ করিয়া লইয়াছিলেন। বাঙলা গদ্যরীতিকে গড়িয়া তুলিতে এই আগন্তুকগণের সাধনা ও সিদ্ধিকে

অস্বীকার করিবার উপায়ও নাই, প্রয়োজনও নাই; কিন্তু তাই বলিয়া একথা মনে করিতে পারি না যে এই বিদেশিগণের আগমনের পূর্বে বাঙলাগদ্য বলিয়া কোন বস্তু আদৌ ছিল না, বা তাহাকে আমরা কোন কাজেই লাগাইতাম না। সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব সাধকগণের রচিত বলিয়া অনুমিত কয়েকখানি গদ্য গ্রন্থ পাওয়া যায়। এই সকল গ্রন্থের প্রামাণিকতা একেবারে সন্দেহাতীত নহে,—তাহাদের রচনাকাল সম্বন্ধেও কোন কথা দৃঢ় ঐতিহাসিক ভিত্তিতে বলা চলে না বটে; কিন্তু তাহার ভিতরে অন্ততঃ দুই একখানি গ্রন্থ সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল, একথা প্রমাণিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ সাহিত্যপদবাচ্য নহে, কিন্তু ইহাদিগের ভিতর দিয়াই আমাদের প্রবন্ধ বা নিবন্ধ-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকল গ্রন্থের ভিতরে কতগুলি বিশেষ বিশেষ তত্ত্ব এবং ধারাবাহিক বর্ণনা সমস্ত রচনার ভিতরে একটা অন্বয় সাধন করিয়াছে। যুক্তি, তথ্য ও বর্ণনার সঙ্গতিদ্বারা লেখাকে সংবদ্ধ করিবার প্রয়াস এখানে শিথিল হইলেও উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে সপ্তদশ শতাব্দীতে দোম আন্তনিও কর্তৃক লিখিত 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিকসংবাদ' গ্রন্থখানি ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে মানোএল-দা-আস্‌সুম্‌প্‌সাম্‌ লিখিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' গ্রন্থখানির উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই যুগে বিদেশী পাদরীগণ রচিত এই জাতীয় আরও দু'এক খানি 'প্রশ্নোত্তর গ্রন্থে'র (Catechism) উল্লেখ পাওয়া গেলেও সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। এই সকল গ্রন্থের একটি মূল প্রতিপাদ্য রহিয়াছে,—তাহা হইতেছে হিন্দুধর্মের সর্ববিধ দোষ বর্ণনা এবং খ্রীষ্টধর্মের গুণকীর্তনের দ্বারা এদেশীয় অন্ধবিশ্বাসিগণের মধ্যে খ্রীষ্টধর্মের প্রতিষ্ঠা। গ্রন্থগুলি প্রশ্নোত্তরচ্ছলে রচিত হইলেও মূল প্রতিপাদ্যটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে লেখকগণকে বহু যুক্তি এবং তথ্যের অবতারণা করিতে হইয়াছে; তাহার ফলে দৃঢ়সংবদ্ধ না হইলেও ইহারা প্রবন্ধাত্মক বা নিবন্ধাত্মক হইয়া উঠিয়াছে। পাদরীগণের ধর্মপ্রচারের আগ্রহাতিশয্য এবং হিন্দুধর্ম-সম্বন্ধে তাঁহাদের অগভীর জ্ঞানের উৎকটতা এই লেখাগুলিকে সাহিত্যপদবাচ্য করিয়া তুলিতে সাহায্য না করিলেও ইহাদিগকে একটা কৌতুকরস দান করিয়াছে।

এই যুগের প্রবন্ধাত্মক লেখাগুলি সম্বন্ধে একটি কথা অবশ্য স্মরণ করা উচিত, সেটি হইল আয়তনের কথা। রচনার আয়তন সম্বন্ধে আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, স্বভাবতঃই রচনা একটি স্বল্পায়তনের ভিতরে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

প্রবন্ধের ক্ষেত্রে আয়তন একটু দীর্ঘ হইলেও তাহারও একটা বিশিষ্ট সীমা থাকা প্রয়োজন; নাতিদীর্ঘ পরিসরের ভিতরে তাহারও স্বয়ং-সম্পূর্ণ হইয়া ওঠা বাঞ্ছনীয়। সেইরূপ নাতিদীর্ঘ পরিসরের ভিতর স্বয়ং-সম্পূর্ণ লেখা এ যুগে আমরা পাই না।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠার সহিত আমাদের বাঙলা গদ্যসাহিত্যের প্রসারের ইতিহাস অবিচ্ছেদ্যরূপে যুক্ত। কিন্তু বাঙলা-সাহিত্যের এই যুগটি 'মাষ্টারি'র দ্বারা একেবারে ঠাসা ছিল; তাই পাদরী, পণ্ডিত এবং মুন্সীগণ মিলিয়া যাহা কিছু লিখিয়াছেন তাহা সবই মূলতঃ 'যুবজনের হিতার্থে'। এই স্কুলপাঠ্য রচনার ভিতরে লেখকের আত্মপ্রকাশের অবসর বিরল, রসপরিবেশনের তাগিদও গৌণ। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, এই প্রতিষ্ঠানকে অবলম্বন করিয়া যে মাষ্টারি-গন্ধী সাহিত্য-সাধনা চলিতেছিল তাহার ক্ষেত্র শুধুমাত্র সিভিলিয়ান্-তৈয়ারীর পাঠ্যপুস্তক রচনাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না; আমরা দেখিতে পাই যে এই কলেজের প্রাচ্যশিক্ষার ধুরন্ধরগণ ছাত্রদের ভিতরে মাঝে মাঝে তর্কসভার ব্যবস্থা করিতেন এবং ছাত্রগণ নির্দিষ্ট কোনও বিষয় সম্পর্কে তাহাদের বক্তব্য প্রবন্ধাকারে লিখিয়া আনিত। কোনও একটি বিতর্কাত্মক বক্তব্যকে গুছাইয়া প্রবন্ধাকারে লিখিবার এই চেষ্টা বাঙলা রচনা-সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে যে বিতর্ক হইয়াছিল তাহার বিষয় ছিল —"Whether the Asiatics are Capable of as high degree of Civilisation as Europeans"। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ তারিখে যে দ্বিতীয় বিতর্ক হয় তাহার বিষয় ছিল "The Distribution of the Hindus into Castes retard their progress in improvement"। এই বিষয়কে অবলম্বন করিয়া জেম্‌স্ হাণ্টার যে প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন ডাঃ শ্রীযুত সুশীলকুমার দে তাঁহার 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা-সাহিত্যের ইতিহাস' (ইংরেজী) গ্রন্থে তাহা তুলিয়া দিয়াছেন।

এই সকল প্রবন্ধ বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাইব, কি ভাষা ও রীতি, কি তথ্যের সংগ্রহ এবং পারিপাট্য, কি যুক্তির সুস্পষ্টতা, কোন দিক দিয়াই ইহারা প্রবন্ধ-সাহিত্যের বিশেষ কোন মূল্য লাভের অধিকারী নহে; তথাপি ইহাদের ঐতিহাসিক মূল্য গণনীয়।

এই বিতর্কসভার জন্য লিখিত প্রবন্ধাবলী ব্যতীত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে

যে সকল গদ্য পুস্তক রচিত হইয়াছে তাহার ভিতরে প্রবন্ধ-সাহিত্যের আভাস দুর্লভ হইলেও তাহার অত্যন্তাভাব নাই। রামরাম বসু রচিত 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত' গদ্যে লিখিত প্রথম 'জীবন-চরিত'। জীবন-চরিতের রচনা-সাহিত্য হইয়া উঠিবার অনেক সুযোগ আছে; কিন্তু রামরাম বসু সে সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন নাই—তাঁহার বর্ণনার স্থানে স্থানে সাহিত্যের অতি অস্পষ্ট রেখাপাত হইয়াছে মাত্র। রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় রচিত 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিতে'রই জ্ঞাতিভাই।

রামরাম বসুর 'লিপিমালা'র অনেক লিপিতেই ইতিহাস, কাহিনী ও কল্পনা-মিশ্রিত রচনা পাওয়া যায়। এই লিপিগুলির অনেকগুলিই আসলে কোন লিপি বা তাহার নমুনা নহে,—এগুলি লিপির ভঙ্গীতে প্রবন্ধেরই প্রাক্‌রূপ। কিন্তু বেশ বুঝা যায় সাহিত্যিক প্রবন্ধ অপেক্ষা আখ্যায়িকা বা 'প্রবন্ধ-কল্পনা'র দিকেই এখন পর্যন্ত এগুলির ঝোঁক বেশী। এযুগের ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলিও প্রধানতঃ আখ্যায়িকামূলক,—তাই সাহিত্যিক প্রবন্ধ অপেক্ষা আখ্যায়িকার সহিতই তাহাদের মিল বেশী।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাদরী, পণ্ডিত এবং মুন্সীগণের ভিতরে একজন লেখকের নাম বাঙলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের সহিত বিশেষভাবে জড়িত, তিনি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি,—খাঁটি রচনা-সাহিত্যের উদ্ভব প্রবন্ধ-সাহিত্য হইতে,—আর প্রবন্ধ-সাহিত্য একটু একটু করিয়া গড়িয়া ওঠে উপদেশমূলক ও নীতিমূলক জ্ঞানগর্ভ লেখা হইতে। প্রবন্ধের প্রাক্‌রূপ এই উপদেশমূলক, নীতিমূলক জ্ঞানগর্ভ লেখার একটি বিশিষ্ট নমুনা মৃত্যুঞ্জয়ের 'প্রবোধ-চন্দ্রিকা'। বাহিরে একটি আখ্যানের শিথিল কাঠামো থাকিলেও 'প্রবোধ-চন্দ্রিকা' সত্য সত্য পূর্বোক্ত উপদেশমূলক এবং নীতিমূলক বিবিধ লেখার একটি সঙ্কলন। 'প্রবোধ-চন্দ্রিকা'র প্রথম স্তবকের দ্বিতীয় কুসুমে বৈজপাল ভূপাল বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁহার পুত্রগণের নিকট যে উপদেশাবলী দান করিয়াছেন, তাহাকে স্বতন্ত্ররূপে বিচার করিলে 'বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা' বিষয়ে একটি জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে কোন কষ্ট হয় না। তৎপরে রাজপুত্রগণের শিক্ষাদানের জন্য নিযুক্ত আচার্য প্রভাকর শর্মা রাজপুত্রগণকে যে বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত উপদেশ দান করিয়াছেন তাহার ভিতরে বিবিধ বিষয়ের বহু অপরিণত প্রবন্ধ ছড়াইয়া

আছে। বিশেষ একটি প্রতিপাদ্যকে আদর্শ রাখিয়া তাহারই অনুকূল তথ্য ও যুক্তির সুসঙ্গত সমাবেশের চেষ্টার ভিতরেই এই সকল লেখার প্রবন্ধত্ব,—অন্য কোন সাহিত্যিক মূল্যের অবশ্য ইহারা দাবী—করিতে পারে না। 'প্রবোধ-চন্দ্রিকা'র রচনাকাল নিশ্চিতরূপে জানা যায় নাই; গ্রন্থখানি মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুর পর ১৮৩৩ সনে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়। উইলিয়ম কেরীর ১৮১৯ সনের ৫ই জানুয়ারীর একখানি পত্রে আমরা জানিতে পারি যে 'প্রবোধ-চন্দ্রিকা' ঐ তারিখের কয়েক বৎসর পূর্বেই রচিত হইয়াছিল।* ১৮১৯ সনেরও কয়েক বৎসর পূর্বে রচিত হইয়া থাকিলে এইজাতীয় প্রবন্ধের প্রাক্‌রূপ-বহুল গ্রন্থ 'প্রবোধ-চন্দ্রিকা'র পূর্বে আর নাই বলিলেই চলে।

'প্রবোধ-চন্দ্রিকা' ব্যতীত মৃত্যুঞ্জয় রামমোহন রায়ের বেদান্ত-গ্রন্থাদির প্রত্যুত্তর স্বরূপ ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে 'বেদান্ত-চন্দ্রিকা' গ্রন্থ রচনা করেন। ইংরেজীতে যে অর্থে Treatise, Discourse বা Dissertation সংজ্ঞার ব্যবহার হয় সেই অর্থে 'বেদান্ত-চন্দ্রিকা' বাঙলা-সাহিত্যের একখানি আদি প্রবন্ধ-গ্রন্থ। এই জাতীয় প্রবন্ধের আদি লেখক হিসাবে রাজা রামমোহনের দাবীই অবশ্য অগ্রগণ্য, কারণ তাঁহার 'বেদান্ত-সার' প্রভৃতি প্রবন্ধপুস্তকগুলি মৃত্যুঞ্জয়ের 'বেদান্ত-চন্দ্রিকা'র পূর্ববর্তী।

এই সময় হইতেই প্রবন্ধ-সাহিত্যকে গড়িয়া তুলিবার নানাভাবে চেষ্টা চলিতেছিল। এইজাতীয় চেষ্টার ভিতরে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃক প্রকাশিত 'দিগ্‌দর্শন' মাসিক পত্রিকাই সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এই মাসিক পত্রিকাখানি মূলতঃ সাহিত্যের ভিতর দিয়া তৎকালীন যুবকগণের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের জন্যই প্রতিষ্ঠিত এবং প্রচারিত হইয়াছিল। বিবিধ জ্ঞানগর্ভ নীতিমূলক এবং কৌতূহলোদ্দীপক প্রবন্ধাবলীর দ্বারা এই পত্রিকা সমৃদ্ধ ছিল। এই পত্রিকায় প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত কতগুলি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই এই পত্রিকার স্বরূপ সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মিতে পারে; যথা—

১। আমেরিকা দর্শন বিষয়ে। ২। হিন্দুস্থানের সীমার বিবরণ। ৩। বিসুবিয়স পর্ব্বত বিষয়ে। ৪। চীনদেশের মহাপ্রাচীর বিষয়ে। ৫। মিশরদেশের স্ফিংক্স। ৬। উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে প্রথম আসিবার কথা। ৭। ভারতবর্ষের স্বাভাবিক বৃক্ষ।

* শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মৃত্যুঞ্জয়-গ্রন্থাবলী'র ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৮। বাষ্পের দ্বারা নৌকাচালানের বিষয়ে। ৯। খ্রীষ্টের পূর্ব্বে পৃথিবীর ইতিহাসের সংক্ষেপ বিবরণ। ১০। য়ীহুদী লোক। ১১। হস্তীর বিবরণ। ১২। চুম্বকমণি। ১৩। মকরমৎসের বিবরণ। ১৪। উভয়দিক নিরীক্ষণের আবশ্যকতা বিষয়ে। ১৫। অয়স্কান্ত মণি। ১৬। লৌহ। ১৭। পরিশ্রমের ফল। ১৮। বেলুনের বিবরণ। ইত্যাদি।

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই, দিগ্‌দর্শনে যত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত তাহা শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞানের নীরস বাহন মাত্র ছিল না, ইহার ভিতরে নানা বর্ণনা এবং উপাখ্যানের ভিতর দিয়া বক্তব্যকে সরস করিয়া প্রকাশ করিবার একটা চেষ্টা ছিল। নিম্নে 'দিগ্‌দর্শনে' প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ যথাযথ উদ্ধৃত করিতেছি। গল্পচ্ছলে প্রবন্ধ লিখিবার এই ভঙ্গিটি এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

পৃথিবী ও তাহার সন্তানেরা

পৃথিবীর এক প্রদেশে এক বৎসর এমত দুঃখ হইল, যে সে স্থানের জীবজন্তু বৃক্ষাদি আপন মাতা পৃথিবীর নিকট স্ব ২ দুঃখ কহিল, প্রথম মনুষ্যেরা কহিল, হে মাতঃ আমরা তোমার প্রিয় সন্তান, আমাদের যে দায় উপস্থিত ইহাতে তুমি কিছু দয়া কর না? যে দয়া ও চেষ্টা ও উপকার পূর্ব্বে করিতা, সে এখন কেন রুদ্ধ হইয়াছে? মরক আমারদিগের নাশ করে; এবং যে কর্ম্মে উদ্যোগ করি তাহা ঝড়ে নাশ করে; অগ্নি ও জল দুই ভূত আমাদিগের প্রতি লাগিয়াছে, এবং এই সকল দুঃখের মধ্যে থাকিয়াও আমাদের এমত ভ্রম আছে, যে আমরা পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহ করি, মাতঃ, আমাদিগের দুঃখ দূর কর, কিম্বা পুনর্ব্বার তোমার উদরে লও।

পরে বন্যপশুরা আসিয়া কহিল; হেঃ মাতঃ পৃথিবি, আমাদিগের প্রতি দয়া কর, আমরা তোমার পুত্র, তোমার ক্রোড়ে শয়ন করি এবং তোমার স্তন পান করি, জলাভাবে মরি, সূর্য্যতেজে দগ্ধ হই, ঝড়বৃষ্টি হইতে আশ্রয় নাই, তৃণাদি ভক্ষণ করিয়া শক্তি পাই না, এবং রোগদ্বারা মরি, এই যে মনুষ্য ইহারাও আপন চাকরের ন্যায় রাখিয়া দুঃখ দেয়, তুমি যদি দয়া না কর, তবে আর এক বৎসরও বাঁচিতে পারি না।

পরে তৃণশস্য মহাবৃক্ষাদি আসিয়া কহিল; হে পৃথিবি, তুমি আমাদিগের মাতা, তোমার উপরে সর্ব্বদা বাস করি, তোমার রসপানে প্রাণ ধারণ করি, আমারদিগের প্রতি দয়া কর, মন্দ বায়ু স্পর্শে মরি, জলাভাবে তৃষ্ণাতে ঘন্ শ্বাস

বহে, অসংখ্য কীটে নষ্ট করে, গো মেষাদিতে চরণদ্বারা পেষণ করে, মনুষ্যেরা পরস্পর যুদ্ধ করিলে তাহাতে পেষা যাই, আমারদিগের এক বংশ নষ্ট হইয়াছে ; যদি তুমি রক্ষা না কর তবে এক বৎসরের মধ্যে সকল নাশ হইবেক।

পৃথিবী উত্তর করিলেন, আমি ছয় হাজার বৎসর নির্ম্মিতা হইয়াছি, ইহার মধ্যে এমত স্থান দেখিলাম না যে এমত নালিস কোন বৎসরে না শুনিলাম ; তথাপি পূর্ব্বেও যেমত ছিল এখনও সেই মত আছে, অদ্যাপি কোন পদার্থ লুপ্ত হয় নাই ; এক বৎসরে যে লুপ্ত হয় দ্বিতীয় বৎসরে সে পুনর্ব্বার জন্মে, শস্য তৃণাদি যদি কোন বৎসরে নষ্ট হয়, তথাপি অন্য শস্যাদির বীজ আমার উদরে আছে, সময় ভাল পাইলে পুনর্ব্বার উঠে, পশু যদি কোন এক বৎসর কোন মতে ন্যূন হয়, তবে শেষ যে থাকে তাহার দ্বারা পুনর্ব্বার পশুজাতি বৃদ্ধি হয়, মনুষ্য কেবল স্বভাব দোষে দুঃখ পায়, তথাপি যদি তাহারা বুঝে ও মনোযোগ করে তবে এসকল দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারে, তোমরা ক্ষান্ত হও, তোমরা দুঃখ পাইতেছ সুখ ভোগও করিতেছ, এবং ঈশ্বর তোমারদিগের সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি তোমারদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতেছেন।

(দিগ্‌দর্শনে, ৪র্থ সংখ্যা)

'দিগ্‌দর্শনে' প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, ইহা মূলতঃ "যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ" হইলেও শুধু বাৎসরিক পরীক্ষার কারখানায় নির্মিত 'স্কুল-মার্কা পেটেণ্ট' রচনা দ্বারাই ইহা পরিপূর্ণ ছিল না,—যাহাতে জ্ঞানলাভের সহিত শিক্ষার্থিগণের কৌতূহল উদ্রিক্ত হয় এবং আনন্দলাভ হয় সেদিকে যথেষ্ট লক্ষ্য রাখা হইত। নানা দেশবিদেশের কথা, নদী-পর্বত, পশু-পাখী, যন্ত্রপাতি, পৃথিবীর প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ আবিষ্কার প্রভৃতি বিষয়ের সহজ অবতারণার ভিতর দিয়া যুবগণের কল্পনা-বিকাশের যথেষ্ট পরিসর এবং অবকাশ দেওয়া হইত। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে 'দিগ্‌দর্শনে' প্রকাশিত 'মকর মৎস্যের বিবরণ' লেখাটি একটা হাল্কা সাবলীল বর্ণনার ভিতর দিয়া সমস্ত বিবরণটিকে সরস করিয়া করিয়া তুলিবার চেষ্টা। কোথাও ছোট ছোট সুন্দর গল্পের ভিতর দিয়া নীতি-উপদেশ পরিবেশন করা হইয়াছে ; এ-জাতীয় রচনার বৈশিষ্ট্য এই, এখানে যে একটি বিশেষ নীতিবাক্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে তাহা বুঝিতে কোন কষ্ট হয় না বটে, কিন্তু সমগ্র রচনাটির ভিতরে নীতি-উপদেশটিই একমাত্র লাভ হয় নাই,

রসের উপরি-পাওনাও রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে একাদশ সংখ্যা 'দিগ্‌দর্শনে'র 'উভয়দিক নিরীক্ষণের আবশ্যকতা' * বিষয়ে রচনাটির উল্লেখযোগ্য।

উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা একথা মনে করিলে ভুল হইবে যে 'দিগ্‌দর্শনে' প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি যথার্থ রচনা-সাহিত্য বা উত্তম প্রবন্ধ-সাহিত্যের কোঠায় আসিয়া পৌছিয়াছে; তবে ইহার পূর্বে প্রকাশিত সকল গদ্য রচনার সহিত তুলনা করিলে এগুলির ভিতরে আমরা দুইটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে পারি। প্রথমতঃ, আমাদের গদ্যরীতি তাহার শৈশব এবং বাল্যের আড়ষ্টতা ছাড়াইয়া উঠিয়া কৈশোরের সহজ চাঞ্চল্য লাভ করিয়াছে; যে-কোন বিষয়ের অবলম্বনে বাঙলাগদ্যে আলোচনা পূর্বাপেক্ষা অনেক সহজ এবং সাবলীল হইয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ একটা সরসতার দ্বারা তথ্য, নীতি, উপদেশ এবং যুক্তিকে মনোরঞ্জক করিয়া তুলিবার একটা প্রয়াসও এযুগের রচনায় ক্রমশঃ পরিস্ফুট

* পূর্বোল্লিখিত 'মকর মৎস্যের বিবরণ' এবং বক্ষ্যমাণ 'উভয়দিক নিরীক্ষণের আবশ্যকতা' প্রভৃতি রচনা এবং অন্যান্য আরও কয়েকটি রচনা রাজনারায়ণ বসু এবং আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের সম্পাদিত রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীতে 'সংবাদ-কৌমুদী'তে প্রকাশিত রামমোহনেরই রচনা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থাবলীতে শেষে 'প্রকাশকের শেষ বিজ্ঞাপনে' বলা হইয়াছে,—"...পরন্তু আমরা সে মূল সংবাদপত্র দেখি নাই। তাহা হইতে কয়েকটি প্রবন্ধ "বঙ্গীয় পাঠাবলী" নামক এক পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে এবং কয়েকটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৭৪ অব্দের প্রবেশিকা পরীক্ষার নির্দিষ্ট বাঙ্গালা পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছিল।" এক্ষেত্রে মনে হয় 'পাঠাবলী'র সঙ্কলয়িতা অথবা রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থাবলীর সম্পাদকদ্বয় কোন ভুল করিয়া থাকিবেন। প্রবন্ধগুলি খুব সম্ভব 'সংবাদ-কৌমুদী' হইতে নহে, 'দিগ্‌দর্শন' হইতে গৃহীত; সম্পাদকগণ যে কয়েকটি প্রবন্ধ এই গ্রন্থাবলীতে তুলিয়া দিয়াছেন তাহার সবগুলিই ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ভিতরে 'দিগ্‌দর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। রামমোহনের 'সংবাদ-কৌমুদী' প্রকাশিত হয় ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে, সুতরাং এ রচনাগুলি যে প্রথমে 'দিগ্‌দর্শনে' বাহির হইয়াছিল, সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। হয়ত পরবর্তী কালে এগুলি 'সংবাদ-কৌমুদী'তে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। 'দিগ্‌দর্শন' শ্রীরামপুর-মিশনের পত্রিকা, আর ধর্মমত লইয়া এই শ্রীরামপুরের মিশনারীদের সহিত রামমোহনের যথেষ্ট মতান্তর এবং লেখালেখি চলিতেছিল; মিশনারীদের প্রচারিত মতের প্রতিবাদের জন্যই রামমোহন বেনামে 'ব্রাহ্মণ-সেবধি' পত্রিকা প্রচার করিয়াছিলেন; সুতরাং রামমোহন নিজে কোন প্রবন্ধ লিখিয়া প্রকাশার্থে 'দিগ্‌দর্শনে' দিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তা ছাড়া রামমোহনের রচনারীতি ও এই প্রবন্ধগুলির রচনারীতি বিলক্ষণ পৃথক্। এই সকল কারণে রামমোহনের গ্রন্থাবলীতে উদ্ধৃত রচনাগুলি রামমোহনের রচনা বলিয়া নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যায় না। এইগুলি এবং 'দিগ্‌দর্শনে' প্রকাশিত এইজাতীয় রচনাগুলি শ্রীরামপুর এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সংশ্লিষ্ট লেখকগণের লেখা বলিয়াই মনে হয়।

হইয়া উঠিয়াছে। পরিণত সাহিত্যের মাপকাঠিতে বিচার করিতে গেলে এই সকল লেখার ঐতিহাসিক মূল্যকেই প্রধান করিয়া দেখিতে হয়; এই সকল *লেখাই পরবর্তী সাহিত্যিক রচনার বনিয়াদকে গড়িয়া তুলিয়াছে,—ইহাদের মূল্য এই দিক হইতেই বেশী করিয়া বিচার করিতে হইবে।*

'দিগ্‌দর্শনে' প্রকাশিত যে-জাতীয় লেখার কথা উপরে আলোচনা করিলাম, এই জাতীয় রচনা ইহার পরবর্তী কালে আরও প্রসার লাভ করিতে লাগিল। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত 'স্কুলবুক সোসাইটি' কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তকগুলিতে এই জাতীয় বহু রচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

স্কুলবুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত 'পশ্বাবলী'তে (১৮২৮) প্রত্যেক সংখ্যায় একটি করিয়া পশু সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। এই সময়ে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে 'বঙ্গদূত' (১৮২৯), 'বিজ্ঞানসার সংগ্রহ' (১৮৩৩), 'জ্ঞানান্বেষণ' (১৮৩১) প্রভৃতি কতগুলি সাময়িক পত্রে নানাবিষয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধাত্মক লেখা বাহির হইতেছিল। এই যুগের স্বনামধন্য সাহিত্যিক ঈশ্বরগুপ্ত মহাশয় পরিচালিত সুপ্রসিদ্ধ 'সংবাদ প্রভাকর' (১৮৩১) পত্রিকায়ও বহুবিধ রচনা প্রকাশিত হইত। বঙ্কিমচন্দ্রের শৈশব-রচনাও ইহাতেই প্রকাশিত হইয়াছিল। ঈশ্বরগুপ্তের নিজের বহু লেখাও এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু ঈশ্বরগুপ্ত কাব্যের ক্ষেত্রে এতখানি খাঁটি বাঙ্গালী কবি হইয়াও গদ্যরচনার ক্ষেত্রে সর্বদাই অনুপ্রাস-যমকাদি-কণ্টকিত একটা কৃত্রিম রীতির পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি নিজেই যে শুধু এই কৃত্রিম রীতিকে অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি এই রীতিরই পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ফলে 'সংবাদ-প্রভাকরে'র গদ্যলেখা যতখানি প্রবন্ধধর্মী এবং রচনাধর্মী হইয়া উঠিবার কথা ছিল, কোথাও তেমন হয় নাই। রীতির কৃত্রিমতায় লেখক এবং বিষয়বস্তু উভয়ই ঢাকা পড়িয়াছে।

এই সাময়িক পত্রকে অবলম্বন করিয়া বাঙলা প্রবন্ধাত্মক লেখার যে ধারাটি চলিতেছিল, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের তের খণ্ডে প্রকাশিত 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' (১৮৪৬-১৮৫০) এই ধারাকে ইতিহাস, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের আলোচনার ভিতর দিয়া অনেকখানি আগাইয়া দিয়াছে। এইজাতীয় প্রচেষ্টা তাহার গৌরবোজ্জ্বল পরিণতি লাভ করিয়াছিল রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে'র (১৮৫১) ভিতরে। সাহিত্যিক রচনাকার হিসাবে আমরা রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে তেমন কোন আসন দিতে পারি না বটে; কিন্তু এই

'বিবিধার্থ-সংগ্রহে'র ভিতর দিয়া বাঙলা প্রবন্ধ-রচনাকে তিনি যে ভাবে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহার জন্য তিনি স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

বাঙলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ও রচনা-সাহিত্যের ইতিহাস ও ক্রমবিকাশের কথা আলোচনা করিতে গিয়া কেরী, মার্শম্যান প্রভৃতি পরবর্তী মিশনারী লেখকদের পাথর-খোঁড়ার সাধনাকে একদম ভুলিয়া গেলে চলিবে না। ইহারা কেহই বড় কোন মৌলিক রচনায় হাত দেন নাই বটে, এবং ইহাদের লেখায় তথ্যের তুলনায় রসের যোগান প্রায় নাই বলিলেও চলে বটে, তবে এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে ইহারা পাথর খুঁড়িয়া পরবর্তীদের পথ নানাভাবে সুগম করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন ইতিহাস, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, শরীরতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে গ্রন্থ,—অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন বানিয়ানের (Bunyan) 'পিল্‌গ্রিম্‌স্ প্রোগ্রেস্' (Pilgrim's Progress), 'এ্যানেক্‌ডোটস্ অফ ভার্চু এ্যাণ্ড ভ্যালার' (Anecdotes of Virtue and Valour) অথবা 'সদ্‌গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস' প্রভৃতি। ইহার ভিতর দিয়া এই সকল লেখক একদিকে যেমন বাঙলা গদ্যকে সর্বপ্রকার বিষয় সম্বন্ধে আলোচনার উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন, অন্যদিকে একটি বিশেষ বিষয়কে অবলম্বন করিয়া ক্রমসংবদ্ধভাবে বহু আলোচনাসম্বলিত গ্রন্থ রচনার একটা ধরণও ইহারা গড়িয়া তুলিতে অনেকাংশে সাহায্য করিয়াছেন। তবে তখন পর্যন্তও ইহাদের লেখা প্রবন্ধের বিশিষ্ট আকারটি গ্রহণ করে নাই।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম যুগের রচনাকারগণ

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বাঙলা প্রবন্ধ-সাহিত্যকে গড়িয়া তুলিবার যে সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চেষ্টা চলিয়াছে তাহার মধ্য হইতে রাজা রামমোহন রায়ের লোকোত্তর ব্যক্তিত্ব স্বমহিমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য এ-কথা সত্য যে রামমোহনের প্রতিভা সমাজ ও ধর্মের ক্ষেত্রে তৎকালীন বাঙলা দেশের —তথা সমগ্র ভারতবর্ষের তমসাচ্ছন্ন আকাশে যেরূপ প্রভাত-সূর্যের দীপ্তি লইয়া ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছিল, সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিভা অনুরূপ উজ্জ্বল নহে। বাঙলার চিন্তা-জগতে তিনি যেরূপ একটি স্পষ্ট নবযুগের প্রবর্তকরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি অনুরূপ কোন স্পষ্ট যুগ-প্রবর্তন করিয়া যাইতে পারেন নাই; প্রসাদগুণ বা প্রাঞ্জলতায় রামমোহনের গদ্য-রীতি যে পূর্ববর্তী লেখকগণের গদ্যরীতির উপরে কোন উন্নতি সাধন করিতে পারিয়াছিল একথাও নিঃসংশয় চিত্তে বলা যাইতে পারে না; তথাপি কতগুলি কারণে রামমোহনের সাহিত্য-সাধনার একটা বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করিতে হয়।

রামমোহন বাঙলার প্রবন্ধ-সাহিত্যকে একটি বিশেষ রূপ এবং একটি বিশেষ শক্তি দান করিয়া গিয়াছেন। এই সময় হইতেই তথ্যের সুসমঞ্জস সমাবেশে এবং যুক্তির দৃঢ়বন্ধনে অন্বিত লেখা সম্বন্ধে 'প্রবন্ধ' সংজ্ঞাটির ব্যবহার দেখা যায়। রামমোহন যুক্তি-সমন্বিত বাক্যাবলী (argument) অর্থে স্থানে স্থানে 'বাক্য-প্রবন্ধ' কথাটির ব্যবহার করিয়াছেন। ক্রমে ক্রমে তথ্যযুক্তি-সমন্বিত আলোচনা-গ্রন্থ অর্থেই এই 'প্রবন্ধ' কথাটি ব্যবহৃত হইতে লাগিল। * এইরূপে একটি বিশেষ জাতীয় লেখা অর্থে 'প্রবন্ধ' কথাটির ব্যবহার ধীরে ধীরে

---

* "লোকেতে বেদান্ত শাস্ত্রের অপ্রাচুর্য্য নিমিত্ত স্বার্থপর পণ্ডিত সকলের বাক্য প্রবন্ধে এবং পূর্ব শিক্ষা ও সংস্কারের বলেতে অনেক অনেক সুবোধ লোক এই কল্পনাতে মগ্ন আছেন ইত্যাদি। 'বেদান্ত-গ্রন্থে'র ভূমিকা।

"চতুর্থ বাক্য প্রবন্ধ এই যে"—ইত্যাদি—ঐ। তু "...ইত্যাদি শাস্ত্রের দৃষ্টান্তস্থলাভিষিক্ত তত্ত্বজ্ঞানিমানিরদের স্বকপোল কল্পিত স্বপ্রয়োজন সিদ্ধি তাৎপর্য্যক বাক্যপ্রবন্ধ কল্পনার খণ্ডনার্থ ইহা লেখা যাইতেছে এমন কেহ মনে করিও না।" মৃত্যুঞ্জয়-রচিত 'বেদান্ত-চন্দ্রিকা'র প্রারম্ভ।

আমাদের সাহিত্যে প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল বলিয়া মনে হয়; বর্তমানে এই বিশেষ অর্থেই 'প্রবন্ধ' কথাটি বাঙলা-সাহিত্যে বহুল প্রচারিত, এ কথার উল্লেখ পূর্বেই করিয়াছি।

বিশেষ কোন প্রতিপাদ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যুক্তিতথ্য-সমন্বিত লেখার চেষ্টা রামমোহনের পূর্বেও কিছু কিছু ছিল বটে, কিন্তু তাহাদের আত্মশক্তি এবং আত্মমহিমায় দৃঢ়পদে দাঁড়াইবার শক্তি ছিল না,—রামমোহন আমাদের গদ্যরচনায় সেই শক্তি সঞ্চার করিয়া তাহাকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করিয়া গিয়াছেন। রামমোহনের চিন্তার বলিষ্ঠতা এবং নৈয়ায়িক সুস্পষ্টতা এবং দৃঢ়বদ্ধতা তাঁহার লেখাকেও একটা বলিষ্ঠতা দান করিয়াছে। চিন্তার এইরূপ গভীরতা এবং তরল উচ্ছ্বাস-হীন অনাড়ম্বর পারিপাট্য ইহার পূর্বে আমাদের সাহিত্যে বিরল। এইজাতীয় চিন্তা এবং ভাবের বাহন হইতে হইতেই ভাষা এবং সাহিত্যের ভিতরে একটা নূতন প্রাণসঞ্চার ঘটে, এই প্রাণশক্তি সাহিত্যে অনেক সময়ে রসের দৈন্যকে ঢাকিয়া রাখিতে পারে; রামমোহন বাঙলা-সাহিত্যে এই বলিষ্ঠ প্রাণ-প্রতিষ্ঠার পুরোহিত ছিলেন।

রামমোহনের যাহা কিছু রচনা তাহার ভিতরে প্রধানতঃ শাস্ত্রলব্ধ উপাদান তাঁহার নিজস্ব ভাবধারা-নিয়ন্ত্রিত যুক্তির দ্বারা গ্রথিত। সুতরাং আমরা পূর্বে বিশুদ্ধ সাহিত্যিক রচনার যে সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া আসিয়াছি তদনুসারে রামমোহনের প্রবন্ধাবলী সাহিত্যিক রচনার কোঠায় আসিয়া পৌছায় না। কিন্তু রামমোহনের সকল লেখা সহৃদয়ের ন্যায় বিশ্লেষ করিলে একটি জিনিস স্বতঃই মনে হয়,—রামমোহনের লেখা শুধু শ্লোককণ্টকাকীর্ণ শাস্ত্রালোচনা মাত্র নহে; রামমোহনের সমগ্র বিদ্রোহি-জীবনের ভিতর দিয়া তিনি লাভ করিয়াছিলেন একটি গভীর বাণী, রামমোহনের এই হৃদয়ের গভীর বাণী তাঁহার সকল যুক্তিতর্ক এবং শাস্ত্রবিচারের পশ্চাতে তাঁহার সমগ্র রচনার একটি পটভূমিকারূপে দাঁড়াইয়া তাঁহার রচনাকে একটি মহিমা দান করিয়াছে।

আরও লক্ষ্য করিতে পারি রামমোহনের রচনাভঙ্গির ভিতরে তাঁহার আত্মশক্তিতে এবং আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ প্রশান্ত গম্ভীর ব্যক্তিত্বের ছাপ। স্বীয় মতবাদ প্রচার করিতে গিয়া দেশী বিদেশী বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসীর নিকট হইতে তিনি যে শুধু প্রতিবাদ লাভ করিয়াছিলেন তাহা নহে,—তিনি নিরন্তর লাভ করিয়াছেন নিন্দা-গ্লানি, বিদ্রূপ এবং পরিহাস। এই সকল নিন্দা-বিদ্রূপের ভিতরে সাধারণ সৌজন্য এবং শালীনতার রীতি যে বহুক্ষেত্রেই রক্ষিত

হইত না এ কথা বলা বাহুল্যমাত্র; কিন্তু এক 'পাষণ্ড-পীড়ন' গ্রন্থের প্রত্যুত্তরে লিখিত 'পথ্যপ্রদান' গ্রন্থের কিয়দংশ ব্যতীত রামমোহনের লেখায় কোন অশোভন অসংযম প্রকাশ পায় নাই; তাঁহার গাম্ভীর্যের মহিমা তাঁহার সকল রচনার ভিতরে প্রস্ফুট।

রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের সাহিত্যে ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, দেশবিদেশের কাহিনী, ভূগোল, জ্যোতিষ প্রভৃতি মানুষের জ্ঞান-ভাণ্ডারের বহু বিভাগ লইয়া বহু প্রবন্ধ বা নিবন্ধগ্রন্থ রচিত হইতে থাকে। এই সকল রচনা-প্রচেষ্টা যে রামমোহনকে কেন্দ্র করিয়াই চলিতেছিল বা রামমোহনের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াই চলিতেছিল এমন কথা বলা যায় না; বিভিন্ন শিক্ষা এবং সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানকে অবলম্বন করিয়াই এই বহুমুখী প্রচেষ্টা চলিতেছিল। তবে একথা ঠিক যে রামমোহন এই যুগে বাঙালীর চিন্তাধারায় একটা নূতন আলোড়ন আনিয়াছিলেন,—তাঁহারই প্রভাবে বাঙলা দেশের ধর্ম, সমাজ এবং নীতির জগতে একটা সংস্কারের আভাস এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটা চিন্তাধারার পরিবর্তন দেখা দিল; অনেকেই স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন আত্মপ্রকাশের সাহস এবং উৎসাহ লাভ করিলেন। রামমোহনের সময় হইতেই বাঙালীর মনীষা-স্ফুরণের স্বুবর্ণ যুগ।

কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, গভীর মনীষার সহিত সুকুমার সাহিত্যিক রচনার কোনও নিত্যব্যাপ্তিযোগ নাই। এই জন্যই এই যুগের অনেক লেখা ধারে এবং ভারে যত শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের বস্তু হইয়া উঠিয়াছে, রসে এবং ব্যঞ্জনায় তেমন প্রীতি ও মমতার বস্তু হইয়া ওঠে নাই। এই যুগের লেখার সহিত বুদ্ধির যোগ যেরূপ সহজ এবং সঙ্গত, হৃদয়ের যোগ তেমন সঙ্গত নহে। মানুষের হৃদয়বৃত্তিটি বোধহয় জগতের সকল বস্তু অপেক্ষা বেশী স্থিতিস্থাপক; তাই তাহার মাত্রা রক্ষা করাও সর্বাপেক্ষা কঠিন কাজ। এই জন্যই বোধহয় নবযুগে নবভাবে হৃদয়বৃত্তির অনুশীলনের পূর্বে বিবিধ ভাবে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত এবং শাণিত করার প্রয়োজন ছিল।

এই প্রসঙ্গে ওই যুগের গদ্য সাহিত্যের একজন পথিকৃৎ রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়। তাঁহার লেখাগুলি প্রায় সবই প্রবন্ধাত্মক,—অনেক ক্ষেত্রে সংগ্রহ-মূলক, সুতরাং তাঁহার লেখাও বিশুদ্ধ সাহিত্যের কোঠায় আসিয়া পৌছায় নাই। কিন্তু রচনাসাহিত্য না হোক, প্রবন্ধ জাতীয় লেখাকে গড়িয়া তুলিতে কৃষ্ণমোহনের প্রচেষ্টাকে

সাধুবাদের সহিত স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। ধর্মপ্রচার এবং বিদ্যাপ্রচারই ছিল তাঁহার জীবনের সাধনা,—বাঙলা-গদ্যের ভিতর দিয়া সেই সাধনা প্রকাশ লাভ করিয়া বাঙলা প্রবন্ধাত্মক লেখাকেও খানিকটা আগাইয়া দিয়াছে।

রামমোহন রায়ের পরবর্তী কালকে অনেকেই বাঙলা-সাহিত্যে 'তত্ত্ব-বোধিনী'র যুগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই নামকরণ সমীচীন বলিয়াই মনে হয়; কারণ, এই যুগের প্রধান সাহিত্য-রথিগণ, যথা, অক্ষয়কুমার, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির সাহিত্য-সাধনা এই 'তত্ত্ববোধিনী'কে কেন্দ্র করিয়াই দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছিল। শুধু 'তত্ত্ববোধিনী' নয়, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত প্রধানতঃ সাময়িক পত্রিকাকে অবলম্বন করিয়াই আমাদের সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছে। এই সকল সাময়িক পত্রিকায় এক শতাব্দীর বেশীকাল বহুবিধ রচনা বাহির হইয়াছে; কিন্তু চালুনী দ্বারা ছাঁকিয়া তুলিলে সত্যকারের সাহিত্যিক রচনার পরিমাণ খুব বেশী হইবে না। সাময়িক পত্রকে অবলম্বন করিয়া সাহিত্য রচনার গুণও আছে, দোষও আছে। এক দিকে সাময়িক পত্রিকাগুলি যেমন অনেক সময় একটা সাহিত্যিক সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিয়া সাহিত্যকে গড়িয়া তুলিতে উৎসাহিত করে, অন্যদিকে অনেক সময় আবার সে 'সাময়িক সাহিত্য'ই গড়িয়া তোলে, যথার্থ সাহিত্য গড়ে না। একজন ইংরেজ সমালোচক বলিয়াছেন,—সাহিত্য এবং সাংবাদিকতা এই উভয়ের ভিতরে সবচেয়ে বড় পার্থক্য এই যে সাহিত্য চিরস্থায়ী। যে সাহিত্য বেশী দিন টেকে না তাহাই সাংবাদিক রচনা, যে সাংবাদিক রচনা টেকে তাহাই সাহিত্য।

সাময়িক পত্রিকা হিসাবে 'তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা'র বৈশিষ্ট্য এইখানে যে ইহাতে এমন বহু রচনা বাহির হইয়াছে যাহা আজ পর্যন্ত টিকিয়া আছে এবং আশা করা যায় যে আরও টিকিবে; সুতরাং ইহাতে যে সকল রচনা বাহির হইয়াছে তাহার কিছু অংশ সাহিত্য-গুণবিশিষ্ট।

রচনাকার হিসাবে এই যুগের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য লেখক মহর্ষি

* "Critics are sometimes inclined to forget that the only important distinction between journalism and literature is that literature lasts. Literature that does not last is journalism. Journalism that lasts is literature."—লিণ্ড্।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর,—ইহারা সকলেই সংস্কার-পন্থী লেখক ছিলেন। এই সংস্কারপন্থী লেখকগোষ্ঠীর কিছু পূর্বেকার প্রাচীনপন্থী একজন গদ্যলেখকের নাম করা যাইতে পারে, যাঁহার লেখনভঙ্গিতে দু'এক স্থানে রচনা-রীতির একটা সরসতা এবং প্রচ্ছন্ন পরিহাসকুশলতার আভাস রহিয়াছে। ইনি হইতেছেন 'সমাচার চন্দ্রিকা'র সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'কলিকাতা কমলালয়ে'র নামকরণ বিষয়ে তিনি গ্রন্থের প্রারম্ভে যে অবতরণিকা দিয়াছেন তাহা কিঞ্চিৎ উপভোগ্য এবং সে যুগের পক্ষে (১৮২৩?) প্রশংসার্হও বটে। নিম্নে সেই অংশটি তুলিয়া দিতেছি।

কলিকাতা কমলালয়

"কলিকাতার সাগরের সহিত সাদৃশ্য আছে তৎপ্রযুক্ত কলিকাতা কমলালয় নাম স্থির হইল, কমলা লক্ষ্মী তাঁহার আলয় এই অর্থদ্বারা কমলালয় শব্দে যেমন সমুদ্রের উপস্থিতি হইতেছে তেমন কলিকাতার উপস্থিতিও হইতে পারে অতএব কলিকাতা কমলালয় শব্দের যোগার্থ রহিল।

... ...

সাগরে অপেয় অগাধ জল, বর্ষাকালে তজ্জল নির্গত হইয়া দেশ বিদেশে যাইতেছে ও নানা নদীর সমাগম সাগরে হইতেছে এবং সাগর নানাবিধ রত্নের আকর হইয়াছেন ও দেবাসুর সংগ্রামে সাগর মন্থন হইয়াছিল তাহাতে হলাহল ও অমৃত উঠিয়াছিল এবং সাগর অনুপম ও সর্ব্ব দেশ খ্যাত হইয়াছেন সাগরে হাঁগর কুম্ভীরাদি জলজন্তু বাস করিতেছে ভগবান্ নারায়ণ সাগরবাসী হইয়াছেন ও তথায় লক্ষ্মীও বাস করিতেছেন সাগরে সর্ব্বদা তরঙ্গ ও কল্লোল হইতেছে ইত্যাদি।

... ...

কলিকাতা মুদ্রারূপ অপেয় অগাধ জলে পরিপূরিতা হইয়াছে বৃহৎ কর্মকালে নির্গত হইয়া নানাদিগ দেশগামী হইতেছে নানাবিধ মুদ্রানদীর নিরন্তর গমনাগমন হইতেছে বিবিধ বিদ্যা ও বিদ্বানরূপ বহু রত্ন আছে ইংরাজ নবাব সংগ্রামকালে কলিকাতা মন্থন হইয়াছিল তাহাতে বিষাদরূপ হলাহল ও হর্ষরূপ অমৃত উঠাইয়াছিল কলিকাতা নিরূপমা ও সর্ব্ব দেশ খ্যাতা হইয়াছে পরনিন্দাপরায়ণ অনেক জন হাঁগর কলিকাতা বাস করিতেছে ও

মূর্খরূপ ভয়ানক কুম্ভীর অনেক ব্যাড়াইতেছে লক্ষ্মী সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন তদ্দর্শনে ভগবান নারায়ণও বিগ্রহরূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছেন সর্ব্বদা তুরঙ্গাদি বাহন ও ধনমত্তাদি তরঙ্গ হইতেছে এবং তরঙ্গে কোলাহলেরো বাহুল্য হইয়াছে ইত্যাদি অতএব উভয়ের ধর্ম্ম সাম্যে সমান সংজ্ঞা হইল ইতি।"

অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন চিন্তাশীল পণ্ডিত। পণ্ডিত অর্থে তিনি অযথা অনুস্বার-বিসর্গমিশ্রিত বচনবিলাসী নহেন—যথার্থ জ্ঞানী পুরুষ। তাঁহার জ্ঞানের পরিধি ছিল বিস্তৃত, অনুসন্ধিৎসাও ছিল অদম্য; তাই তিনি তাঁহার সকল রচনায় দেশ-বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান হইতে মণিরত্ন আহরণ করিয়া তৎকালীন যুবকগণের সম্মুখে ধরিতে চাহিয়াছেন। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে চিন্তাশীলতার মিশ্রণ থাকায় তাঁহার এই জাতীয় রচনা শুধুমাত্র সংগ্রহ নহে, —সংগৃহীত জ্ঞানকে তিনি নিজের রাসায়নিক পাত্রে একবার ঢালিয়া সাজিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'চারুপাঠ' (তিন খণ্ড) এবং 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার', 'ধর্ম্মনীতি' প্রভৃতি গ্রন্থ এই জাতীয় লেখা দ্বারাই সমৃদ্ধ। তাঁহার 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' (দুই খণ্ড) যে পাণ্ডিত্য, মনস্বিতা এবং তথ্য-যুক্তিপূর্ণ সুদীর্ঘ ধারাবাহিক রচনা-ক্ষমতার পরিচয় দেয় তাহা সে যুগে দুর্লভ। কিন্তু তাঁহার সকল লেখার ভিতরেই রসব্যঞ্জনার আকর্ষণ অপেক্ষা তথ্যযুক্তির ভারই অনেক বেশী। একটা জিনিস অবশ্য লক্ষণীয় এই যে, তথ্য ও যুক্তিকে স্বল্পপরিসরের ভিতরে গুছাইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধের যে প্রথম পত্তন দেখিয়াছি দিগ্‌দর্শনের ভিতরে, এবং যাহার নমুনা পরে পাওয়া যায় 'স্কুলবুক সোসাইটি' প্রকাশিত কিছু কিছু পাঠ্য পুস্তকের ভিতরে এবং কতগুলি সাময়িক পত্রে, সেই জাতীয় প্রবন্ধ বাঙলা সাহিত্যে একটা বিশেষ পরিণত রূপ লাভ করিয়াছিল অক্ষয়কুমারের হাতে তাঁহার তিন খণ্ডে প্রকাশিত 'চারুপাঠে'র ভিতরে। অক্ষয়কুমারের লেখায় কোন উচ্চ শিল্পসৌন্দর্যের পরিচয় না থাকিলেও তাহা একেবারে সাহিত্য-গুণবর্জিত নহে। তাঁহার গদ্যরীতিতে সমাসবাহুল্য বা আড়ষ্টতাদোষ প্রায় নাই বলিলেই চলে। তাঁহার বর্ণনায় শুধু চিন্তাশক্তি নয়, স্থানে স্থানে সাহিত্যিক কল্পনা-শক্তিরও পরিচয় মিলে। 'চারুপাঠে' প্রকাশিত সুপ্রণালীবদ্ধ এইজাতীয় ছোট ছোট সকল লেখাকে অক্ষয়কুমার 'প্রস্তাব' নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। তখন পর্যন্তও এইজাতীয় লেখা বুঝাইতে 'প্রবন্ধ' বা 'নিবন্ধ' কথাটির ব্যবহার বহু প্রচলিত ছিল না।

অক্ষয়কুমারের এই জাতীয় প্রস্তাবগুলির ভিতরে তৃতীয় খণ্ড 'চারুপাঠে' প্রকাশিত 'স্বপ্নদর্শন' বিষয়ক প্রস্তাবগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমাদের জ্ঞান অনেক সময় তাহার হিরণ্ময়-পাত্রের দ্বারা আমাদের অন্তর্নিহিত ব্যক্তি-পুরুষকে ঢাকিয়া রাখিতে চায়, নতুবা তাহার ভার যেন কমিয়া যায়। তাই যে লেখার ভিতর থাকে মুখ্যতঃ জ্ঞানের প্রকাশ, সেখানে ব্যক্তিপুরুষের পরিচয় সাধারণতঃ থাকে ঢাকা। অক্ষয়কুমারের লেখার ভিতর দিয়া তাই জ্ঞান-বিজ্ঞান পাওয়া যায় অনেক,—কিন্তু লেখার ভিতর দিয়া মানুষটির চিন্তাশীলতা এবং পাণ্ডিত্যের পরিচয় ব্যতীত আর সব পরিচয় রহিয়াছে গৌণ হইয়া। 'স্বপ্নদর্শনে'র ভিতর দিয়া লেখক পাঠকের নিকটে অপেক্ষাকৃত একটু বেশী ধরা দিতে চাহিয়াছেন। যদিও 'স্বপ্নদর্শনে'র সব কথাই একটি রূপকের জালে আবৃত, তথাপি তাহার ভিতর দিয়া লেখকের প্রবৃত্তি ও প্রবণতার আভাস মেলে। তা ছাড়া 'স্বপ্নদর্শনে'র ভাষা শুধু পরিষ্কাররূপে অর্থ প্রকাশের ভাষা নহে,—আমাদের প্রবন্ধ-নিবন্ধের ভাষা ও রীতি যে ক্রমেই সাহিত্যের ভাষা হইয়া উঠিতেছে এখানে তাহারও প্রমাণ মেলে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখার যে অংশ সত্যিকারের সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে তাহা অনুবাদ। এই সকল অনুবাদ শুধু মূলের মাহাত্ম্যেই মহিমান্বিত একথা বলিলে ভুল হইবে। ঈশ্বরচন্দ্রের অনমনীয় কঠোর পৌরুষের মাঝখানে খাত কাটিয়া বঙ্কিম রেখায় প্রবাহিত ছিল একটি স্রোতস্বতী; জনমদুঃখিনী সীতা ও শকুন্তলাকে অবলম্বন করিয়া সেই করুণার ধারা ঢালিয়া দিয়াছেন বিদ্যাসাগর তাঁহার এই অনুবাদের ভিতর দিয়া। এই জন্যই 'সীতার বনবাস' এবং 'শকুন্তলা'র ভাষা শুধু শুদ্ধ বাঙলা নয়, এখানে তাঁহার একটা নিজস্ব রীতি বা 'স্টাইল' গড়িয়া উঠিয়াছে।

আমাদের আলোচনা মুখ্যতঃ বিদ্যাসাগরের লিখিত ছোট বড় 'প্রস্তাব'গুলি লইয়া। বড় 'প্রস্তাব'গুলি সবই সমাজসংস্কার বিষয়ক, সুতরাং সেখানে সাহিত্য বড় হইয়া উঠিতে পারে নাই,—মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে সামাজিক সমস্যা, সিদ্ধান্ত এবং তাহার অনুকূলে প্রতিকূলে যুক্তিতর্ক ও শাস্ত্রীয় তথ্যসমাবেশ। ছোট ছোট 'প্রস্তাব'গুলিও অধিকাংশ সংগ্রহ, বাকিগুলি মুখ্যতঃ সুকুমারমতি বালকগণের 'বোধোদয়ে'র জন্য। পূর্বেই বলিয়াছি, এই জাতীয় স্কুলপাঠ্য প্রবন্ধ বা 'প্রস্তাব'গুলি এ যুগে একটা বিশিষ্ট পরিণতি লাভ করিয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছোট বড় প্রস্তাবগুলি যুক্তিবহুল এবং শাস্ত্রালোচনাপূর্ণ; সাহিত্যগুণ

এ সব স্থলে একান্ত গৌণ ; তবে তাঁহার নামে প্রচলিত আত্ম-চরিতের আরম্ভে বেশ চমৎকার একটি সরলতা এবং পরিহাসকুশলতার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখার ভিতরে ইহার একটা বিশেষ স্থান আছে বলিয়া নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।—

"বীরসিংহের আধক্রোশ অন্তরে, কোমরগঞ্জ নামে এক গ্রামে আছে ; ঐ গ্রামে, মঙ্গলবারে ও শনিবারে, মধ্যাহ্ন সময়ে, হাট বসিয়া থাকে। আমার জন্মসময়ে পিতৃদেব বাটীতে ছিলেন না ; কোমরগঞ্জে হাট করিতে গিয়াছিলেন। পিতামহদেব তাঁহাকে আমার জন্মসংবাদ দিতে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, বলিলেন, "একটি এঁড়ে বাছুর হইয়াছে"। এই সময়ে, আমাদের বাটীতে একটি গাই গর্ভিণী ছিল ; তাহারও আজকাল, প্রসব হইবার সম্ভাবনা। এজন্য, পিতামহদেবের কথা শুনিয়া, পিতৃদেব মনে করিলেন, গাইটি প্রসব হইয়াছে। উভয়ে বাটীতে উপস্থিত হইলেন। পিতৃদেব, এঁড়ে বাছুর দেখিবার জন্য, গোয়ালের দিকে চলিলেন। তখন পিতামহদেব হাস্যমুখে বলিলেন, "ও দিকে নয়, এদিকে এস ; আমি তোমায় এঁড়ে বাছুর দেখাইয়া দিতেছি"। এই বলিয়া, সূতিকা গৃহে লইয়া গিয়া, তিনি এঁড়ে বাছুর দেখাইয়া দিলেন।

"এই অকিঞ্চিৎকর কথার উল্লেখের তাৎপর্য্য এই যে, আমি বাল্যকালে, মধ্যে মধ্যে, অতিশয় অবাধ্য হইতাম। প্রহার ও তিরস্কার দ্বারা, পিতৃদেব আমার অবাধ্যতা দূর করিতে পারিতেন না। ঐ সময়ে, তিনি, সন্নিহিত ব্যক্তিদের নিকট, পিতামহদেবের পূর্ব্বোক্ত পরিহাস বাক্যের উল্লেখ করিয়া বলিতেন, "ইনি সেই এঁড়ে বাছুর ; বাবা পরিহাস করিয়াছিলেন বটে ; কিন্তু, তিনি সাক্ষাৎ ঋষি ছিলেন ; তাঁহার পরিহাসবাক্যও বিফল হইবার নহে ; বাবাজি আমার, ক্রমে, এঁড়ে গরু অপেক্ষাও এক গুঁইয়া হইয়া উঠিতেছেন"। জন্মসময়ে, পিতামহদেব, পরিহাস করিয়া,'আমায় এঁড়ে বাছুর বলিয়াছিলেন ; জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনা অনুসারে বৃষরাশিতে আমার জন্ম হইয়াছিল ; আর সময়ে সময়ে, কার্য্য দ্বারাও, এঁড়ে গরুর পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ, আমার আচরণে, বিলক্ষণ আবির্ভূত হইত।"

বিদ্যাসাগর-লিখিত 'প্রভাবতী-সম্ভাষণে'র ভিতরেও বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্যবর্জিত করুণকোমল প্রাণটির খানিকটা পরিচয় মেলে। লেখাটি উচ্চসাহিত্য-গুণান্বিত না হইলেও লিরিক্‌ধর্মী। অবশ্য এই 'আত্মচরিত' এবং 'প্রভাবতীসম্ভাষণে'র আলোচনা-প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত যে লেখা দুইটি প্রকাশিত হইয়াছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে।* লেখা দুইটির রচনাকাল জানা গেলেও বুঝা যায়, ইহা বিদ্যাসাগরের পরিণত বয়সের লেখা। সে সময়ে বাঙলা-সাহিত্য নানা দিক দিয়াই সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল।

আমরা এপর্যন্ত যত রচনাকারের উল্লেখ এবং আলোচনা করিলাম তাঁহাদের লেখার ভিতরে রচনা-সাহিত্যের উপাদান নানাভাবে ছড়াইয়া আছে, কিন্তু যথার্থ রচনা-সাহিত্য ইহাদের কাহারও রচনায় একটা বিশেষ রূপ বা পরিণতি লাভ করে নাই। কিন্তু এই যুগের একজন লেখকের রচনার ভিতরে রচনা-সাহিত্য সত্যই একটি বিশিষ্ট এবং সার্থক রূপ লাভ করিয়াছিল, তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দেবেন্দ্রনাথের রচনা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া তাঁহার জীবন-চরিতকার শ্রদ্ধেয় অজিতকুমার চক্রবর্তী মহাশয় বলিয়াছেন,—

"…বাংলা গদ্যের প্রথম শিল্পী দেবেন্দ্রনাথ।"

"দেবেন্দ্রনাথের রচনার বিস্তর নমুনা আমরা এই জীবন-চরিতে দেখিতে পাইয়াছি। সেই সমস্ত নমুনাগুলিতেই তাঁহার ব্যক্তিত্বের ছাপ এমন সুস্পষ্ট-রূপে পড়িয়াছে, তাঁহার চিত্তের রূপ লেখার ভিতরে এমন অনায়াসে ধরা দিয়াছে যে তাঁহার সমসাময়িক আর কারো লেখার কথা দূরে থাকুক, আধুনিক কালেরও অল্প লেখক আছেন যাঁহাদের লেখায় সমস্ত মানুষটার ছাপ এমনিভাবে চোখে পড়ে। ইহাকে বলে "স্টাইল"।" আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, এই যে রচনার ভিতর দিয়া লেখকের ব্যক্তিপুরুষের সহজ সরল অনাড়ম্বর প্রকাশ এবং তাহার ভিতর দিয়া লেখক এবং পাঠকের ভিতরে একটা গভীর অন্তরঙ্গযোগ, ইহাই রচনা-সাহিত্যের দুর্লভ গুণ।

আমরা পূর্বে ইহাও দেখিয়াছি যে, অকপট সহৃদয়তাই সমস্ত রচনার প্রাণ।

---

* আত্মচরিত 'বিদ্যাসাগর চরিত' (স্বরচিত) নামে বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর তৎপুত্র নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন ১৮৯১ সনে প্রথম প্রকাশ করেন। 'প্রভাতীসম্ভাষণ'ও বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পরে ১৮৯২ সনে প্রথম 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সুরেশচন্দ্র সমাজপতির মতে ইহা ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত।

রচনাকালে রচনাকারের ব্যক্তিসত্তায় যদি কোনও দ্বৈত বুদ্ধি না থাকে, তবে তাঁহার সাফল্য নিশ্চিত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সমস্ত রচনারই ইহা একটি বিরল বৈশিষ্ট্য যে, কোথাও তাঁহার লেখার ভিতর দিয়া আমরা দুইটি মানুষের সন্ধান পাই না। সমস্ত রচনার ভিতরে প্রতিভাত তাঁহার এক রূপ, সে রূপটিও নিরাভবণ। দেবেন্দ্রনাথ 'মহর্ষি' ছিলেন, এইখানেই কৃত্রিম আড়ম্বরের প্রচুর অবসর ছিল,—কিন্তু আশ্চর্য এই,—ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্যরূপে তাঁহার যে বক্তৃতাবলী তাহাও শুধুমাত্র ধর্মের উচ্চ বেদী হইতে নিম্নের পাপি-তাপীদের প্রতি ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত উপদেশাবলীই নহে, সে বাণী যেন হৃদয় হইতে হৃদয়ে উচ্চারিত পরমাত্মীয় পরমসুহৃদের বাণী। এইজন্য মহর্ষির আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্যরূপে প্রদত্ত ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যানও চমৎকার সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল ব্যাখ্যানের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহারা শাস্ত্রেব ব্যাখ্যান হইলেও শাস্ত্রের কচকচি নহে, শাস্ত্র এখানে অবলম্বন মাত্র, শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া অপূর্ব উন্মাদনায় প্রকাশিত হইয়াছে মহর্ষির ধর্মানুপ্রাণিত ব্যক্তি-পুরুষ। মহর্ষি তাঁহার ব্যাখ্যানের ভিতরে একদিকে যেমন নিজের হৃদয়ের দ্বার একেবারে অকুণ্ঠিতভাবে খুলিয়া দিয়াছেন, অন্যদিকে আবার ভাবগুলিকে সুন্দর করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, এই উভয়গুণেই এই ব্যাখ্যান-গুলি বহুস্থানে সাহিত্যপর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে।—

"ভূলোকে দ্যুলোকে, আকাশে অন্তরীক্ষে, উষাকালে সন্ধ্যাকালে, শ্রদ্ধাবান একনিষ্ঠ ধীরেরা সেই সুপ্রকাশ আনন্দ-স্বরূপ অমৃত-স্বরূপ পরমেশ্বরকে সর্ব্বত্র দৃষ্টি করেন। উষার উন্মীলনের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্য উদিত হইয়া যখন অচেতন প্রাণীদিগকে সচেতন করে, রূপহীন বস্তু সকলকে রূপবান করে, তখন সেই জ্যোতিষ্মান্ সূর্য্যের মধ্যে সেই প্রকাশবান্ বরণীয় পুরুষকে তাঁহারা দেখিতে পান। উষার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্তরাকাশে তাঁহার আলোক প্রকাশ পায়। যিনি সূর্য্যের অন্তরাত্মা, আমাদের অন্তরাত্মা, সকলভূতের অন্তরাত্মা, তিমিরমুক্ত জগতের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রকাশ হয়। তরুণ সূর্য্য-কিরণে সেই জ্যোতির সঙ্গে তাঁহার প্রকাশ হয়। তরুণ সূর্য্য-কিরণে সেই জ্যোতির জ্যোতিকে দেখিতে পাই। উষার সৌন্দর্য্যে সেই সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্য আমাদের নিকটে প্রকাশিত হন। আমাদেব নিমীলিত নয়ন মুক্ত হইবা মাত্র তাঁহার চক্ষু আমাদের উপবে স্থাপিত দেখি। তাঁহার মহিমা সর্ব্বত্রই রহিয়াছে।...সূর্য্যকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কোথায়? সূর্য্য তাঁহাকে

দেখাইয়া দেন। বনের নির্জ্জন বৃক্ষকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কোথায়? তাহা হইতেও উত্তর পাই। তখন দেখিতে পাই, "সএবাধস্তাৎ সউপরিষ্টাৎ সপশ্চাৎ সপুরস্তাৎ সদক্ষিণতঃ সউত্তরতঃ।" তিনি অধোতে তিনি উর্দ্ধেতে, তিনি পশ্চাতে, তিনি সম্মুখে, তিনি দক্ষিণে, তিনি উত্তরে। ভূলোক ও দ্যুলোক তাঁহার এই মহিমা; তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতেছেন; আমাদের কঠিন হৃদয়ের কপাট বদ্ধ করিয়া রাখি বলিয়া সেই জ্যোতির জ্যোতিকে দেখিতে পাই না। সূর্য্যের অভ্যুদয়ের মধ্যে তাঁহার আবির্ভাব। যেমন উষাতে সেই প্রকার সন্ধ্যাতেও তাঁহার প্রসন্ন মূর্ত্তি প্রকাশিত রহিয়াছে। যখন রজনীর ছায়া বসুধাকে শান্তি ও বিশ্রামে নিমগ্ন করে, যখন চন্দ্রমা অনেক সহস্র রশ্মিতে উত্থিত হইয়া জ্যোৎস্না-বর্ষণ করে, যখন তারকাগণ এই নিদ্রিত জগতের প্রহরীরূপে বিরাজ করিতে থাকে, তখন তাহার মধ্যে কাহার প্রকাশ দেখা যায়? 'যশ্চন্দ্রতারকে তিষ্ঠন্ চন্দ্রতারকাদন্তরো যং চন্দ্রতারকং ন বেদ যস্য চন্দ্রতারকং শরীরং যশ্চন্দ্রতারকমন্তরো যময়তি।" যিনি চন্দ্রতারকে থাকিয়া—চন্দ্রতারকের অন্তরে থাকিয়া চন্দ্রতারককে নিয়মে রাখিতেছেন চন্দ্রতারক যাঁহাকে জানে না, চন্দ্রতারক যাঁহার শরীর; তাঁহারই প্রকাশ দেখা যায়।" [প্রথম প্রকরণ, দ্বিতীয় ব্যাখ্যান]

ইহা শুধু আচার্যের নীরস শাস্ত্রবুলি নহে, একটি গভীর রসানুভূতিতে বক্তা এখানে কবি হইয়া উঠিয়াছেন,—সমস্ত ব্যাখ্যানটি তাই লিরিকধর্মী হইয়া উঠিয়াছে। ব্রহ্মবাদ প্রচারকে কিছু সাহিত্য হইয়া উঠিতে আপত্তি নাই, যদি সেই ব্রহ্মবাদ বুদ্ধির উপরে প্রতিষ্ঠিত একটি নীরস তত্ত্বমাত্র না হইয়া গভীর হৃদয়ানুভূতির উপরে প্রতিষ্ঠিত একটা রসব্যঞ্জনাকে দ্যোতিত করিয়া তোলে। সৃষ্টির আদি বর্ণনার ভিতরেও দেখিতে পাই একটা গম্ভীর রসব্যঞ্জনা।—

"এক সময় যখন সকলি অসৎ ছিল, একমাত্র অনাদ্যন্ত নিবিড় অন্ধকার ছিল; তখন সেই সনাতন পুরাণই স্বীয় জ্ঞানজ্যোতিতে বিরাজ করিতেছিলেন। সে সময়কার কি গহন গম্ভীর ভাব! যদি বর্ষা ঋতুর কোন নিশীথ সময়ে কোন উচ্চতর স্থান হইতে চতুর্দ্দিক দর্শন করি—তখন একটি গ্রহ, একটি তারাও আর নয়ন-গোচর হয় না—সমুদয় আকাশ ঘন মেঘে আবৃত, সকলি নিস্তব্ধ, কেবলি অন্ধকার—তখন সেই অন্ধকারের মধ্যে রোমাঞ্চিত শরীরে তটস্থ হইয়া যে স্বয়ম্ভু সনাতন পুরুষের সাক্ষাৎ অনুভব করি; কেবল একমাত্র তিনিই এই জগৎ-

উৎপত্তির পূর্ব্বে আদিম অন্ধকারের মধ্যে স্বীয় সত্যজ্ঞান-জ্যোতিতে প্রকাশমান ছিলেন।

"সতপোঽতপ্যত সতপস্তপ্‌ত্বা সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ। তিনি ইচ্ছা করিলেন —কিছু ছিল না, আর সকলি হইল। তিনি জ্যোতিষ্মান্ সূর্য্যকে সৃজন করিলেন, আর অন্ধকার দূর হইল। সেই চির রজনীর পর প্রথম প্রাতঃকালের কি আশ্চর্য্য শোভা দীপ্তি পাইয়াছিল। সেই নিস্তব্ধ চির-রজনী ভেদ করিয়া নবপ্রসূত তেজঃপুঞ্জ সূর্য্য কোথা হইতে আইল। কোথা হইতে ইহা সহস্র রশ্মি ধারণ করিয়া দিগ্বিদিক্ উজ্জ্বল করিল?"·· [প্রথম প্রকরণ, ত্রয়োদশ ব্যাখ্যান]

বেদ এবং উপনিষদের ঋষিগণ শুধু তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন না, তাঁহারা কবিও ছিলেন; অন্তরের গভীর রসোদ্বোধনকে তাঁহারা ব্যঞ্জিত করিয়াছিলেন তাঁহাদের রচনায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভিতরে এই 'কবি'কে চিনিয়া লইবার মতন কবিপ্রাণ ছিল; তাই তিনি বেদ-উপনিষদের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শুধু তাত্ত্বিক তর্কের ধূলিই ছড়াইয়া দেন নাই,—একজন কবি অপর কবির রচনাকে যেমন করিয়া হৃদয়ে গ্রহণ করেন এবং আপনার হৃদয়ে তাহাকে আবার যেমন করিয়া নূতন ভাবে সৃষ্টি করিয়া বাহিরে প্রকাশ করেন, দেবেন্দ্রনাথও ঠিক তাহাই, করিয়াছেন। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, পণ্ডিতী দার্শনিকতার পরিচয় দেবেন্দ্রনাথের ব্যাখ্যানে বিরল; বরঞ্চ দার্শনিক তত্ত্বের দিক দিয়া বিচার করিলে তাঁহার ব্যাখ্যান অনেক স্থলে অস্পষ্ট এবং দুর্বল মনে হইতে পারে; আমাদের সাহিত্যের দিক দিয়া তাহাতে কোন অলাভ ঘটে নাই; কারণ তত্ত্ব এবং সিদ্ধান্ত যত পাই আর না পাই,—ধ্যানস্তিমিত রসোদ্বেল চিত্তটিকে সুন্দর এবং মধুর করিয়া পাইয়াছি।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের এই জাতীয় রচনা শুধু ভাবের দিক হইতে নহে, ভাষা এবং প্রকাশ-ভঙ্গীর দিক হইতেও রবীন্দ্রনাথের উপরে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতনে'র রচনাগুলিকে দেবেন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যানগুলির পাশাপাশি রাখিয়া বিচার করিলেই এ সত্য সংশয়াতীতরূপে প্রমাণিত হইবে। রবীন্দ্রনাথের রচনার এবং কবিতা ও গানের বহু ভাবধারা মহর্ষির এই সকল রচনার ভিতরে অনুস্যূত রহিয়াছে, সে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া কথাটির উল্লেখমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

দেবেন্দ্রনাথের ধর্মের ব্যাখ্যানগুলি অপেক্ষাও অধিকগুণে সাহিত্যের মূল্যবান সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে তাঁহার "আত্ম-জীবনী"। অবশ্য রচনা-

সাহিত্য রূপে বিচার করিতে গেলে আয়তনের প্রশ্নটা এখানে স্বভাবতঃই আসিয়া পড়ে,—এবং 'আত্ম-জীবনী'কে টুকরা টুকরা করিয়া ভাগ করিয়া না লইলে আমরা তাহাকে রচনা সাহিত্যের পর্যায়ে গ্রহণ করিতে পারি না। মহর্ষির 'আত্মজীবনী' খুলিয়াই যখন প্রথম চোখে পড়ে—

"দিদিমা আমাকে বড় ভাল বাসিতেন। শৈশবে তাঁহাকে ব্যতীত আমিও আর কাহাকে জানিতাম না। আমার শয়ন, উপবেশন, ভোজন সকলই তাঁহার নিকট হইত। তিনি কালীঘাটে যাইতেন, আমি তাঁহার সহিত যাইতাম। তিনি যখন আমাকে ফেলে জগন্নাথক্ষেত্রে ও বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখন আমি বড়ই কাঁদিতাম।"

—তখন বাঙলা সাহিত্যের একটি বিশেষরূপ সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠি। এ যেন হাস্যে, পরিহাসে, আনন্দে-বেদনায় একেবারে প্রাণ খুলিয়া কথা বলা। সমস্তখানি 'আত্মজীবনী'তে লেখক এক একবার করিয়া মনের তলে ডুব দিয়াছেন, আর স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত জীবনের সকল সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, উত্থান-পতনের মণিমাণিক্য লইয়া উঠিয়াছেন—এবং কথার মালা গাঁথিয়া তাহাই পাঠককে উপহার দিয়াছেন। প্রারম্ভেই দেখিতে পাই, পারিবারিক খুঁটি-নাটি বর্ণনায় শৈশব এবং কৈশোরের স্নেহ ভালবাসা, ছোটখাটো সুখ-দুঃখের বর্ণনায় চারিদিকে যেন একটি বাস্তব ঘরোয়া আবেষ্টনীর সৃষ্টি হইয়াছে। এই ঘরোয়া আবেষ্টনীর ভিতরে দেবেন্দ্রনাথ সর্বদা বন্ধুর ন্যায় কথা বলিয়াছেন। এই সকল কথার ভিতরে তিনি সর্বদাই সচেতন ভাবে 'আচার্যদেব' হইয়া বসিয়া নাই,—একদিকে যেমন তিনি ধ্যাননিমগ্ন মহর্ষি, অন্যদিকে তিনি হাস্যোজ্জ্বল জীবন্ত মানুষ। একদিকে যেমন তিনি তাঁহার সকল ব্রহ্মানুভূতির আবেগপূর্ণ বর্ণনা দিয়াছেন, অন্যদিকে আবার তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত সকল ছোটখাটো প্রবৃত্তি এবং প্রবণতাগুলিকেও একেবারে প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিয়াছেন।

দেবেন্দ্রনাথের ধর্মের ব্যাখ্যানগুলির ভিতরে যেমন দেখিয়াছি, অনুভূতির ভাষা দিয়াই তিনি ধর্মের ব্যাখ্যান করিয়াছেন, 'আত্মজীবনী'র ভিতরে তাহাই আরও কবিত্বময় রূপ গ্রহণ করিয়াছে। শৈশবের একটি ধর্মানুভূতি প্রকাশ করিতে গিয়া দেবেন্দ্রনাথ বলিতেছেন,—

"বহুপূর্ব্বে প্রথম বয়সে আমি যে অনন্ত আকাশ হইতে অনন্তের পরিচয় পাইয়াছিলাম, একদিন ভাবিতে ভাবিতে তাহা হঠাৎ আমার মনে পড়িয়া

গেল। আবার আমি একাগ্রমনে অগণ্য গ্রহনক্ষত্রখচিত এই অনন্ত আকাশের উপরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম, এবং অনন্তদেবকে দেখিলাম। বুঝিলাম যে অনন্তদেবেরই এই মহিমা; তিনি অনন্ত-জ্ঞান-স্বরূপ। যাহা হইতে আমরা পরিমিত জ্ঞান ও তাহার আধার এই অবয়ব পাইয়াছি, তাঁহার কোন অবয়ব নাই; তিনি শরীর ও ইন্দ্রিয় রহিত। তিনি হাত দিয়া এ বিশ্ব গড়ান নাই; কেবল আপনার ইচ্ছা-দ্বারা এই জগৎ রচনা করিয়াছেন।"

[আত্মচরিত, বিশ্বভারতী সংস্করণ, পৃ ৫২]

যেখানে পরমত খণ্ডন করিয়া মহর্ষি নিজমত স্থাপন করিবার প্রয়াসী হইয়াছেন সেখানেও তিনি সাহিত্যিক বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ নৈয়ায়িক বৃত্তি গ্রহণ করেন নাই। একটা কবিজনোচিত গভীর অনুপ্রেরণা সর্বদা তাহার রচনাকে সরস করিয়া রাখিয়াছে।

"......কোন কোন পণ্ডিতেরা মোহে মুগ্ধ হইয়া বলেন, প্রকৃতির স্বভাবেতে, জড়ের অন্ধ-শক্তিতে,—কেহ কেহ বা বলেন, কোন কারণ ব্যতীত কেবল কালেরই প্রভাবে, এই প্রকাণ্ড জগৎ চলিতেছে; কিন্তু আমি বলি, পরম দেবেরই এই মহিমা, যাঁহার দ্বারা এই বিশ্ব-চক্র চালিত হইতেছে,...... "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং" যাহা কিছু, সমুদয় জগৎ, প্রাণ-স্বরূপ পরমেশ্বর হইতেই নিঃসৃত হইয়াছে, এবং প্রাণ-স্বরূপ পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিয়া চলিতেছে। "এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট," এই দেবতা বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা সর্ব্বদা লোকদিগের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট হইয়া আছেন। মূলতত্ত্বের এই অকাট্য সত্য সকল ঋষিদিগের পবিত্র হৃদয়ের উচ্ছ্বাস।

"সম্মুখে বৃক্ষ যে আছে, তাহাকে দেখিতেছি। কিন্তু সেই বৃক্ষ যে-আকাশে আছে, সে-আকাশকে আমরা দেখিতেও পাই না, স্পর্শ করিতেও পাই না। কালে কালে বৃক্ষের শাখা হইতেছে। পল্লব হইতেছে, ফুল হইতেছে, ফল হইতেছে; এ সকল দেখিতেছি। কিন্তু তাহার সূত্র সেই কালকে দেখিতে পাই না। বৃক্ষ যে জীবনী-শক্তির প্রভাবে মূল হইতে রস আকর্ষণ করিয়া আপনাকে পুষ্ট করিতেছে, যে শক্তি তাহার প্রতি পত্রের শিরায় শিরায় কার্য্য করিতেছে, সেই শক্তির প্রভাব আমরা দেখিতেছি; কিন্তু সে শক্তিকে আমরা দেখিতে পাই না। যে বিজ্ঞানবান্ পুরুষের ইচ্ছাতে বৃক্ষ এই জীবনী-শক্তি পাইয়াছে, তিনি তো এই বৃক্ষতে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছেন, কিন্তু আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না। "এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু

গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে" এই গূঢ় পরমাত্মা সর্ব্বভূতে, সকল বস্তুতে আছেন, কিন্তু তিনি প্রকাশিত হন না।"…… [আত্ম-জীবনী, পৃঃ ২১১—২১২]

দেবেন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যানে'র এই জাতীয় রচনা সম্বন্ধে অজিতবাবু যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, 'আত্মজীবনী'র এই জাতীয় রচনা সম্বন্ধেও তাহাই প্রযুজ্য। "ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যানে ব্যাখান অংশই সব চেয়ে কম—উপলব্ধির কথাই বেশি। সেই উপলব্ধির পিছনে সুদীর্ঘকালের জ্ঞানের সাধনা ও তপস্যা আছে, নানা সঞ্চয় আছে। সেই পলিতা, তেল, দীপাধার, প্রভৃতি সঞ্চয় ও সংগ্রহের ঠিক মুখে জ্বলিতেছে একটি শিখা, অধ্যাত্ম উপলব্ধির শিখা। সুতরাং তাহার আলোকে সমস্ত লেখা এমন অপূর্ব্ব আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে যে, ষ্টাইল কোথাও টিম্‌টিমে বা নিষ্প্রভ বা দুর্ব্বল হইতে পারে নাই। অধ্যাত্ম উপলব্ধি কোথাও নূতন তত্ত্বের আকারে, কোথাও সৌন্দর্য্য-উপলব্ধির আকারে, কোথাও ভক্তির মধুর উচ্ছ্বাসের আকারে, কোথাও দেশপ্রীতি-উদ্বেলিত স্বদেশের কল্যাণ-প্রার্থনার আকারে—নানা আকারে প্রকাশ পাইয়াছে।"

'আত্মজীবনী'র ভিতরে টুকরা টুকরা অনেক ভ্রমণ-কাহিনী রহিয়াছে; বহুস্থানে এই ভ্রমণ-কাহিনীগুলিও চমৎকার রচনা-সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে। অনেক সাহিত্যেই ভ্রমণকাহিনী রচনা-সাহিত্যের একটি প্রিয় বিষয়বস্তু। ইহার কারণ, প্রথমতঃ ইহাদের ভিতরে আমাদের কোনও গুরুগম্ভীর বক্তব্যই মুখ্য থাকে না,—বিচিত্র অভিজ্ঞতালব্ধ মনের খুশীটাই এখানে সর্বপ্রধান; দ্বিতীয়তঃ এখানে কোন সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর উপরেই আমাদের মনকে সর্বদা কঠোরভাবে নিবদ্ধ রাখিতে হয় না; সার্থক ভ্রমণের ভিতরে যেমন আঁটঘাট বাঁধিয়া কোনওরূপে গন্তব্যস্থলে পৌঁছনোটাই বড় কথা নহে,—সেটাকে উপলক্ষ করিয়া প্রধান হইয়া ওঠে খেয়াল-খুশীতে আশেপাশে ঘুরিয়া ফিরিয়া বিচিত্র অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতার আনন্দ, ভ্রমণকাহিনী বর্ণনার সাহিত্যিক ধর্মটাও সেইরূপ। বর্ণনা হইতে বর্ণনান্তরে প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে খোলা মনে বিচরণ করিয়া আনন্দ দিতে ও পাইতেই আমরা ব্যস্ত। দেবেন্দ্রনাথের অনেকগুলি ভ্রমণকাহিনী বর্ণনার ভিতরে এইসকল গুণ বর্তমান। বর্ণনা করিতে করিতে কোথাও গিয়া তিনি হয়ত কোনও গভীর তত্ত্বে পৌঁছিয়াছেন; কিন্তু সেইটিকেই লক্ষ্য করিয়া তিনি রওনা হন নাই—সে সকল তত্ত্ব বা বাণী চলার পথেই আসিয়া পড়িয়াছে।

দেবেন্দ্রনাথের এই জাতীয় বর্ণনার একটি বৈশিষ্ট্য এই, তিনি এপাশে-

সেপাশে তাকাইয়া চলতিপথের সমস্ত খুঁটিনাটির বর্ণনায়, ছোট ছোট বিচিত্র ঘটনার বর্ণনায়, সমস্ত বর্ণনাটিকে প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিতে পারিতেন। কিন্তু খুঁটিনাটির বর্ণনা করিতে গিয়া কোথাও বেশীক্ষণ দাঁড়াইয়া পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইতেন না। ঘন ঘন উচ্ছ্বাসের আতিশয্যও তাঁহার লেখনীর গতিপথে বাধা হইয়া দাঁড়াইত না। সর্বত্রই একটা বর্ণনার সংযম পরিস্ফুট। এই সকল ভ্রমণ কাহিনীর ভিতরে সিমলার নিকটস্থ হিমালয়ের পাদদেশে ভ্রমণের কাহিনীটিই সর্বাপেক্ষা সুন্দর বলিয়া মনে হয়। সমগ্র বর্ণনাটি স্থানাভাবে তুলিয়া দেখান সম্ভব নহে, * —কাটিয়া ছাটিয়া অঙ্গভঙ্গ এবং রসভঙ্গ করিয়াও লাভ নাই।

এই জাতীয় রচনার ভিতরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আর একটি জিনিস লক্ষ্য করিতে পারি, উহা তাঁহার নিসর্গ-প্রীতি। বিশ্বপ্রকৃতিকে তিনি দুই ভাবে ভালোবাসিয়াছেন,—এক তাহাকে তাহার সকল দৃশ্যবর্ণগন্ধ সুষমায় 'স্বে মহিম্নি' প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া,—আর তাহাকে এক পরমপুরুষের বিলাস-বিভূতিরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া। এই অধ্যাত্মদৃষ্টি তাঁহার মানসদৃষ্টি, কিন্তু এই মানসদৃষ্টি তাঁহার ইন্দ্রিয়দৃষ্টিকে একেবারে গৌণ করিয়া ফেলে নাই। তাই তাঁহার বর্ণনার ভিতরে দেখিতে পাই প্রকৃতির ছবি, প্রতিটি রং, প্রতিটি গান বর্ণনার ভিতরে ফুটাইয়া তুলিতে তাঁহার কি আনন্দ! প্রকৃতির ভিতর দিয়া তিনি এক পরমপুরুষের স্পর্শ লাভ করিতে ব্যাকুল হইলেও, তাহার নিজস্ব বাহিরের রূপকেও তিনি অবহেলা করেন নাই। অন্তর্দৃষ্টি সর্বত্রই মিলিয়া মিশিয়া পরস্পরের পোষকতা করিয়াছে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের রচনার আলোচনা প্রসঙ্গে কতকগুলি ঐতিহাসিক তথ্য আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। বয়সে যদিও দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমার কি বিদ্যাসাগর প্রভৃতি হইতে কিঞ্চিৎ জ্যেষ্ঠ, কিন্তু তাঁহার পরিণত রচনাগুলির ভিতরে 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' বিবৃত হইয়াছিল ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে, প্রকাশিত হইয়াছিল ১৮৬৯-৭২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে; তাঁহার আত্মজীবনীর রচনা সমাপ্ত হইয়াছিল ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে এবং প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মজীবনী' রচিত এবং প্রকাশিত হইবার পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত রচনাবলী প্রকাশিত হইয়াছিল।

* 'আত্মজীবনী', বিশ্বভারতী-সংস্করণ, পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ। এই জাতীয় ভ্রমণবর্ণনা প্রসঙ্গে ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ, এবং দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ (পৃঃ ২৩৬—২৩৯) দ্রষ্টব্য।

চতুর্থ অধ্যায়

বঙ্কিমী প্রভাবের পূর্ববর্তী অন্যান্য লেখকগণ

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সহিত সংশ্লিষ্ট সে যুগের একজন প্রসিদ্ধ লেখক রাজনারায়ণ বসু। রাজনারায়ণ বসুর একটা 'সহ-জ' পরিহাসকুশলতা ছিল, তাঁহার লেখায় ইহা বহুস্থানে একটা মার্জিত সরসতা দান করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার রচনা বিষয়নিষ্ঠও বটে, আত্মনিষ্ঠও বটে। তাঁহার রচনার ভিতর দিয়া মুখ্যতঃ তৎকালীন সমাজ, ধর্ম এবং সাহিত্যের আলোচনাই তিনি করিয়াছেন; কিন্তু এই সকল আলোচনার ভিতর দিয়া তাঁহার পরিহাসকুশলী সরস এবং দরদী ব্যক্তি-পুরুষটি একেবারে চাপা পড়িয়া যায় নাই। রাজনারায়ণের রচনার ভিতরে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁহার 'সেকাল ও একাল' (১৭৯৬ শক) গ্রন্থখানি। এই গ্রন্থের আরম্ভটি দেখিলেই আমরা ইহার স্বরূপ সম্বন্ধে একটা ধারণা করিতে পারিব এবং সেই স্বরূপটির সহিত রচনা-সাহিত্যের সম্পর্কও বুঝিতে পারিব।

"...'সে কাল আর এ কাল' এই নামটাই কৌতুকজনক। বস্তুতঃ আমি আপনাদিগের সহিত কৌতুক ও আমোদ করিব বলিয়াই অদ্য এখানে আগমন করিয়াছি। যেমন সমস্ত দিবস কঠিন পরিশ্রম করিয়া লোকে সন্ধ্যার সময় প্রিয় বন্ধুদিগের সহিত বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করিয়া শ্রান্তি দূর করে, তদ্রূপ আমি হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক বক্তৃতার নিমিত্ত বিবিধ শাস্ত্রান্বেষণ প্রভৃতির কঠিন পরিশ্রম করিয়া, আপনাদের সহিত বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করিবার জন্য অদ্য এই প্রসঙ্গের উত্থাপন করিতেছি।"

এই আরম্ভটি সত্যকার রচনাকারেরই ভঙ্গী, এবং লেখক প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে হাস্যকৌতুকের ভিতর দিয়াই সহজ ভাবে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। প্রকাশ-ভঙ্গীর গুণে গ্রন্থখানির বহুল অংশ যে সাহিত্য পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে এমন কথা বলা যায় না,—তবে স্থানে স্থানে ইহা সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে। রাজনারায়ণ কর্তৃক বর্ণিত 'বুনো রামনাথে'র কাহিনী সুপ্রসিদ্ধ। আরও বহুস্থানে অল্প আঁচড়ে তিনি সুন্দর সামাজিক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। রাজনারায়ণের অন্যান্য রচনার ভিতরেও দেখিতে পাই,

তিনি তাঁহার বক্তব্যের সহিত নিজেকে মিশাইয়া দিতে পারিতেন, কথার সঙ্গে প্রাণের যোগ ছিল। তাঁহার 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা' (১৮৭৮) গ্রন্থের উপসংহারে তিনি বাঙলা ভাষার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, এবং ভবিষ্যৎ গ্রন্থকারগণের নিকটে যে আবেদন জানাইয়াছেন তাহার ভিতর দিয়া তাঁহার চিন্তাশীলতা এবং তাঁহার অন্তরের দরদ উভয়ই সুন্দররূপে প্রকাশ পাইয়াছে। নিম্নে তাহার সামান্য একটু মাত্র উদ্ধৃত হইল।

…"বাঙ্গালা ভাষার ভাগ্যে কি আছে, তা ঈশ্বরই জানেন। হয়ত ভবিষ্যতে উহা ঐ প্রকার সম্পদবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে। কিন্তু এ প্রকার বাহ্য সম্পদ্ আকস্মিক ঘটনার প্রতি নির্ভর করে। আর এক প্রকার সম্পদ্ আছে, তাহা মনুষ্যের যত্নের প্রতি নির্ভর করে। সে সম্পদ আভ্যন্তরীণ; সে সম্পদ সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থদ্বারা ভূষিত হওয়ারূপ সম্পদ্। অদ্য আটাইস বৎসর হইল, মহাত্মা হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থ বক্তৃতায় আমি বলিয়াছিলাম, "যথার্থ বলিতে কি, হোমর, প্লেটো ও সফক্লিজ রচিত চারুতম নিরুপম কাব্যরস-পানের প্রভূত সুখসম্ভোগ করি, কিম্বা চরিত্র বর্ণনা-নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শক সেক্‌স্পিয়রের অমর-ধর্ম্ম-প্রাপ্ত নাটক সকল অধ্যয়ন করিয়া অত্যন্ত উল্লসিত হই, কিম্বা অদ্ভুত সুকল্পনাশক্তি-সম্পন্ন গেটী ও শিলরের কাব্য পাঠ করিয়া আশ্চর্য্যার্ণবে মগ্ন হই, তথাপি এক আশা অপূর্ণ থাকে, এক তৃষ্ণা অনিবৃত্ত থাকে; সেই আশা স্বদেশকে জগজ্জন-পূজ্য বিশালখ্যাতি গ্রন্থকারদিগের যশঃগৌরব দ্বারা প্রফুল্ল দেখিবার আশা; সে তৃষ্ণা স্বদেশীয় সমীচীন কাব্যক্ষরিত অমৃতরস পান করিবার তৃষ্ণা।…"প্রত্যেক ব্যক্তির সম্বন্ধে পৃথিবীর সকল স্থান অপেক্ষা কোন এক বিশেষ স্থান মনোহর। ধ্রুবতারার প্রতি যেমন দিগ্‌দর্শনের শলাকা লক্ষিত থাকে, তেমনি বিদেশ-গত পুরুষের চিত্ত সেই স্থানের প্রতি লক্ষিত থাকে। সেই স্থান তাঁহার স্বদেশ। সেই স্থানের সহিত তাঁহার বালসখিত্ব, সেই স্থানে তাঁহার প্রাণপ্রিয় জনদিগের আবাস। সেই প্রিয়মনোহর স্বদেশ নিরুর্ব্বর ও প্রমোদজনক দৃশ্যশূন্য হইলেও উৎকৃষ্ট অন্য কোন দেশ—এমন কি কাশ্মীরের নির্ম্মল হ্রদ ও মনোহর উদ্যান ও সিরাজের সুচারু গোলাপ-পুষ্পের উপবন ও নেপ্‌লস-সন্নিহিত জলের ও তটের নয়নবিমুগ্ধকর শোভায় হাস্যমান বিখ্যাত উপসাগর পর্য্যন্ত তাঁহার মনকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারে না; এমন স্বদেশ ও স্বজাতীয় ভাষার প্রতি যাহার অনুরাগ নাই তাহাকে কি মনুষ্যমধ্যে বলা যাইতে পারে?"

এই যুগের আর একজন প্রধান রচনাকার ভূদেব মুখোপাধ্যায়। ইনি রাজনারায়ণ বসুর সমাধ্যায়ী। 'এডুকেশন গেজেটে'ই ভূদেবের অধিকাংশ রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল।

ভূদেবের ভিতরে একটি আচারনিষ্ঠ, নিয়মনিষ্ঠ ধীরস্থির 'ব্রাহ্মণ' বাস করিতেন। তিনি যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেটা সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য, চিন্তা—সর্বক্ষেত্রেই একটা বিপুল বিপর্যয়ের যুগ; কিন্তু এই সকল বিপর্যয় ভূদেবের 'ব্রাহ্মণ্য-সত্তা'টিকে দুর্বল ক্রীড়নকের ন্যায় যথেষ্ট দোলা দিতে পারে নাই। তাই বলিয়া ভূদেব এই সকল বিপর্যয়ের হাত এড়াইবার জন্য প্রাচীন শাস্ত্র এবং সংস্কার-বাঁধানো প্রাচীরের দ্বারা নিজেকে চারিদিক হইতে ঢাকিয়া রাখিয়া বাহিরের আলো-হাওয়াবিহীন একটি সঙ্কীর্ণতম কুণ্ডলীর ভিতরে 'গোঁড়া রক্ষণশীল' হইয়া বসিয়াছিলেন, এমন কথা মনে করিলে ভুল হইবে। তিনি হিন্দুর শাস্ত্র, সভ্যতা, ঐতিহ্য, সাহিত্য ও সমাজের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন; ইউরোপীয় শাস্ত্র, সভ্যতা, সমাজ প্রভৃতির সহিতও একান্ত অপরিচিত ছিলেন না; এই নব শিক্ষা ও সংস্কারের ফলে সতীর্থ মধুসূদন খ্রীষ্টান হইয়া সাহেব সাজিয়াছিলেন,—রাজনারায়ণও ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন, কিন্তু ভূদেব তাঁহার সহজাত ধাতুপার্থক্যে 'খাঁটি' হিন্দুই রহিয়া গেলেন। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষার ফল যে তাঁহার উপরে কিছুই হইয়াছিল না, একথা বলা চলে না; পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ফলে তিনি লাভ করিয়াছিলেন স্বাধীন মন, যে মন প্রাচীন বা হিন্দুধর্মের তৎকালীন প্রচলিত সমস্ত আদর্শ ও আচারকে অন্ধের ন্যায় শুধু সংস্কারবশে গ্রহণ করিতে দেয় নাই; প্রত্যেকটি জিনিসের ভাল এবং মন্দ তিনি তাঁহার বিচার এবং অভিজ্ঞতার তৌলদণ্ডে নিপুণভাবে ওজন করিয়া গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ভূদেবের অধিকাংশ লেখার ভিতর দিয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এই নৈষ্ঠিক সদাচারী 'হিন্দু'টি। ভূদেবের শুভ্র পরিচ্ছন্ন চিন্তা, পরিমিত, সংযত অথচ প্রাঞ্জল ভাষণের ভিতর দিয়া যে রীতি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার উপরেও এই নৈষ্ঠিক সদাচারী হিন্দুত্বের স্পষ্ট ছাপ পড়িয়াছে। ভূদেবের রচনা সমূহকে আমরা সাধারণতঃ তিনভাগে ভাগ করিতে পারি; প্রথতঃ তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্যের অবলম্বনে (বিশেষ করিয়া ভবভূতির 'উত্তর-রামচরিত', শ্রীহর্ষদেবের 'রত্নাবলী' ও শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' নাটক) সাহিত্য-সমালোচনা। সমালোচনার ভিতর দিয়া ভূদেব বহুস্থানে তাঁহার কাব্যাস্বাদন-শক্তি এবং

কাব্যবিচার-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার দ্বিতীয় ধরণের লেখা মূলতঃ স্মৃতি এবং হিন্দুর অন্যান্য শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া নানাভাবে বাস্তব জীবনে হিন্দুত্বের প্রতিষ্ঠা করা। ভূদেবের তৃতীয় ধরণের লেখাকেই আমরা সাহিত্যিক রচনা বলিয়া গ্রহণ করিব; মানুষ ভূদেবের পরিচয় এই লেখাগুলির ভিতর দিয়া। পরিবার, ধর্ম্ম, সমাজ, জাতি প্রভৃতি সম্বন্ধে ভূদেবের রচনাগুলি স্বল্পায়তন রচনা-সাহিত্যের পক্ষে বেশ উপযোগী হইয়াছে। এই রচনাগুলির ভিতরে একদিকে যেমন ভূদেবের সুনিপুণ আত্মদৃষ্টির এবং বিশ্লেষণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, অন্যদিকে সকল চিন্তা এবং যুক্তির পশ্চাতে ভূদেবের সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতাও বেশ স্পষ্ট হইয়াছে। ব্যক্তিজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার উপরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ভূদেবের নীতিকথাও কথামাত্রে পর্য্যবসিত হয় নাই,—তাহারও একটা ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যান্বিত আকর্ষণ রহিয়াছে।

ভূদেব তাঁহার এইজাতীয় রচনাগুলিতে কখনও সম্পাদকীয় বারোয়ারী 'আমরা'র ব্যবহার করেন নাই, রচনার ভিতরে তিনি সর্ব্বদাই নিরাভরণ 'আমি'। এই বারোয়ারী 'আমরা'র ভিতরে যে একটা যবনিকা থাকে তাহা অনেক ক্ষেত্রেই কৃত্রিম; সৌজন্য এবং বিনয়ের জন্য এই 'আমরা' প্রবন্ধ-নিবন্ধাদিতে যতই বরণীয় হোক, রচনার ভিতরে অনেক সময়েই সে লেখক এবং পাঠকের ভিতরে একটা অযথা ব্যবধান। 'অহং'এর উগ্রতাকে প্রশমিত রাখিয়া 'আমি' ভূদেবের রচনার ভিতরে অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে।

ভূদেবের রচনার একটি প্রকাণ্ড দোষ এই, ভূদেব বড় বেশী কেজো মানুষ ছিলেন,—আমরা আজকাল যাহাকে বলি 'প্রাক্‌টিক্যাল্'; এই নিরবচ্ছিন্ন কেজো মানুষটি তাঁহার রচনাগুলিকেও বড় কেজো করিয়া রাখিয়াছেন,—হাঁপ ছাড়িবার অবসর কম,—কেবল কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বেড়াজাল। তবে ভূদেবের রচনাভঙ্গীর ভিতরে বহুস্থানে একটা সহজ কথোপকথনের রীতি রহিয়াছে; পাঠকের সহিতও তাঁহার একটা বন্ধুজনোচিত সহৃদয়তা রহিয়াছে; এই উভয় গুণ মিলিয়া বিধি-নিষেধের প্রভুসম্মিত বাক্যকে সুহৃৎসম্মিত করিয়া তুলিতে সাহায্য করিলেও এতখানি কেজোমি যে ভূদেবের রচনাকে স্থানে স্থানে নীরস করিয়া তুলিয়াছে একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কাজের কথার ভিড়ে ভিড়ে ভূদেব স্থানে স্থানে যেন বেশী 'গদ্যাত্মক' হইয়া পড়িয়াছেন।

ভূদেবের রচনায় সাহিত্যের দিক হইতে আর কিছু অসৌষ্ঠব ঘটাইয়াছে তাঁহার আষ্টেপৃষ্ঠে-ললাটে অঙ্কিত হিঁদুয়ানি। অবশ্য পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই

হিঁদুয়ানির ভিতরে রক্ষণশীলতা যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলেও গোঁড়ামির সঙ্কীর্ণতা খুব বেশী ছিল না; কিন্তু তথাপি তাঁহার রচনা পড়িতে পড়িতে মনে হয়, যখনই তিনি আসিয়া মনের সম্মুখে দাঁড়াইতেছেন, তখনই তাঁহার ব্রাহ্মণ্যবেশ,—মনে হয়, খোলা-মেলা শুধু মানুষটিকে বড় কম দেখিলাম।

ভূদেবের আর একটি বিশেষ রচনার উল্লেখমাত্র করিয়া ভূদেবপ্রসঙ্গ শেষ করিব। এ রচনাটি ভূদেবের 'পারিবারিক প্রবন্ধে'র 'উৎসর্গ'-ছলে প্রাক্‌কথন। ভূদেবের রচনারীতি সাধারণতঃ আবেগের রীতি নয়,—গুছানো বাক্যালাপের রীতি। কিন্তু এই রচনাটি গূঢ়বক্তব্যবহুল হইয়াও আবেগময়ী রীতিতে এবং কল্পনার নৈপুণ্যে অনেকখানি কাব্যধর্মী হইয়া উঠিয়াছে।

এই যুগের শ্রেষ্ঠ রচনাকার বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে আর একজন লেখকের আমরা উল্লেখ করিতে চাই, তিনি 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'কার কালীপ্রসন্ন সিংহ। রুচিবৈগুণ্যের জন্য তিনি সাধু সাহিত্যিক আসরে অনাদৃত; কিন্তু রুচিবৈগুণ্য সত্ত্বেও তিনি রচনাকাররূপে যে ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা মোটেই অবজ্ঞেয় নয়।

প্রথমেই হয়ত প্রশ্ন উঠিতে পারে, আমরা হুতোম প্যাঁচা বেশধারী কালীপ্রসন্ন সিংহকে আদৌ রচনাকার বলিতেছি কেন। জাতি বিবেচনা করিতে গেলে আমাদের বিবেচনায় হুতোমের নক্সাগুলি তাহার সমস্ত দোষগুণ লইয়া রচনার পর্যায়েই পড়ে। হুতোমের পূর্ববর্তী লেখক প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁহার এই জাতীয় লেখায় 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাস জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু হুতোমের সে আদর্শ বা সঙ্কল্প আদৌ ছিল বলিয়া মনে হয় না। ব্যঙ্গাত্মক রচনার ভিতর দিয়া তিনি তৎকালীন কলিকাতার সমাজের উপরে লেখনীর কশাঘাত চালাইতে চাহিয়াছেন। এই জন্যই উপন্যাসের দৃষ্টিতে 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'কে বিচার করিতে গেলে আমরা হুতোমের উপরে অবিচার করিব।

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' যে-জাতীয় ব্যঙ্গাত্মক রচনা, সে জাতীয় রচনার প্রথম লেখা প্রমথ শর্মা নামধারী ভবানীচরণের 'নববাবু বিলাস' এবং 'নববিবি বিলাস'; * কিন্তু ইহার কোন গ্রন্থই সাহিত্য হইয়া ওঠে নাই,—শুধু

* ভবানীচরণের পূর্বেও এজাতীয় রচনা কিছু কিছু প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ-বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'নববাবুবিলাসে'র ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

অশ্লীলতাদোষদুষ্ট বলিয়া নয়,—বিশেষ সাহিত্যিকগুণবর্জিত বলিয়াই। ইহার পরে এই জাতীয় রচনা প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' ; জাতিতে তাহা উপন্যাসই বটে। কিন্তু 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' রচনা-সাহিত্যেরই নমুনা, এবং দোষদুষ্ট হইয়াও স্থানে স্থানে বিরল সাহিত্যিকগুণের অধিকারী হইয়া উঠিয়াছে।

'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র লেখক তৎকালীন ধনী অভিজাত সম্প্রদায়কে অবলম্বন করিয়া তৎকালীন বঙ্গসমাজের—বিশেষতঃ কলিকাতার সমাজের ঘৃণ্য বিলাসিতাপূর্ণ এবং নীতিবিবর্জিত সমাজেরই কয়েকটি 'নক্শা' আঁকিতে চাহিয়াছেন। বিদ্রূপের কশাঘাতের ভিতর দিয়া সমাজের আত্মচেতনা ফিরাইয়া আনা এবং 'সুবুদ্ধি'র উপর তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করাই লেখকের উদ্দেশ্য। কিন্তু উদ্দেশ্যমূলক লেখা হইলেও উদ্দেশ্যটিই এখানে একমাত্র বস্তু হইয়া দাঁড়ায় নাই, উপায়টিও স্থানে স্থানে নিপুণ হইয়াছে,—এইখানেই ইহার সাহিত্যবাচকতা। 'নক্শা' আঁকিতে বসিয়া হুতোম বহুস্থানে কথার রঙেরেখায় সত্যই 'নক্শা' আঁকিতে পারিয়াছেন, ইহা তাঁহার যথেষ্ট কৃতিত্ব। প্রথমেই যেখানে চৈত্র-সংক্রান্তির 'চরক-পার্বণে'র বর্ণনা করিয়াছেন সেখানে সমস্ত খুঁটিনাটি বর্ণনার ভিতর দিয়া যে সজীব চিত্র লেখক অঙ্কন করিয়াছেন কালীপ্রসন্নের পূর্ব্বে এজাতীয় ভাষা-চিত্রের সজীবতা দুর্লভ। শুধু খুঁটিনাটি বর্ণনায়ই চিত্র ফোটে না, দৃশ্য বা ঘটনার নিঃশেষ তালিকা কোন চিত্র আঁকিতে পারে না ; ছোট বড় সকল দৃশ্য এবং ঘটনাগুলিকে কি ভাবে সাজাইলে তাহা প্রত্যক্ষ ছবি হইয়া উঠিতে পারে, ইহা সূক্ষ্ম নৈপুণ্যের অপেক্ষা রাখে। দু'এক স্থানে কালীপ্রসন্ন এই নৈপুণ্যের বেশ পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু কালীপ্রসন্নের এইজাতীয় চিত্রের অসৌষ্ঠব হইয়াছে তাঁহার অতিবর্ণন, অতিভাষণ এবং অশ্লীলতা। এই জন্যই বড় বড় নক্শাগুলি আংশিক ব্যতীত সামগ্রিক সৌষ্ঠব বড় লাভ করিতে পারে নাই।

কিন্তু বিদ্রূপাত্মক রচনা হিসাবে কালীপ্রসন্নের ছোট ছোট নক্শাগুলির ভিতরে কয়েকটি বেশ সার্থক হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ 'হুজুক' শিরোনামার অন্তর্গত 'মহাপুরুষ' এবং 'মরাফেরা' শীর্ষক রচনাদ্বয় এবং 'বুজরুকি' শিরোনামার অন্তর্গত 'ভূতনাবানো' রচনাটির উল্লেখ করিতে পারি। রচনাগুলির আয়তন পরিমিত, বর্ণনা জীবন্ত,—এখানকার পরিহাস স্থূলতা এবং অপরুচি উভয়-বর্জিত ; একটা উপদেশাত্মক উদ্দেশ্য সর্বত্রই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, কিন্তু তাহা

রচনার রসব্যঞ্জনারূপ ফলশ্রুতির সহিত অবিনাভাবে জড়িত। 'মহাপুরুষ' এবং 'মর্য়াফেরা' রচনায় তৎকালীন কলিকাতা-বাসী যে কিরূপ অদ্ভুতরূপে হুজুকপ্রিয় ছিল তাহারই দুইটি চিত্র দেওয়া হইয়াছে। 'মহাপুরুষ' রচনাটি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"একদিন আমরা স্কুলে একটার সময়ে ঘোড়া ঘোড়া খেল্‌ছি এমন সময় আমাদের জলতোলা বুড়ো মালী বল্লে যে, 'ভূকৈলেসে রাজাদের বাড়ী একজন মহাপুরুষ এসেছেন, মহাপুরুষ সত্যযুগের মানুষ, গায়ে বড় বড় অশত্থগাছ ও উইয়ের ঢিপি হয়ে গিয়েছে—চোখ বুজে ধ্যান কচ্ছেন, ধ্যান ভঙ্গ হয়ে চক্ষু খুল্‌লেই সমুদয় ভস্ম করে দেবেন!" শুনে আমাদের বড় ভয় হলো! ইস্কুলে ছুটি হলে আমরা বাড়তে এসেও মহাপুরুষের বিষয় ভাবতে লাগ্‌লেম; লাটু, ঘুড়ি, ক্রকেট ও পায়রা পড়ে রইলো—মহাপুরুষ দেখ্‌বার ইচ্ছা ক্রমে বলবতী হয়ে উঠ্‌লো; শেষে আমরা দৌড়ে ঠাকুরমার কাছে গেলুম।

"আমাদের বুড়ো ঠাকুরমা রোজ রাত্তিরে শোবার সময় "বেঙ্গমা-বেঙ্গমী" "পায়রা রাজা," "রাজপুত্তুর, পাত্তরের পুত্তুর, সওদাগরের পুত্তুর ও কোটালের পুত্তুর চার বন্ধু", "তালপত্তরের খাঁড়া জাগে, ও পক্ষিরাজ ঘোড়া জাগে" ও "সোনার কাটি রূপার কাটি", প্রভৃতি কত রকম উপকথা কইতেন। কবি-কঙ্কণ ও কালিদাসের পয়ার মুখস্থ আওড়াতেন—আমরা শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুমিয়ে পড়তুম!—হায়! বাল্য কালের সে সুখসময় মরণকালেও স্মরণ থাকবে—অপরিচিত সংসারহৃদয় কমল কুসুম হতেও কোমল বোধ হতো, সকলেই বিশ্বাস ছিল; ভূত পেত্নী ও পরমেশ্বরের নামে শরীর লোমাঞ্চ হতো—হৃদয় অনুতাপ ও শোকের নামও জান্‌ত না—অমর বর পেলেও সেই সুকুমার অবস্থা অতিক্রম কত্তে ইচ্ছা হয় না।

"আমার শোবার সময় ঠাকুরমাকে সেই মালীর মহাপুরুষের কথা বল্লেম—ঠাকুরমা শুনে ক্ষাণিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলেন ও শেষে একজন চাকরকে পরদিন সকালে—মহাপুরুষের পায়ের ধূলো আন্‌তে বলে দিয়ে মহাপুরুষের বিষয় আরো দুএক গল্প বল্লেন।

"ঠাকুরমা বল্লেন—বছর আশী হলো (ঠাকুরমার তখন নতুন বিয়ে হয়েছে) আমাদের বারাণসী ঘোষ কাশী যাবার পথে জঙ্গলের ভেতর ঐ রকম এক মহাপুরুষ দেখেন। সেই মহাপুরুষও ঐ রকম অচৈতন্য হয়ে ধ্যানে ছিলেন। মাঝিরে ধরাধরি করে নৌকোয় তুলে আনে। বারাণসী তাঁকে বড় যত্ন করে

নৌকোয় রাখলেন। তখন ছাপঘাটীর মোহনায় জল থাকতো না বলে কাশীর যাত্রীরে বাদাবনের ভেতর দিয়ে আসতেন, সুতরাং বারাণসীকেও বাদা দিয়ে আস্‌তে হলো। একদিন বাদাবনের ভিতর দিয়ে গুণ টেনে নৌকো যাচ্ছে, মাঝি ও অন্য অন্য লোকেরা অন্যমনস্ক হয়ে রয়েচে, এমন সময় জলের ধারে ঠিক ঐ রকম আর একজন মহাপুরুষ এসে দাঁড়ালেন। এদিকে এ মহাপুরুষ নৌকায় গলুইয়ের কাছে বসে ধ্যানে ছিলেন, ডাঙ্গার মহাপুরুষ এসে দাঁড়াবামাত্র চোখ চেয়ে দেখলেন, এরি মধ্যে ডাঙ্গার মহাপুরুষও হাসতে হাসতে নৌকোর উপর এসে নৌকোর মহাপুরুষের হাত ধরে নিয়ে জলের উপর দিয়ে হেঁটে চলে গেলেন, মাঝি ও অন্য লোকেরা হাঁ করে রইলো! বারাণসী বাদাবন তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন, কিন্তু আর মহাপুরুষদের দেখতে পেলেন না, এরা সব সেকালের মুনিঋষি, কেউ দশ হাজার কেউ বিশ হাজার বৎসর তপিস্যে কচ্চেন, এরা মনে কল্লে সব কত্তে পারেন।

"আর একবার ঝিলিপুরের দত্তরা সোঁদরবন আবাদ কত্তে কত্তে ত্রিশহাত মাটির ভিতরে এক মহাপুরুষ দেখেছিল, তাঁর গায়ে বড় বড় অশথগাছের শেকড় জমে গিয়েছিল, আর শরীর শুকিয়ে চেলাকাঠের মত হয়েছিল। দত্তরা অনেক পরিশ্রম করে তাঁরে ঝিলিপুরে আনে, মহাপুরুষও প্রায় একমাস ঝিলিপুরে থাকেন, শেষে একদিন রাত্তিরে তিনি যে কোথায় চলে গেলেন, কেউ তার ঠিকানা কত্তে পাল্লে না—শুনতে শুনতে আমরা ঘুমিয়ে পড়লেম।

"তার পর দিন সকালে রামা চাকর মহাপুরুষের পায়ের ধূলো এনে উপস্থিত কল্লে; ঠাকুরমা একটি জয়ঢাকের মত মাতুলীতে সেই ধুলো পুরে আমাদের গলায় ঝুলিয়ে দিলেন, সুতরাং সেই দিন থেকে আমরা ভূত, পেত্নী, শাঁকচুন্নী ও ব্রহ্মদত্তিদের হাত থেকে কথঞ্চিৎ নিস্তার পেলেম।

ক্রমে আমরা পাঠশালা ছাড়লেম—কালেজে ভর্ত্তি হলেম—সহাধ্যায়ী দু চার সমকক্ষ বড় মানুষের ছেলের সঙ্গে আলাপ হলো; একদিন আমরা একটার সময় গোলদীঘির মাঠে ফড়িং ধরে খেলা করে বেড়াচ্চি এমন সময় আমাদের কেলাসের পণ্ডিত মহাশয় সেই দিকে বেড়াতে এলেন। পণ্ডিত মহাশয় প্রথমে এক বড় মানুষের বাড়ী রাঁধুনী বামুন ছিলেন, এডুকেশন কৌশিলের সুক্ষ্ম বিবেচনায় সেন বাবুর সুপারিসে ও প্রিন্সিপালের কৃপায় পণ্ডিত হয়ে পড়েন; পণ্ডিত মহাশয় পান খেতে ভাল বাসতেন, সুতরাং সকলেই তাঁকে যথাসাধ্য

পান দিয়ে তুষ্ট কত্তে ত্রুটী কত্তো না। পণ্ডিত মহাশয় মাঠে আসবামাত্র ছেলেরা পান দিতে আরম্ভ কল্লে; আমরাও এক দোনা মিঠে খিলি উপহার দিলেম, পণ্ডিত মহাশয় মিঠেখিলি বড় পছন্দ কত্তেন, পান খেয়ে আমাদের নাম ধরে বল্লেন, "আরে হুতোম! আর শুনেচ? ভূকৈলেসে রাজাদের বাড়ি যে একটা মহাপুরুষ ধরে এনেছিল, ডাক্তার সাহেব তার ধ্যান ভঙ্গ করে দিয়েচেন—প্রথমে রাজারা তার গায়ে গুল্ পুড়িয়ে দেন, জলে ডুবিয়ে রাখেন, কিন্তু কিছুতেই ধ্যান ভঙ্গ হয় নাই। শেষে ডাক্তার সাহেব এক আরক নিয়ে তার নাকের গোড়ায় ধল্লে তার চেতনা হলো; এখন সেই মহাপুরুষ লোকের গা টিপে পয়সা নিচ্চে, রাজাদের পাখা টেনে বাতাস কচ্চে, যা পাচ্চে তাই খাচ্চে, তার মহাপুরুষত্ব ভুর ভেঙ্গে গ্যাচে!"

"পণ্ডিত মহাশয়ের কথা শুনে আমরা তাক্ হয়ে পড়লেম, মহাপুরুষের উপর যে ভক্তিটুকু ছিল—মরিচবিহীন কর্পূরের মত—ষ্টপরবিহীন ইথরের মত একেবারে উবে গ্যালো। ঠাকুরমার মাদুলীটি তারপর দিনেই খুলে ফেলা হলো, ভূত, শাঁকচুন্নী, পেত্নীদের ভয় আবার বেড়ে উঠলো।"

আমরা কালীপ্রসন্নের রচনাটি বিশ্লেষ করিয়া দেখাইবার জন্যই সমগ্র রচনাটি তুলিয়া দিলাম। হুতোমের বনামে কালীপ্রসন্ন এখানে নিজের শৈশবস্মৃতিকে অবলম্বন করিয়াই তৎকালীন বাঙ্গালীর কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মান্ধতা এবং অদ্ভুত হুজুকপ্রিয়তার একটি ছবি দিয়াছেন। ইহা দ্বারা সমাজের যে কি অমঙ্গল হইতেছে তাহা লেখক স্পষ্ট করিয়া কোথাও বলিয়া দেন নাই,—অথচ এই যেখানে-সেখানে অসম্ভব অসম্ভব মহাপুরুষ আবিষ্কার করিয়া এবং তাহা লইয়া ভক্তি ও ভয়ের মাত্রাধিক্যে সমাজের যে কি অকল্যাণ হইতেছে সে কথা সমস্ত রচনাটিতে ছড়াইয়া আছে একটি বিদ্রূপের ব্যঞ্জনায়।

রচনাটির আরম্ভেই এমন একটা অনাড়ম্বর সরস প্রাণের খোলামেলা ভাব আছে যে ইহাকে কোন গুরুগম্ভীর 'মোহ মুদ্গর' বলিয়া আশঙ্কা জন্মিবার কোন কারণ নাই। যে ছবিগুলি আঁকা হইয়াছে তাহা এত বাস্তব যে ইহাকে বিষ্ণুশর্মার চাতুরী সন্দেহ করিবারও অবসর নাই। মহাপুরুষ সম্বন্ধে শৈশব-বিশ্বাসকে অবলম্বন করিয়া লেখক মূল বিষয় হইতে অল্প একটু সরিয়া পড়িয়াছেন—সেই অবসরে তাঁহার সকল শৈশবের সরল বিশ্বাসের রঙীন স্মৃতিগুলি আমাদের নিকটও মধুর করিয়া তুলিয়াছেন। রচনা-সাহিত্যের ভিতরে বর্ণনার বা বক্তব্যের এই তির্যক্‌গতি—মূল প্রসঙ্গ হইতে স্খলিত হইয়া

মুহূর্তের জন্য অপ্রধান বর্ণনীয়গুলিকেই 'আপন মনের মাধুরী'র দ্বারা মধুর করিয়া তোলা—ইহা রচনা-সাহিত্যের একটা শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ।

তারপর ঠাকুরমা কর্তৃক বর্ণিত মহাপুরুষদের অন্যান্য উপাখ্যান, মহাপুরুষের পদধূলি লইয়া মাদুলী গ্রহণ—ভূকৈলাসের মহাপুরুষের স্বরূপ আবিষ্কার—ইহার প্রত্যেক বর্ণনাই জীবন্ত এবং হাস্যোজ্জ্বল।

আর একটি প্রধান লক্ষণীয় জিনিস কালীপ্রসন্নের স্টাইল। চল্‌তি ভাষার এইরূপ স্বচ্ছ সাবলীল ব্যবহারে কালীপ্রসন্নের পূর্বে কেন, পরেও তাঁহার সমকক্ষ খুব বেশী আছেন বলিয়া মনে হয় না। যেযুগে তিনি একাজ করিয়াছেন সেযুগে বাঙলাগদ্য সবেমাত্র তাহার শৈশবের আড়ষ্টতা কাটাইয়া যৌবনের পূর্ণ স্বাস্থ্যে পা দিয়াছে, সুতরাং সেযুগের পক্ষে এরূপ রচনা শুধু যথেষ্ট কৃতিত্ব নহে, সাহসের কথাও বলিতে হইবে।

'মহাপুরুষে'র ন্যায় 'মরাফেরা', 'ভূতনাবানো' প্রভৃতি রচনাগুলিও বেশ উপভোগ্য হইয়াছে। ইহার প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্যমূলক বিদ্রূপাত্মক সুর এবং অনাড়ম্বর কথ্যরীতিতে এই রচনাগুলিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজী রচনাকার এডিসন্ এবং স্টীলের রচনার সহিত তুলনা করা বোধ হয় একেবারে অসঙ্গত হইবে না। কালীপ্রসন্ন এডিসন এবং স্টীলের ন্যায় কৃতিত্বের অধিকারী না হইলেও ধরণটা খানিকটা এক রকমের। এডিসন্ এবং স্টীলও তৎকালীন গ্রাম্যজীবনের এবং নাগরিক জীবনের বিদ্রূপাত্মক কতগুলি ছবি আঁকিয়াই তাঁহাদের টীকাটিপ্পনী যোগ করিয়া দিতেন। পরে আমরা দেখিতে পাইব, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাগুলির উপরে এই এডিসন্ এবং স্টীলের প্রভাব কিছু কিছু পড়িয়াছিল, কিন্তু কালীপ্রসন্ন সিংহের রচনার বৈশিষ্ট্য এই যে, এডিসন স্টীল প্রভৃতির কোন প্রভাব ব্যতীতও এই রচনার ধরণটি তাঁহার ভিতরে আপনা আপনিই গড়িয়া উঠিয়াছিল। তবে পূর্বেই বলিয়াছি, সুরুচিপূর্ণ সার্থক রচনা কালীপ্রসন্নের খুব বেশী নয়,—একটা তীব্র হুলযুক্ত কুরুচি এবং পাঁক ঘাটিবার অদম্য উৎসাহই কালীপ্রসন্নের রচনার মহৎ দোষ হইয়া তাঁহার মহদ্‌গুণগুলিকেও ঢাকিয়া রাখিয়াছে, এবং এই জন্যই তিনি প্রসিদ্ধ রচনাকারগণের সহিত একসঙ্গে গণনীয় হইতে পারেন নাই।

———

পঞ্চম অধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র

(উনবিংশ শতাব্দীর ক্রমবিকাশমান গদ্যরীতির বিভিন্ন ধারাগুলি যেমন একটা লোকোত্তর প্রতিভার স্পর্শে সমাহিত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে একটা বিশেষ পরিণত রূপ লাভ করিল, উনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন রচনা-সাহিত্যের ধারাও আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে তেমনি একটি বিশেষ পরিণত রূপ লাভ করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ববর্তী বাঙলা রচনাসাহিত্য এবং বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা-সাহিত্য ইহার ভিতরে প্রথমেই একটা উল্লেখযোগ্য পার্থক্য এই দেখিতে পাই যে, পূর্বের সকল রচনাই একটা বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক,—সেই বিশেষ উদ্দেশ্যকে লইয়াও তাহারা বহুস্থানে সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু মূলতঃ সাহিত্য সৃষ্টির জন্যই রচনা, ইহা বাঙলা-সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রেই প্রথম দেখিলাম।)

উপন্যাস ব্যতীতও বঙ্কিমচন্দ্রের বহুবিধ গদ্য লেখা রহিয়াছে, এগুলিকে আমরা আলোচনার সুবিধার জন্য পাঁচ ভাগে ভাগ করিয়া লইতে পারি। তাঁহার কতগুলি লেখা ব্যাপক পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং পরিচ্ছন্ন নৈয়ায়িক চিন্তাশীলতাসমন্বিত; এগুলি গবেষণা, এবং আলোচনাত্মক সুদীর্ঘ নিবন্ধাবলী। তাঁহার 'কৃষ্ণ-চরিত্র', 'সাংখ্যদর্শন', 'ধর্মতত্ত্ব', 'বঙ্গদেশের কৃষক', 'সাম্য' * প্রভৃতি লেখা এই প্রথম বিভাগের ভিতরে পড়ে। ইহা ব্যতীতও বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙলা দেশের প্রাচীন ইতিহাস, বাঙালী জাতির উৎপত্তি প্রভৃতি বিষয়েও পাণ্ডিত্যপূর্ণ কয়েকটি গবেষণাত্মক প্রবন্ধ রহিয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখা হইল বিজ্ঞানসম্বন্ধীয়। 'বিজ্ঞান-রহস্যে'র সমস্ত রচনাই এই শ্রেণীভুক্ত। তৃতীয় বিভাগে ছোট বড় কতগুলি সাহিত্যসমালোচনা,—যথা, 'উত্তরচরিত', 'গীতিকাব্য', 'প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত', 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব', 'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেশদিমোনা', 'গুপ্তের কবিত্ব' প্রভৃতি। চতুর্থ জাতীয় লেখা লঘু এবং গুরু বিষয়ে ক্ষুদ্রক্ষুদ্র বহু প্রবন্ধ। পঞ্চম বিশুদ্ধ 'রচনা-সাহিত্য'—ইহার ভিতরে প্রধান 'কমলাকান্তের দপ্তর', কয়েকটি গদ্য-পদ্য রচনা এবং 'লোক-রহস্যে'র কিছু কিছু অংশ।

* 'সাম্যে'র তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদ 'বঙ্গদেশের কৃষক' শীর্ষক প্রবন্ধাবলী হইতে গৃহীত।

উপরিউক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় জাতীয় লেখার ভিতরে বঙ্কিমচন্দ্র মুখ্যতঃ পণ্ডিত এবং সূক্ষ্ম চিন্তাশীল। এখানকার তাঁহার বহুমুখী পাণ্ডিত্য এবং তাঁহার চিন্তাশীলতা তাঁহার সাহিত্যিক সত্তাকে আমাদের নিকটে আরও নমস্য করিয়া তুলিয়াছে সন্দেহ নাই,—কিন্তু ইহার ভিতর দিয়া সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের মুখ্য প্রকাশ নাই। তবে একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক তাঁহার সাহিত্যিক-সত্তাকে এবং পণ্ডিত-সত্তাকে কখনই একেবারে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে পারেন না; তাই বঙ্কিমচন্দ্রের পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণাত্মক লেখাগুলিও বহুস্থানে বিবিধ সাহিত্যিক গুণে ভূষিত। বৈজ্ঞানিক বিষয়ে প্রবন্ধ সাধারণতঃ আমাদের পক্ষে ভীতিপ্রদ হওয়াই স্বাভাবিক; কিন্তু যথাসম্ভব বৈজ্ঞানিক তথ্যের সমাবেশ করিয়াও বঙ্কিম তাঁহার 'বিজ্ঞান-রহস্যে'র প্রবন্ধগুলির ভিতরে একটা সাহিত্যিক পরিবেশ সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা এখানে দু'একটা নমুনা তুলিয়া দিতেছি। 'বিজ্ঞানরহস্যের 'চন্দ্রলোক' শীর্ষক প্রবন্ধের আরম্ভ:

"এই বঙ্গদেশের সাহিত্যে চন্দ্রদেব অনেক কার্য্য করিয়াছেন। বর্ণনায়, উপমায়,—বিচ্ছেদে মিলনে—অলঙ্কারে, খোসামোদে—তিনি উলটি-পালটি খাইয়াছেন। চন্দ্রবদন, চন্দ্ররশ্মি, চন্দ্রকররেখা, শশিমসি ইত্যাদি সাধারণ-ভোগ্য সামগ্রী অকাতরে বিতরণ করিয়াছেন; কখন স্ত্রীলোকের স্কন্ধোপরি ছড়াছড়ি, কখন তাঁহাদের নখরে গড়াগড়ি দিয়াছেন; সুধাকর, হিমকর, করনিকর, মৃগাঙ্ক, শশাঙ্ক, কলঙ্ক প্রভৃতি অনুপ্রাসে, বাঙ্গালী বালকের মনোমুগ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু এই উনবিংশ শতাব্দীতে এইরূপ কেবল সাহিত্য-কুঞ্জে লীলাখেলা করিয়া কার সাধ্য নিস্তার পায়? বিজ্ঞান-দৈত্য সকল পথ ঘেরিয়া বসিয়া আছে। আজি চন্দ্রদেবকে বিজ্ঞানে ধরিয়াছে, ছাড়াছাড়ি নাই। আর সাধের সাহিত্য-বৃন্দাবনে লীলা-খেলা চলে না—কুঞ্জদ্বারে সাহেব-অক্রুর রথ আনাইয়া দাঁড়াইয়া আছে, চল চন্দ্র, বিজ্ঞান-মথুরায় চল; একটা কংস বধ করিতে হইবে।"

'জৈবনিক' প্রবন্ধটির আরম্ভ:

"ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, এবং আকাশ, বহুকাল হইতে ভারতবর্ষে ভৌতিক সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন। তাঁহারাই পঞ্চভূত—আর কেহ ভূত নহে। এক্ষণে ইউরোপ হইতে নূতন বিজ্ঞান-শাস্ত্র আসিয়া তাঁহাদিগকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছেন। ভূত বলিয়া আর কেহ তাঁহাদিগকে মানে না।

নূতন বিজ্ঞানশাস্ত্র বলেন, আমি বিলাত হইতে নূতন ভূত আনিয়াছি, তোমরা আবার কে? যদি ক্ষিত্যাদি জড়সড় হইয়া বলেন যে, আমরা প্রাচীন ভূত, কণাদ-কপিলাদির দ্বারা ভৌতিকরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া প্রতি জীবশরীরে বাস করিতেছি, বিলাতী বিজ্ঞান বলেন, "তোমরা আদৌ ভূত নও।"

(সব চেয়ে বড় জিনিস বঙ্কিমচন্দ্রের তাজা প্রাণ—কঠোর পাণ্ডিত্যের ভারেও তাহা একেবারে চাপা পড়িয়া যায় নাই; তাই প্রবন্ধাত্মক লেখাগুলিরও খাঁজে খাঁজে বঙ্কিমচন্দ্র নানাভাবে নিজেকে ছড়াইয়া দিয়াছেন। বাঙলা দেশ এবং বাঙালী জাতি সম্বন্ধে তিনি ক্ষুদ্র-বৃহৎ যতগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার ভিতর দিয়া আমরা শুধু তথ্য ও তর্কই পাই নাই, পাইয়াছি বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্তে দৃঢ়নিবদ্ধ স্বাদেশিকতা—একটা জীবন্ত জাতীয়তাবোধ। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিতে পারি, স্থানে অস্থানে কারণে অকারণে তিনি বাঙালী জাতিকে অনেক গাল-মন্দ করিয়াছেন; এই গাল-মন্দ কোনও রূপ বিদ্বেষ বা অবজ্ঞা জাত নয়, গভীর প্রেম ও সহানুভূতি জাত। বাঙলা দেশ ও বাঙালী জাতি সম্বন্ধে তাঁহার মনে ছিল 'ত্রিভুবন-ব্যাপিনী' আশা; এই আশার অপূর্ণতাই চিত্তের ক্ষোভ সৃষ্টি করিত, সেই ক্ষোভেরই প্রকাশ ভৎসনা ও কটূক্তিতে। বাঙালী জাতিকে স্বমহিমায় আত্মপ্রতিষ্ঠ করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য, সেই জন্য ঘুমন্ত জাতিকে বার বার নিষ্ঠুর আঘাত করিয়াছেন, সে আঘাতে শুধু কাঁদাইতে চেষ্টা করেন নাই, নিজেও সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিয়াছেন।) বাঙালীকে আত্ম প্রতিষ্ঠ করিবার জন্যই তিনি বাঙলার ইতিহাস রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন। বাঙলার ইতিহাস লিখিতে বসিয়া তিনি বলিতেছেন,—

"বাঙলার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙালী কখন মানুষ হইবে না। যাহার মনে থাকে যে, এ বংশ হইতে কখন মানুষের কাজ হয় নাই, তাহা হইতে কখন মানুষের কাজ হয় না! তাহার মনে হয়, বংশে রক্তের দোষ আছে। তিক্ত নিম্ববৃক্ষের বীজে তিক্ত নিম্বই জন্মে—মাকালের বীজে মাকালই ফলে। বাঙালীরা মনে জানে যে, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের কখন গৌরব ছিল না, তাহারা দুর্ব্বল, অসার, গৌরবশূন্য ভিন্ন অন্য অবস্থা প্রাপ্তির ভরসা করে না—চেষ্টা করে না। চেষ্টা ভিন্ন সিদ্ধিও হয় না।"

[বাঙলার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা]

বাঙলার কৃষক-সম্প্রদায় সম্বন্ধে বঙ্কিম যত কথা লিখিয়াছেন, তাহাও

দলিল-দস্তাবেজ-মাফিক সংবাদ-সংগ্রহ মাত্র নহে,—সেখানে দারিদ্র্যক্লিষ্ট নিপীড়িত মানবাত্মার সহিত বঙ্কিমের গভীর সহবেদনযোগ বহু বর্ণনা এবং উক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে। 'সাম্যে'র ভিতরে দেখিতে পাই, বঙ্গীয় কৃষক পরাণ-মণ্ডলের বর্ণনা দিতে গিয়া বঙ্কিম বলিতেছেন,—

"যতক্ষণ জমীদার বাবু সাড়ে সাত মহল পুরীর মধ্যে রঙ্গিল সার্সী-প্রেরিত স্নিগ্ধালোকে স্ত্রী কন্যার গৌরকান্তির উপর হীরকদামের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন, ততক্ষণ পরাণ মণ্ডল পুত্রসহিত দুই প্রহরের রৌদ্রে, খালি মাথায় খালি পায়, একহাঁটু কাঁদার উপর দিয়া দুইটা অস্থিচর্ম্মবিশিষ্ট বলদে, ভোঁতা হালে তাঁহার ভোগের জন্য চাষকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছে! উহাদের এই ভাদ্রের রৌদ্রে মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, তাহার নিবারণ জন্য অঞ্জলি করিয়া মাঠের কর্দ্দম পান করিতেছে; ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে; কিন্তু এখন বাড়ী গিয়া আহার করা হইবে না, এই চাষের সময় সন্ধ্যাবেলা গিয়া উহারা ভাঙ্গা পাতরে রাঙ্গা রাঙ্গা বড় বড় ভাত লূণলঙ্কা দিয়া আধপেটা খাইবে, তাহার পর ছেঁড়া মাদুরে,—না হয় ভূমে, গোয়ালের একপাশে শয়ন করিবে। উহাদের মশা লাগে না। তাহার পরদিন প্রাতে আবার সেই এক হাঁটু কাঁদায় কাজ করিতে হইবে। যাইবার সময় হয় জমিদার, নয় মহাজন পথ হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়া দেনার জন্য বসাইয়া রাখিবে, কাজ হইবে না। নয় ত চষিবার সময় জমীদার জমীখানি কাড়িয়া লইবে, তাহা হইলে সে বৎসর কি করিবে? উপবাস.--সপরিবারে উপবাস।"

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক সমালোচনা বিষয়ক প্রবন্ধগুলি স্বতন্ত্র মহিমায় খুব উজ্জ্বল না হইলেও গতানুগতিক নয়। এ জাতীয় লেখাগুলির পশ্চাতে যেমন তাহার বিশেষ বিশেষ কতগুলি কাব্যাদর্শ আছে, তেমনি রহিয়াছে তাঁহার নিজস্ব বিশ্লেষণ শক্তি। বঙ্কিমের কাব্যাদর্শ উৎসারিত তাঁহার জীবনাদর্শ হইতে। জীবনের ক্ষেত্রে তিনি যেমন সমন্বয়বাদী ছিলেন, সাহিত্য-রচনা এবং সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রেও তিনি, তেমনি সমন্বয়ের সাধক ছিলেন। জীবনের বৃহত্তর পরিকল্পনার ভিতরে সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে; কিন্তু সেই বিশিষ্ট স্থানে সে একান্ত 'অসঙ্গ' নহে; তাহার তাৎপর্য সমগ্রের সহিত নিবিড় যোগে, সকলের সহিত সুসামঞ্জস্যে। এই জন্য সাহিত্য বা শিল্পকে তিনি কোথাও 'অয়মহং ভো' বলিয়া উদগ্রদর্পে কণ্টকিত হইয়া উঠিতে দেন নাই; রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম, নীতি প্রভৃতির সহিত অবিরোধে তাহাকে

বর্ধিত হইতে হইয়াছে। সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমের এই বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

বিশ্লেষণের নিজস্ব ভঙ্গী বঙ্কিমের 'সমালোচন'কে গতানুগতিকতা দোষ হইতে মুক্তি দিয়াছে। তবে সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে এই বৈশ্লেষিক পদ্ধতিই যে একমাত্র বা প্রধান পন্থা নহে, এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সচেতন ছিলেন; তাই 'উত্তরচরিতে'র সমালোচনায় বৈশ্লিষিক পথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই রসজ্ঞ বঙ্কিম বলিয়াছেন—

"এরূপে গ্রন্থের প্রকৃত দোষগুণের ব্যাখ্যা হয় না। এক একখানি প্রস্তর পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখিলে তাজমহলের গৌরব বুঝিতে পারা যায় না। এক একটি বৃক্ষ পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখিলে উদ্যানের শোভা অনুভূত করা যায় না। এক একটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বর্ণনা করিয়া মনুষ্য-মূর্ত্তির অনির্ব্বচনীয় শোভা বর্ণনা করা যায় না। কোটি কোটি কলস জলের আলোচনায় সাগর মাহাত্ম্য অনুভূত করা যায় না। সেইরূপ কাব্যগ্রন্থের। এই স্থান ভাল রচনা, এই স্থান মন্দ রচনা, এইরূপ তাহার সর্ব্বাংশের পর্য্যালোচনা করিলে, প্রকৃত গুণাগুণ বুঝিতে পারা যায় না। যেমন অট্টালিকার সৌন্দর্য্য বুঝিতে গেলে সমুদায় অট্টালিকাটি এককালে দেখিতে হইবে, সাগর-গৌরব অনুভূত করিতে হইলে তাহার অনন্ত বিস্তার এককালে চক্ষে গ্রহণ করিতে হইবে, কাব্যনাটক-সমালোচনও সেইরূপ।"

সাহিত্য সমালোচনায় এবং অন্যবিধ শিল্প সমালোচনায় এই সামগ্রিক এবং 'সাজ্ঘটিক' (synthetic) দৃষ্টির প্রয়োজন বঙ্কিমের জানা ছিল। কিন্তু সাহিত্য সমালোচনা বঙ্কিমের হাতে কোথাও স্বতন্ত্র সাহিত্য-সৃষ্টি হইয়া উঠিতে পারে নাই। আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখিতে পাইব, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের সমালোচনের ভিতর দিয়া সাহিত্যকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতেন; শ্রেষ্ঠ সমালোচকদের সমালোচন অনেক সময়েই এই জাতীয় নূতন সাহিত্যিক সৃষ্টি, কিন্তু বঙ্কিমের সমালোচনা এ পর্যায়ে পড়ে না। এই জন্য রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সমালোচন যেমন করিয়া রচনা-সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে, বঙ্কিমের সাহিত্য-সমালোচন কোথাও তেমন করিয়া রচনা-সাহিত্য হইয়া উঠিতে পারে নাই। কালিদাসের শকুন্তলা-নাটক লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েই তুলনামূলক সমালোচনা করিয়াছেন; কিন্তু তুলনা-মূলক সমালোচনার ভিতর দিয়াও রবীন্দ্রনাথ শকুন্তলাকে নিজের মতন করিয়া অনেকখানি সৃষ্টি করিয়া

লইয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতরে তাহা দেখিতে পাই না। কিন্তু প্রসঙ্গতঃ একটি কথা স্মরণীয়। মহাভারতকে অবলম্বন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র দ্রৌপদীর চরিত্র-বিশ্লেষণচ্ছলে যে চিত্রণ করিয়াছেন, সেখানে মহাভারতের দ্রৌপদীকে তিনি নিজের চিত্তভূমিতে একটি বিশেষ তেজস্বিনী রমণীরূপে অনেকখানি যেন সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিলেন।

গুরু এবং লঘু বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের যে প্রবন্ধগুলি রহিয়াছে তাহার ভিতরে কয়েকটি যথার্থ রচনা-সাহিত্যেরই লক্ষণাক্রান্ত ; যেমন, 'অনুকরণ', 'ভালবাসার অত্যাচার', 'ধর্ম্ম এবং সাহিত্য', 'সঙ্গীত', 'বাহুবল ও বাক্যবল', 'রামধন পোদ' প্রভৃতি। এগুলির স্বল্পায়তনও যেমন রচনা-সাহিত্যের উপযোগী, এগুলির প্রকাশভঙ্গীও তেমনই রচনা-সাহিত্যের উপযোগী। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, এই বিষয়গুলিও তথাকথিত গুরুগম্ভীর বিষয় নহে,—এখানে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার জ্ঞান অপেক্ষা মনের পরিচয়ই দিয়াছেন বেশী। এখানকার চিন্তাও গতানুগতিক নহে,—তাহা বিশেষ মনের বিশেষ চিন্তা। অত্যাচারকে আমরা হিংসাবিদ্বেষপ্রসূত অমঙ্গল বলিয়া জানিতেই চিরকাল অভ্যস্ত ; কিন্তু 'ভালবাসার অত্যাচার'ও যে হিংসাবিদ্বেষপ্রসূত অত্যাচার হইতে আমাদের জীবনে কোনো অংশে কম অত্যাচার নহে, ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের অভিনব আবিষ্কার। এ আবিষ্কার এবং তাহার সরস বর্ণনা ভারী যতখানি হোক আর না হোক, খুব মনোজ্ঞ, একথা অস্বীকার করিতে পারি না। শুধু বক্তব্যটিই মনোজ্ঞ নহে, বচনভঙ্গীটিও মনোজ্ঞ।—

"যাহা হউক, মনুষ্য জীবন ভালবাসার অত্যাচারে পরিপূর্ণ। চিরকাল মনুষ্য অত্যাচারপীড়িত। প্রথমাবস্থায় বাহুবলের অত্যাচার, অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে যে বলিষ্ঠ সেই পরপীড়ন করে। কালে এই অত্যাচার রাজার অত্যাচার এবং অর্থের অত্যাচারে পরিণত হয়। কোন সমাজে কখন একেবারে লুপ্ত হয় নাই। দ্বিতীয়াবস্থায় ধর্ম্মের অত্যাচার, তৃতীয়াবস্থায় সামাজিক অত্যাচার এবং সকল অবস্থাতেই ভালবাসার অত্যাচার। এই চতুর্ব্বিধ পীড়নের মধ্যে প্রণয়ের পীড়ন কাহারও পীড়ন অপেক্ষা হীনবল বা অল্পানিষ্টকারী নহে। বরং ইহা বলা যাইতে পারে যে, রাজা, সমাজ বা ধর্ম্মবেত্তা কেহই প্রণয়ীর অপেক্ষা বলবান্ নহেন বা কেহ তেমন সদাসর্ব্বক্ষণ সকল কাজে আসিয়াই হস্তক্ষেপ করেন না—সুতরাং প্রণয়ের পীড়ন যে সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকারী, ইহা বলা যাইতে পারে। আর অন্য অত্যাচারকারীকে

নিবারণ করা যায়, অন্য অত্যাচারের সীমা আছে। কেন না, অন্যান্য অত্যাচারকারীর বিরোধী হওয়া যায়। প্রজা প্রজাপীড়ক রাজাকে রাজ্যচ্যুত করে, কখনও মস্তকচ্যুত করে। লোক-পীড়ক সমাজকে পরিত্যাগ করা যায়, কিন্তু ধর্ম্মের পীড়নে এবং স্নেহের পীড়নে নিষ্কৃতি নাই—কেন না, ইহাদের বিরোধী হইতে প্রবৃত্তি জন্মে না।"

বঙ্কিমচন্দ্র ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, রাজনীতি প্রভৃতি বহু বিষয়ে বহু প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। সে সকল প্রবন্ধে তিনি যে চিন্তাশীলতা, মনস্বিতা এবং পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহা সত্যই শ্রদ্ধার্হ; কিন্তু রচনা-সাহিত্যে তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভার সম্যক বিকাশ 'কমলাকান্তের দপ্তরে'। এদিক হইতে 'কমলাকান্তের দপ্তর' বাঙলা-সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের দাবী করিতে পারে। 'কমলাকান্তের দপ্তরে' বঙ্কিমের মনস্বিতা, চিন্তাশীলতা বা পাণ্ডিত্যের পরিচয় যে খুব অকিঞ্চিৎকর তাহা নহে, কিন্তু উহা অনেকখানিই আমাদের উপরি পাওনা, আসল পাওনা সাহিত্য-সৃষ্টির ভিতর দিয়া সাহিত্য-স্রষ্টার গভীর স্পর্শ। গদ্য-রচনাও যে একটা সাহিত্যিক সৃষ্টির কতখানি উচ্চস্তরে আসিয়া পৌছিতে পারে 'কমলাকান্তের দপ্তরে' এই কথাটাই আমাদিগকে প্রথম সচকিত করিয়া দিয়াছে। ধরা যাক্ প্রথম সংখ্যার কথা, 'একা—কে গায় ওই'; ইহা কোন সংবাদ বহন করে না, তথ্য যাহা আছে তাহা তর্কাতীত বা সংশয়াতীত নহে, পাণ্ডিত্যের ভারেও সে তেমন ভারী নহে; তথাপি সে সুন্দর সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে, কারণ সে সাহিত্যিক সৃষ্টি; সে বহন করে আশা-নিরাশায় ভরা জীবনের সঞ্চিত রসানুভূতি, আর তাহার ভিতর দিয়া প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে বঙ্কিমচন্দ্রের দরদী কবিচিত্তের মধুর স্পর্শ। আফিংখোর কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীর ব-কলমে সকল কথা বলিলেও কোন পাঠকের বুঝিতে কষ্ট হয় না ইহা বঙ্কিমের অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে কিরূপ স্বতঃনিঃসারিত হইতেছে। এ বঙ্কিম শুধু মনস্বী নহেন, শুধু চিন্তাশীল পণ্ডিত নহেন, পাঠকচিত্তে তাঁহার স্পর্শ রসমূর্তিতে, পরমাত্মীয়রূপে। আরম্ভেই দেখিতে পাই,—

"বহুকালবিস্মৃত সুখস্বপ্নের স্মৃতির ন্যায় ঐ মধুর গীতি কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। এত মধুর লাগিল কেন?...কেন কে বলিবে? রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী—নদী-সৈকতে কৌমুদী হাসিতেছে। অর্দ্ধাবৃতা সুন্দরীর নীল বসনের ন্যায়

শীর্ণশরীরা নীলসলিলা তরঙ্গিণী সৈকত বেষ্টিত করিয়া চলিয়াছেন ; রাজপথে কেবল আনন্দ—বালক, বালিকা, যুবক, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ, বিমল চন্দ্রকিরণে স্নাত হইয়া আনন্দ করিতেছে। আমিই কেবল নিরানন্দ—তাই ঐ সঙ্গীতে আমার হৃদয়-যন্ত্র বাজিয়া উঠিল।” ইহা যে কোন গুরুগম্ভীর তথ্য বা তত্ত্ব নহে সে কথা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না, ইহা একান্তই একটি বিশেষ ব্যক্তিসত্তার স্পন্দন, তাঁহার সুখ-দুঃখ ভাল-লাগা মন্দ-লাগার কথা ; —মনের তারে বাহিরের কোমল আঘাতে বাজিয়া উঠিয়াছে একটি করুণ মধুর সুর, লেখক নিভৃতে সহৃদয় আপনজনের কাছে যেন জাগাইয়া তুলিতে চাহিতেছেন তাহার প্রতিরণন—ইহা একান্তই লিরিক্-ধর্মী।

“কিন্তু বারেক মাত্র শ্রুত ঐ সঙ্গীত আমার কেন এত মধুর লাগিল, তাহা বলি নাই। অনেকদিন আনন্দোত্থিত সঙ্গীত শুনি নাই,—অনেক দিন আনন্দ অনুভব করি নাই। যৌবনে যখন পৃথিবী সুন্দরী ছিল, যখন প্রতি পুষ্পে সুগন্ধ পাইতাম, প্রতি পত্রমর্ম্মরে মধুর শব্দ শুনিতাম, প্রতি নক্ষত্রে চিত্রা-রোহিণীর শোভা দেখিতাম, প্রতি মনুষ্য মুখে সরলতা দেখিতাম, তখন আনন্দ ছিল। পৃথিবী এখনও তাই আছে, মনুষ্যচরিত্র এখনও তাই আছে, কিন্তু এ হৃদয় আর তাই নাই। তখন সঙ্গীত শুনিয়া আনন্দ হইত, আজি এই সঙ্গীত শুনিয়া সেই আনন্দ মনে পড়িল। যে অবস্থায়, যে মুখে সেই আনন্দ অনুভব করিতাম, সেই অবস্থায়, সেই মুখ মনে পড়িল। মুহূর্ত্ত জন্য আবার যৌবন ফিরিয়া পাইলাম। আবার তেমনি করিয়া মনে মনে সমবেত বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে বসিলাম, আবার সেই অকারণসঞ্জাত উচ্চ হাসি হাসিলাম, যে কথা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া এখন বলি না, নিষ্প্রয়োজনেও চিত্তের চাঞ্চল্য হেতু তখন বলিতাম, আবার সেই সকল বলিতে লাগিলাম, আবার অকৃত্রিম হৃদয়ে পরের প্রণয় অকৃত্রিম বলিয়া মনে মনে গ্রহণ করিলাম, ক্ষণিক ভ্রান্তি জন্মিল, তাই এ সঙ্গীত এত মধুর লাগিল। শুধু তাই নয়। তখন সঙ্গীত ভাল লাগিত,—এখন ভাল লাগে না—চিত্তের যে প্রফুল্লতার জন্য ভাল লাগিত, সে প্রফুল্লতা নাই বলিয়া ভাল লাগে না। আমি মনের ভিতর মন লুকাইয়া সেই গত যৌবনসুখ চিন্তা করিতেছিলাম—সেই সময়ে এই পূর্ব্বস্মৃতিসূচক সঙ্গীত কর্ণে প্রবেশ করিল, তাই এত মধুর বোধ হইল।”

—সেই অতীত জীবনের অফুরন্ত সঞ্চয়ের ভিতরে গভীর আত্মনিমজ্জন,—

সেখান হইতে মণি-মাণিক্য সঞ্চয়; বাহিরের জগতে আনিয়া যতই তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙিয়া দেখাইবার চেষ্টা ততই তাহাতে অপূর্ব বর্ণ-বৈচিত্র্য এবং রস-মাধুর্যের সমাবেশ। এ জগৎ সেই মধুর স্মৃতির জগৎ—মনের অজ্ঞাতে বাসনায় স্থিরবদ্ধ বহু দিবসের ভাবস্মৃতিতে মন ভরিয়া ওঠে ব্যাকুল আনন্দের স্পন্দনে, সেই স্পন্দনের প্রকাশই সত্যকার রচনা। আমাদের বাস্তব জীবনের ভিতরেও এই স্মৃতির জগৎ যে কতখানি সত্য হইয়া ওঠে বঙ্কিমচন্দ্র তাহার আভাস দিয়াছেন 'ফুলের বিবাহ' শীর্ষক নবম সংখ্যা দপ্তরে। ফুলের বিবাহের ন্যায় সত্যকারের বিবাহও নিমেষে শূন্যে মিলাইয়া যায়,—কিন্তু মানুষের চিত্তে জাগিয়া থাকে গতজীবনের সকল সুখ-দুঃখের স্মৃতি একটা গভীর রহস্যময়রূপে,—কোন্ নিভৃত নিরালা মুহূর্তে তাহার জাগিয়া ওঠে মানস পটে অস্ফুট সোনার রেখার মত—'emotion recollected in tranquillity'—তাহাকে লইয়া গড়িয়া ওঠে সুকুমার সাহিত্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতরে একটি লিরিক-ধর্মী কবিচিত্ত ছিল; তাহার পরিচয় যেমন ছড়াইয়া রহিয়াছে তাঁহার উপন্যাস গুলির আঁট বাঁধুনির খাঁচে খাঁচে, তেমনি রহিয়াছে 'কমলাকান্তের দপ্তরের' ভিতরে। যে 'বসন্তের কোকিল'কে লইয়া তিনি বারুণীর ঘাটে বকুলতলায় একদিন গদ্যভাষায় অপূর্ব কবিতা লিখিয়াছিলেন, সেই 'বসন্তের কোকিল'কে উপলক্ষ্য করিয়া দপ্তরের সপ্তম সংখ্যায় বলিতেছেন,—

"তুই এ-সংসারে পঞ্চমস্বর ভালবাসিস্—আমিও তাই; তুই পঞ্চমস্বরে কারে ডাকিস্? আমিই বা কারে? বল দেখি পাখি, কারে?

"যে সুন্দর, তাকেই ডাকি, যে ভাল তাকেই ডাকি। যে আমার ডাক শুনে, তাকেই ডাকি। এই আশ্চর্য্য ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, বিস্মিত হইয়া আছি, ইহাকেই ডাকি। এই অনন্ত, সুন্দর জগৎ-শরীরে যিনি আত্মা, তাঁহাকে ডাকি। জানিয়া ডাকি, না জানিয়া ডাকি, সমান কথা; তুইও কিছু জানিস্ না, তোরও ডাক পৌঁছিবে, আমারও ডাক পৌঁছিবে।···কণ্ঠ নাই বলিয়া আমার মনের কথা কখনও বলিতে পারিলাম না। যদি তোর এ ভুবন-ভুলান স্বর পাইতাম ত বলিতাম।··· কি কথাটি, বলিব বলিব বলিয়া মনে করি, জানি না; কমলাকান্তের মনের কথা এজন্মে বলা হইল না,—যদি কোকিলের কণ্ঠ পাই—অমানুষী-ভাষা পাই, আর নক্ষত্রদিগকে শ্রোতা পাই, তবে মনের কথা বলি।"

সেই চিরন্তনের আকুতি—

"না পারে বুঝাতে আপনি না বুঝে
মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে,
কোকিল যেমন পঞ্চমে কূজে
মাগিছে তেমনি স্বর,—"।

দ্বাদশ সংখ্যায় কমলাকান্ত প্রসন্ন গোয়ালিনীর সঙ্গে রসিকতা করিয়া যখন—"এস্ এস বঁধু এস আধ আঁচরে বস, নয়ন ভরিয়ে তোমায় দেখি" এই গানটি ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন পরিহাসপ্রিয় বঙ্কিমচন্দ্রের চঞ্চলতায়ই আকৃষ্ট হইয়াছিলাম; কিন্তু তাহার ভিতর প্রবাহিত হইয়াছিল যে কবিপ্রাণ ফল্গুস্রোতের মত তাহার স্পর্শ অল্পক্ষণের ভিতরেই আমাদিগকে আরও গভীরে টানিয়া লইল। প্রথমে "এস এস বঁধু এস্"।

"সর্ব্বত্র এই রব—"এসো এসো বঁধু এসো।" সর্ব্ব কর্ম্মের এই মন্ত্র—"এসো এসো বঁধু এসো।" জড়জগতের নিয়ম আকর্ষণ। বৃহৎ গ্রহ উপগ্রহকে ডাকিতেছে,—"এসো এসো বঁধু এসো।" সৌরপিণ্ড বৃহৎ গ্রহকে ডাকিতেছে, "এসো এসো বঁধু এসো।" জগৎ জগদন্তরকে ডাকিতেছে,—"এসো এসো বঁধু এসো।" জড়পিণ্ড সকল গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু—সকলেই এই মোহমন্ত্রে বাঁধা পড়িয়া ঘুরিতেছে। প্রকৃতি পুরুষকে ডাকিতেছে, "এসো এসো, বঁধু এসো।" জগতের এই গম্ভীর অবিশ্রান্ত ধ্বনি,—"এসো এসো বঁধু এসো।"

ইহার পরে "আধ আঁচরে বস"। কমলাকান্ত বলিতেছেন—"এই তৃণশষ্প-সমাচ্ছন্ন কণ্টকাদিতে কর্কশ সংসারারণ্যে, হে বাঞ্ছিত, আমার এই হৃদয়া-বরণের অর্দ্ধেকে উপবেশন কর। কুশ-কণ্টকাদি হইতে তোমার আচ্ছাদন জন্য আমি এই আপন অঙ্গ অনাবৃত করিতেছি—আমার আঁচরে বস! যাহাতে আমার লজ্জা রক্ষা, মান রক্ষা, যাহাতে আমার শোভা, হে মিলিত তুমিও তাহার অর্দ্ধেক গ্রহণ কর—আধ আঁচরে বসো। হে পরের হৃদয়, হে মনোরঞ্জন, হে সুখদ! কাছে এসো, আমাকে স্পর্শ কর, আমি তোমাতে সংলগ্ন হইব, দূরে আসন গ্রহণ করিও না—এই আমার শরীর-সংলগ্ন অর্দ্ধাঞ্চলে বস।"

তাহার পরে "নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি"। কমলাকান্ত বলিতেছে,—

"কে কখন দেখিয়াছে?......রূপতৃষ্ণায় তুমি ইহ জীবন অতিবাহিত করিলে—যেখানে ফুলটি ফুটে, ফলটী দোলে, যেখানে পাখীটি উড়ে, যেখানে

মেঘ ছুটে, গিরিশৃঙ্গ উঠে, নদী বহে, জল ঝরে, তুমি সেইখানেই রূপের অনুসন্ধানে ফিরিয়াছ,—যেখানে বালক প্রফুল্ল মুখমণ্ডল আন্দোলিত করিয়া হাসে, যেখানে যুবতী ব্রীড়াভারে ভাঙ্গা ভাঙ্গা হইয়া শঙ্কিত গমনে যায়, যেখানে প্রৌঢ়া নিতান্ত স্ফুটিতা মধ্যাহ্নপদ্মিনীবৎ অকাতরে রূপের বিকাশ করে, তুমি সেইখানেই রূপের সন্ধানে ফিরিয়াছ, কখন নয়ন ভরিয়া রূপ দেখিয়াছ? দেখ নাই কি যে কুসুম দেখিতে দেখিতে শুকায়, ফল দেখিতে দেখিতে পাকে, পড়ে, পচে, গলে,—পাখী উড়িয়া যায়—মেঘ চলিয়া যায়, গিরি ধূমে লুকায়, নদী শুকায়, চাঁদ ডুবে, নক্ষত্র মিলিয়া যায়? শিশুর হাসি রোগে হরণ করে, যুবতীর ব্রীড়া কিসে না যায়? প্রৌঢ়া বয়সে শুকাইয়া যায়! ইহা সংসারের দুরদৃষ্ট—কেহ কিছু নয়ন ভরিয়া দেখিতে পায় না। অথবা এই সংসারের শুভদৃষ্ট—কেহ কিছু নয়ন ভরিয়া দেখিতে পায় না। গতিই সংসারের সুখ—চাঞ্চল্যই সংসারের সৌন্দর্য্য।"

ইহাই সাহিত্যের রচনা,—নিভৃত হৃদয়ের রসালোড়ন, রুদ্ধ হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া সহৃদয় পাঠককে অন্তরঙ্গ ভাবে আকর্ষণ। আকৃতির প্রশ্ন বাদ দিলে প্রকৃতিতে কাব্য-কবিতার সহিত ইহার পার্থক্যের সীমারেখা কোথায় তাহা খুঁজিয়া বাহির করা সকল সময়ে সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

'কমলাকান্তের দপ্তরের'র দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র ব্যক্তিপুরুষটি যেমন করিয়া আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে তেমন আর কোথাও নহে। গদ্য লেখার ভিতর দিয়া লেখকের সহিত এমনতর গভীর পরিচয় বাঙলা-সাহিত্যে বিরল। শুধু গদ্য-সাহিত্যে কেন, ইহার পূর্বে যত কাব্য-কবিতা হইয়াছে তাহার ভিতর দিয়াও কবিপুরুষের স্পর্শ আমরা এমন প্রত্যক্ষ এবং গভীর করিয়া বেশী পাই নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতরে একটি কবি-প্রাণ ছিল, একটি চিন্তাশীল দার্শনিক ছিল, একটি অকপট স্বদেশভক্ত ছিল, আর ছিল একটি শুভ্রোজ্জ্বল হাস্যরসিক —একটি অপরাধ-অসহিষ্ণু বীর্যশালী শাসক। এই সকল সত্তা একত্রিত হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল যে একটি অখণ্ড সত্তা তাহারই পরিচয় পাই 'কমলাকান্তের দপ্তরে'। সপ্তমী পূজার দিন আফিং চড়াইয়া কমলাকান্ত বাঙলা-মায়ের যে পরিপূর্ণ দুর্গামূর্তি ধ্যাননেত্রে দর্শন করিয়াছিলেন, তাহার ভিতরে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে একাধারে বঙ্কিমের ঋষিত্ব এবং স্বাদেশিকতা। তিনি যখন অমোঘ স্বরে আহ্বান জানাইলেন,—"এস ভাই সকল! আমরা

এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দেই। এস, আমরা দ্বাদশ কোটি ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া ছয় কোটি মাথায় বহিয়া ঘরে আনি।”—তখন আমরা যে শুধু সাহিত্যপাঠে নিমগ্ন থাকি তাহা নহে, বাণীময়রূপে স্বদেশপূজারী বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের নিকট একান্ত জীবন্ত হইয়া ওঠেন। দ্বাদশ সংখ্যা দপ্তরের কমলাকান্ত চক্রবর্তী রূপে বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন,—

“এই সংসার সমুদ্রে আমি ভাসমান তৃণ, সংসার-বাত্যায় আমি ঘূর্ণমান ধূলিকণা, সংসারারণ্যে আমি নিষ্ফল বৃক্ষ, সংসারাকাশে আমি বারিশূন্য মেঘ, আমি কেন দিবস গণিব?

“গণিব! আমার এক দুঃখ, এক সন্তাপ, এক ভরসা আছে। ১২০৩ সাল হইতে দিবস গণি। যে-দিন বঙ্গে হিন্দু নাম লোপ পাইয়াছে সেই দিন হইতে দিন গণি। যে-দিন সপ্তদশ অশ্বারোহী বঙ্গ জয় করিয়াছিল সেই দিন হইতে দিন গণি। হায়! কত গণিব! দিন গণিতে গণিতে মাস হয়, মাস গণিতে গণিতে বৎসর হয়, বৎসর গণিতে গণিতে শতাব্দী হয়, শতাব্দীও ফিরিয়া ফিরিয়া কতবার গণি। কৈ অনেক দিবসে মনের মানসে বিধি মিলাইল কৈ?”

বঙ্কিমচন্দ্রের এই ‘মনের মানস’ কি? উহা বাঙলার স্বাধীনতা; শুধু রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নহে, শৌর্যে-বীর্যে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সাহিত্যে-শিল্পে, চরিত্রের সর্বাঙ্গীণ মহিমায় বাঙালী আবার মানুষ হইয়া উঠিবে, জগতের ভিতরে আদর্শস্থানীয় হইয়া উঠিবে বাঙলার গৌরবোজ্জ্বল মূর্তি—ইহাই বঙ্কিমের জাগরণ ও নিদ্রার স্বপ্ন। প্রতি মুহূর্তের এই স্বপ্ন, প্রাণের এই উন্মাদ বাসনা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার প্রত্যেকটি অক্ষরের ভিতর দিয়া যেন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। এই রচনার আবেদন শুধু আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির কাছে নহে, আমাদের সকল আন্তর সত্তার কাছে। ইহাকে আমরা গ্রহণ করি আমাদের মনভরা স্বপ্ন লইয়া, বুকভরা আশা-আকাঙ্ক্ষা লইয়া, ধমনীতে প্রবাহিত চঞ্চল শোণিত-ধারার দোলায় দোলায়। বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন,—

“আর বঙ্গভূমি! তুমিই বা কেন মণিমাণিক্য হইলে না, তোমায় আমি হার করিয়া কণ্ঠে পরিতে পারিলাম না? তোমায় সুবর্ণের আসনে বসাইয়া হৃদয়ে দোলাইয়া দেশে দেশে দেখাইতাম। ইউরোপ, আমেরিকায়, মিশরে, চীনে দেখিত, তুমি আমার কি উজ্জ্বল মণি।”

এতখানি সত্যকারের হৃদয়াবেগ, মাতৃভূমির প্রতি এমন অকৃত্রিম

আত্মভোলা ভালোবাসা—বাঙালী জাতির জন্য এতখানি দরদবোধ—ইহা বঙ্গসাহিত্যে দুর্লভ। বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছিলেন,—

"তোমায় যখন পড়ে মনে, আমি চাহি বৃন্দাবন পানে
আউলাইলে কেশ নাহি বাঁধি।"

বৈষ্ণব কবির এই বিরহের গান বঙ্কিমের হৃদয় বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। বাঙলার পূর্ব-গৌরব—বাঙলার দেশ-লক্ষ্মীকে স্মরণ করিয়া তিনি বলিতেছেন,—

"সুখ গিয়াছে, সুখচিহ্ন গিয়াছে, বঁধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে—চাহিব কোন দিকে ?

"চাহিবার এক শ্মশান-ভূমি আছে—নবদ্বীপ, সেইখানে সপ্তদশ যবনে বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল। বঙ্গমাতাকে মনে পড়িলে, আমি সেই শ্মশান-ভূমির প্রতি চাই। যখন দেখি সেই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম বেড়িয়া অদ্যাপি সেই কলধৌত-বাহিনী গঙ্গা তরতর রব করিতেছেন, তখন গঙ্গাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি—তুমি আছ, সেই রাজলক্ষ্মী কোথায় ? তুমি যাহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতে, সে আনন্দরূপিণী কোথায় ? তুমি যাহার জন্য সিংহল, বালী, আরব, সুমাত্রা হইতে বুকে করিয়া ধন বহন করিয়া আনিতে সেই ধনেশ্বরী কোথায় ? ……মনে মনে আমি সেই দিন কল্পনা করিয়া কাঁদি। মনে মনে দেখিতে পাই, কালপূর্ণ দেখিয়া নবদ্বীপ হইতে বাঙ্গালার লক্ষ্মী অন্তহিত হইতেছেন। সহসা আকাশ অন্ধকারে ব্যাপিল, রাজপ্রাসাদের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। পথিক ভীত হইয়া পথ ছাড়িল ; নাগরীর অলঙ্কার খসিয়া পড়িল ; কুঞ্জবনে পক্ষিগণ নীরব হইল ; গৃহময়ূরকণ্ঠে অর্দ্ধব্যক্ত কেকার অপরার্দ্ধ আর ফুটিল না। দিবসে নিশীথ উপস্থিত হইল, পণ্যবীথিকার দীপমালা নিবিয়া গেল, পূজাগৃহে বাজিবার সময় শঙ্খ বাজিল না ; গাঢ়তর গাঢ়তর অন্ধকারে দিক ব্যাপিল। আকাশ অট্টালিকা, রাজধানী, রাজবর্ত্ম, দেবমন্দির, পণ্যবীথিকা সেই অন্ধকারে—আঁধার, আঁধার, আঁধার হইয়া লুকাইল। আমি চক্ষে সব দেখিতেছি, আকাশ মেঘে ঢাকিতেছে, ঐ সোপানাবলী অবতরণ করিয়া রাজলক্ষ্মী জলে নামিতেছেন। অন্ধকারে নির্ব্বাণোন্মুখ আলোকবিন্দুবৎ জলে ক্রমে ক্রমে সেই তেজোরাশি বিলীন হইতেছে !"

(ভাঙা হৃদয়ে সজল নয়নে নিরুদ্ধশ্বাসে বঙ্কিমচন্দ্র কেমন করিয়া বাঙলার গৌরবলক্ষ্মীর সেই অন্তর্ধান মানস-পটে দর্শন করিতেছিলেন, তাহার জীবন্ত

চিত্র ইহা হইতে আর কিরূপে বেশী প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে পারে? ইহা নিছক স্বাদেশিকতার উচ্ছ্বাস নহে, ইহার ঐতিহাসিক মূল্যও সর্বজন-স্বীকৃত নাও হইতে পারে, কিন্তু ইহা সাহিত্য, এখানে জাগিয়াছে লেখকের সহিত পাঠকের নিবিড়তম হৃদয়ের সংবাদ। বঙ্কিমের ভিতরে যে অকৃত্রিম স্বদেশ-প্রেমিকটি ছিল সে যেখানে নিছক কতগুলি গালভরা রাজনৈতিক সমস্যার চর্চা না করিয়া নিজেকে রসস্পন্দনের ভিতরে একেবারে বিলাইয়া দিতে পারিয়াছে, সেইখানেই জাতীয়তাবাদও সাহিত্যের রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

আমরা দেখিয়াছি, রচনা-সাহিত্যের কাজ নিকটতম বন্ধুর মত হৃদয়ের কোমল গভীর নিভৃত কোণটি পাঠকের নিকটে একান্ত অসঙ্কোচে উন্মুক্ত করিয়া ধরা। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তরের' ভিতরেও দেখিতে পাই এই প্রাণ খুলিয়া কথা বলিবার রীতি। ধরা যাক্ দপ্তরের প্রথম সংখ্যার কথা। প্রথমে লেখক বলিলেন,—"বহুতন্ত্রীবিশিষ্ট বাদ্যের তন্ত্রীতে অঙ্গুলিস্পর্শের ন্যায় ঐ গীতধ্বনি আমার হৃদয়কে আলোড়িত করে কেন?" আমরা ভাবিলাম লেখক সেই কথাই বুঝি সর্বপ্রথমে খুলিয়া বলিবেন; কিন্তু কথা প্রসঙ্গে মনের তারে লাগিতেছে কত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আঘাত, বাজিয়া উঠিতেছে কত স্ফুট অস্ফুট ধ্বনি,—মন যেন এক ঘাট হইতে ভাসিয়া যায় কত দূরের অন্য ঘাটে। তাই বলিতে বলিতে লেখক বলিতেছেন,—

"……কেবল ইহাই জানি যে, আমি একা। কেহ একা থাকিও না। যদি অন্য কেহ তোমার প্রণয়ভাগী না হইল, তবে তোমার মনুষ্য জন্ম বৃথা। পুষ্প সুগন্ধী, কিন্তু যদি ঘ্রাণগ্রহণকর্ত্তা না থাকিত, তবে পুষ্প সুগন্ধী হইত না —ঘ্রাণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট না থাকিলে গন্ধ নাই। পুষ্প আপনার জন্য ফুটে না। পরের জন্য তোমার হৃদয়কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও।"

বলিতে বলিতে আবার তিনি থামিয়া পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরিয়া আসিলেন,—"কিন্তু বারেকমাত্র শ্রুত ঐ সঙ্গীত আমার কেন এত মধুর লাগিল তাহা বলি নাই।" কিন্তু আবারও তাহা বলা হইল না, বলিতে বলিতে মনের পটভূমিতে ভিড় করিয়া দাঁড়ায় গত জীবনের কত দুঃখ-সুখের স্মৃতি,—কত আশা-নিরাশার কথা—আবার লেখক খেই হারাইয়া যেন কোথায় চলিয়া যান; কিন্তু সহসা আবার থামিয়া যান,—"কিন্তু কি বলিতেছিলাম, ভুলিয়া গেলাম। সেই গীতধ্বনি!"

দপ্তরের প্রায় সবগুলি রচনার ভিতরেই দেখিতে পাই এই সহজ ভাবে

কথোপকথনের রীতি। লেখক কি বলিবেন, কেমন করিয়া বলিবেন আগে যেন কিছুই ভাবিয়া রাখেন নাই; একটি রসের আবেদনে সমগ্র প্রাণ-মন ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে, তিনি তাহাকেই ভাষা দিতে বসিয়াছেন,—ভাষা ও গঠনরীতি আপনা-আপনি গড়িয়া উঠিতেছে। আমাদের বন্ধু-বান্ধবের সহিত আলাপ-আলোচনা আমরা সাধারণতঃ চপল হাস্য-পরিহাসের ভিতর দিয়াই জমাইয়া তুলি, একটু একটু করিয়া হাস্য-পরিহাসের পাতলা যবনিকা টানিয়া ফেলিয়া আমরা মনের অজ্ঞাতেই যেন হৃদয়ের গভীরে চলিয়া যাই, আমরা নিজেরাই বুঝিতে পারি না, একটু একটু করিয়া কখন যে আমরা গম্ভীর হইয়া উঠি। "কমলাকান্তের দপ্তর" বিশ্লেষ করিলেও আমরা এই একই রীতি আবিষ্কার করিতে পারিব।

("কমলাকান্তের দপ্তর" হাস্য-পরিহাসে ভরা, এবং রবীন্দ্রনাথ সত্যই বলিয়াছেন যে, বাংলা-সাহিত্যে নির্মল শুভ্র হাস্য-রস আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতরেই প্রথম পাইয়াছিলাম। সেই হাস্য-পরিহাস এই দপ্তরগুলিকে দান করিয়াছে একটা অকপট সারল্য। সাহিত্যিক রচনার দোষগুণ বিচার করিতে গিয়া অনেক সমালোচকই বলিয়াছেন যে, এই নির্মল শুভ্র হাস্যরসই সর্ববিধ রচনার প্রধান গুণ। এই নির্মল শুভ্র হাস্যরসেরই ইংরেজি নাম 'হিউমর'। 'হিউমরে'র আমরা বাঙলা প্রতিশব্দ দিতে চাই 'রসিকতা'। অবশ্য 'রসিকতা' কথাটা এখন আমরা বড় তরল এবং স্থূল অর্থে ব্যবহার করি; কিন্তু 'হিউমর' এবং 'রসিকতা' মূলে একই জিনিস। ইংরেজি 'হিউমর' কথাটির মূল অর্থ একপ্রকার জৈবিক রস যাহা আমাদের শরীরের ভিতরে থাকিয়া আমাদের মনটিকে তাহার পরিপূর্ণ খেয়াল-খুশীতে বিচরণ করিতে সাহায্য করে। ইহারই প্রতিশব্দ আমাদের 'রস' কথাটি; 'রস' দৈহিকও বটে মানসিকও বটে,—দেহমন উভয়কে জুড়িয়া সে আমাদের মেজাজ-মর্জি সর্বদা নিয়ন্ত্রণ করে। রস যাঁহার সহজাত, তিনিই প্রকৃতিতে রসিক, সেই রসিকের স্বধর্মই 'রসিকতা'।)

মোটের উপরে আমরা যখনই 'সরস' থাকি তখনই আমরা আমাদের খেয়াল-খুশীতে থাকি; সেই খেয়াল-খুশীতে যে রচনা তাহাই 'সরস' রচনা। এই 'সরসতা' আমাদের একান্তই প্রকৃতিগত গুণ, যাঁহার আছে, তাঁহার আছে,—যাঁহার নাই—তাঁহার নাই; চেষ্টা করিয়া যত্ন করিয়া, শিখিয়া বুঝিয়া এই 'সরসতা' লাভ করা যায় না,—চেষ্টা করিলেই তাহার কৃত্রিমতা বিরূপ

হাস্যের সৃষ্টি করিবে। যাঁহারই রচনারীতিতে আমরা এই 'সরসতা' গুণ দেখিতে পাইব, একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিব সেই নির্মল শুভ্র 'সরসতা'-গুণ লেখকের একেবারে ধাতুগত জিনিস। রচনার ভিতরকার এইজাতীয় 'সরসতা' বা 'রসিকতা'কে আমরা ব্যঞ্জনের মশলার সহিত তুলনা করিতে পারি। উপাদন যত পুষ্টিকর হোক, মশলা ব্যতীত ব্যঞ্জনের স্বাদ জমে না। আর শুধু স্বাদ নয়, 'স্বাদাধিক্যে'ই আবার 'গুণাধিক্য'। মশলা শুধু স্বাদ বৃদ্ধিই করে না, দুষ্পাচ্য আহার্যকেও সে অনেক সময় সুপাচ্য করিয়া তোলে। জীবনের প্রজ্ঞালব্ধ সকল তথ্য এবং সত্যই রচনা-সাহিত্যে স্বাদু এবং সুপাচ্য হইয়া ওঠে এই খুশীমনের 'রস'-সংযোগে।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র ভাব ও রীতির উপরে ইংরেজি সাহিত্যের কিছু কিছু অস্পষ্ট প্রভাব লক্ষিত হয়। এখানে সেখানে বহিরঙ্গ যে সকল মিল রহিয়াছে * তাহার কথা বাদ দিলেও মৌলিক আকৃতি-প্রকৃতির সাদৃশ্যও কিছু কিছু মনে আসিতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের পরিহাস এবং বিদ্রূপসমন্বিত সমালোচনাত্মক প্রবন্ধগুলি অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজি রচনা-সাহিত্যের, বিশেষ করিয়া এডিসন্, এবং স্টীলের, রচনার সমধর্মী বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। এডিসন্, স্টীল প্রভৃতির লেখা যে সকল সাময়িক পত্রে বাহির হইত তাহার ভিতরে প্রধান পত্র 'স্পেক্টেটর' (Spectator); ইহার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গ-দর্শন' পত্রিকার নাম-সাদৃশ্যও লক্ষণীয়। এডিসন্ এবং স্টীল একজাতীয় হাস্য-রসাত্মক রচনার প্রচলন করিয়াছিলেন, যাহার ভিতর দিয়া তাঁহারা পরিহাসচ্ছলে তৎকালীন সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে যে সকল গলদ দেখা দিয়াছিল তাহার মৃদু সমালোচনা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের দপ্তরের ভিতরে অনেকগুলি রচনা এই আদর্শে

---

*যেমন 'কমল'কান্ত চক্রবর্তী' অতি অস্পষ্টভাবে ইংরেজ রচনাকার এডিসনের গ্রাম্য ভদ্রলোক 'রোজার ডি কভলি'কে (Roger de Coye'ley) স্মরণ করাইতে পারে। 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র গ্রন্থসম্পাদক ও টীকাকার ভীষ্মদেব খোশনবীস স্কটের 'টেলস অব্ মাই ল্যাণ্ডলর্ড' (Tales of my Landlord) উপন্যাসের 'জেডিডিয়াক্লেইশবোথাম্'-এর (Jedediahcleish-bothum) অনুরূপ। কমলাকান্তের আফিং-এর নেশায় দিবা-স্বপ্ন দেখা ডি কুইন্সি কৃত 'দি কন্‌ফেশন্‌স্ অফ্ এ্যান্ ইংলিশ ওপিয়াম্-ইটার' (The Confeosions of an English Opium-eater) গ্রন্থখানিকে স্মরণ করাইতে পারে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের 'Western Influcnce on Bengali Literature' গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য।

অনুপ্রাণিত। এই সকল সাদৃশ্য এবং সাধর্ম্য সত্ত্বেও 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র উপরে এই সব পাশ্চাত্য লেখকের প্রভাব আমাদের নিকট অতি গৌণ বলিয়া মনে হয়। কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের এই সকল রচনার ভিতরে যে একটা অনুভূতির তীব্রতা, ভাবের প্রবল আবেগ, চিন্তার গভীরতা এবং প্রকাশভঙ্গির সরসতা লক্ষ্য করিতে পারি আমাদের বিচারে উপরিউক্ত পাশ্চাত্য লেখকগণের লেখায় তাহা দুর্লভ। একটা আদর্শ হয়ত তিনি গ্রহণ করিয়া থাকিতে পারেন—নাও গ্রহণ করিয়া থাকিতে পারেন; কিন্তু সেই আদর্শের ভিত্তিতে যে রূপায়ণ তাহা ইংরেজ লেখকগণের সহিত সাধর্ম্যকে অনেকখানি অতিক্রম করিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

(উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের সাহিত্য কোন সুদৃঢ় বনিয়াদের উপরে আপন স্বাতন্ত্র্যে দাঁড়াইয়া উঠিতে পারে নাই, সস্তায় জনপ্রিয়তা লাভ করিয়া রাতারাতি একটা বড় সাহিত্যিক হইবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা অনেকেরই মাথায় ঝাঁকিয়া বসিয়াছিল। আত্ম-প্রত্যয়ের অভাবে, ইংরাজি সাহিত্যের অন্ধ অনুকরণের ফলে আমাদের যে সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছিল তাহাকে বঙ্কিমচন্দ্র 'অপক্ব কদলী' আখ্যা দিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজি সাহিত্যে স্থানে অস্থানে 'কোটেশন' প্রয়োগের বাহুল্য একটা বাতিকের মতন বহু লেখককে পাইয়া বসিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই রোগটি বাঙলাদেশের সাহিত্যিকগণের ভিতরেও সংক্রামিত হইয়া পড়ে। অকারণ 'কোটেশনে'র দ্বারা পাণ্ডিত্যভারে রচনাকে দুর্বহরূপে ভারী করিয়া দিবার চেষ্টা অনেক লেখককেই যেন একেবারে পাইয়া বসিয়াছিল। এইজাতীয় লেখকদিগকে লক্ষ্য করিয়াই কমলাকান্ত বঙ্গদর্শন পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পত্রে বিদ্রূপ বর্ষণ করিয়াছিলেন। তৎকালীন নাট্যসাহিত্যেও যে স্থূল রসিকতার ঢং প্রচলিত ছিল এবং বীরত্ব ও শোক প্রকাশের যে হাস্যকর রীতি প্রচলিত ছিল তাহা সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। নাট্যকারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অমার্জিতরুচি দর্শক এবং শ্রোতাগণকে সস্তায় হাসাইয়া কাঁদাইয়া বাহবা গ্রহণ।*)

* নাট্য-সাহিত্যের সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের এই বিদ্রূপাত্মক রচনা আমাদিগকে এডিসনের 'দি লায়ন্ ইন্ দি অপেরা' (The Lion in the Opera) রচনাটির কথা স্মরণ করাইয়া দিতে পারে। সেখানেও লেখক পরিহাসচ্ছলে তৎকালীন নাট্য-রসিকগণের অমার্জিত রুচির উপরে তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন।

✓(বঙ্কিমচন্দ্র যে শুধু উনবিংশ শতাব্দীর নব শিক্ষিত পল্লবগ্রাহিদিগকে এবং সাহিত্যের আসরের অরসিকদিগকেই বিদ্রূপবাণে আহত করিয়াছেন তাহা নহে, প্রাচীন শিক্ষা এবং সংস্কৃতি যে গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্প্রদায়ের হাতে পড়িয়া নীরস এবং অকেজো হইয়া উঠিতেছিল এবং 'তর্ক যাদের অর্কফলার তুমুল আন্দোলন' হইয়া উঠিতেছিল, তাহাদের সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের হুলও কিছু কম তীক্ষ্ণ নহে। 'মনুষ্য-ফলে'র ভিতরে অধ্যাপক ব্রাহ্মণগণকে তিনি ধুতুরা ফল আখ্যা দিয়াছেন। "বড় বড় লম্বা লম্বা সমাসে, বড় বড় বচনে, তাঁহাদের সুদীর্ঘ কুসুমসকল প্রস্ফুটিত হয়, ফলের বেলা কণ্টকময় ধুতুরা।" বিশ্বসংসারের বড়-বাজারে ঢুকিয়া কমলাকান্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে ঝুনা নারিকেল বিক্রয় করিতে দেখিলেন। তখন—

"ব্রাহ্মণদিগের সেই প্রখর তপন-তপ্ত ঘর্ম্মাক্ত ললাট, এবং বাগ্‌বিতণ্ডাজনিত অধর-সুধাবৃষ্টি দেখিয়া দয়া হইল—জিজ্ঞাসা করিলাম, "হ্যাঁ ভট্টাচার্য্য মহাশয়! ঝুনা নারিকেল কিনিতে আপত্তি নাই, কিন্তু দোকানে দা আছে? ছুলিব কি প্রকারে?"

"না বাপু, দা রাখি না।"

"তবে নারিকেল ছোল কিসে?"

"আমরা ছুলি না, আমরা কামড়াইয়া ছোবড়া খাই।"

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের এই অবস্থার সুযোগ লইয়াই পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ একেবারে জাকিয়া উঠিয়াছেন।—

"আমি এই সকল দেখিতে শুনিতেছিলাম, এমত সময়ে সহসা দেখিলাম যে, ইংরেজ দোকানদারেরা লাঠি হাতে, দ্রুতবেগে ব্রাহ্মণদিগের ঝুনা নারিকেলের গাদার উপর গিয়া পড়িলেন। দেখিয়া ব্রাহ্মণরা নারিকেল ছাড়িয়া দিয়া নামাবলি ফেলিয়া মুক্তকচ্ছ হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন সাহেবেরা সেই সকল পরিত্যক্ত নারিকেল দোকানে উঠাইয়া লইয়া আসিয়া বিলাতী অস্ত্রে ছেদন করিয়া সুখে আহার করিতে লাগিলেন।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "এ কি হইল?" সাহেবেরা ইহাকে বলে 'Asiatic Researches।"

তৎকালীন লম্বা লম্বা বক্তৃতাকারী বাক্‌সর্ব্বস্ব দেশহিতৈষিগণকে বঙ্কিমচন্দ্র 'শিমুল ফুল' আখ্যা দিয়াছিলেন।

"যখন ফুল ফুটে, তখন দেখিতে শুনিতে বড় শোভা—বড় বড় রাঙ্গা, রাঙ্গা,

গাছ আলো করিয়া থাকে। কিন্তু আমার চক্ষে নেড়া গাছে অত রাঙ্গা ভাল দেখায় না। যদি ফুল ঘুচিয়া ফল ধরিল, তখন মনে করিলাম এইবার কিছু লাভ হইবে। কিন্তু তাহা বড় ঘটে না। কালক্রমে চৈত্রমাস আসিলে রৌদ্রের তাপে অন্তর্লঘু ফল ফট্ করিয়া ফাটিয়া উঠে; তাহার ভিতর হইতে খানিক তুলা বাহির হইয়া বঙ্গদেশময় ছড়িয়া পড়ে।"

তৎকালীন বঙ্গদেশীয় 'পলিটিক্যাল এজিটেশ্যনে'র রূপটি প্রকাশ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন,—

"শিবু কলুর পৌত্র দশম বর্ষীয় বালক, এক কাঁসি ভাত আনিয়া উঠানে বসিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। দূর হইতে একটি শ্বেতকৃষ্ণ কুক্কুর তাহা দেখিল। দেখিয়া একবার দাঁড়াইয়া চাহিয়া ক্ষুণ্নমনে জিহ্বা নিষ্কৃত করিল। অমল ধবল অন্নরাশি কাংস্যপাত্রে কুসুমদামবৎ বিরাজ করিতেছে—কুক্কুরের পেটটা দেখিলাম, নিতান্ত পড়িয়া আছে। কুক্কুর চাহিয়া চাহিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, একবার আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া হাই তুলিল। তারপর ভাবিয়া চিন্তিয়া ধীরে ধীরে এক এক পদ অগ্রসর হইল, এক একবার কলুপুত্রের অন্ন-পরিপূরিত বদন-প্রতি আড়-নয়নে কটাক্ষ করে, এক এক পা এগোয়। অকস্মাৎ অহিফেন প্রসাদে দিব্য চক্ষু লাভ করিলাম—দেখিলাম, এই ত পলিটিকস্—এই কুক্কুর ত পলিটিশ্যন! তখন মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক দেখিতে লাগিলাম যে, কুক্কুর পাকা পলিটিক্যাল চাল চালিতে আরম্ভ করিল। কুক্কুর দেখিল—কলু-পুত্র কিছু বলে না—বড় সদাশয় বালক,—কুক্কুর কাছে গিয়া থাবা পাতিয়া বসিল। ধীরে ধীরে লাঙ্গুল নাড়ে, আর কলুর পো'র মুখপানে চাহিয়া হ্যা হ্যা করিয়া হাঁপায়। তাহার ক্ষীণ কলেবর, পাতলা পেট, কাতর দৃষ্টি এবং ঘন ঘন নিঃশ্বাস দেখিয়া কলুপুত্রের দয়া হইল;—তাহার পলিটিক্যাল এজিটেশ্যন্ সফল হইল—কলুপুত্র একখানা মাছের কাঁটা উত্তম করিয়া চুষিয়া কুক্কুরের দিকে ঠেলিয়া দিল। কুক্কুর আগ্রহ সহকারে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া তাহা চর্ব্বণ, লেহন, গেলন এবং হজম করণে প্রবৃত্ত হইল। আনন্দে তাহার চক্ষু বুজিয়া আসিল।"

কিন্তু আরেক রকমের বৃষ-পলিটিকস্ আছে, যেখানে গায়ের জোরে শৃঙ্গের ভয় দেখাইয়া বৃষ কলুর খোল-বিচালি-পরিপূর্ণ নাদায় মুখ দিয়া সকল খাইয়া মনের সুখে নির্বিঘ্নে চলিয়া যায়,—সে পলিটিক্স বাঙালীর অজানা।

'কমলাকান্তের দপ্তরে'র পূর্বে লিখিত এবং প্রকাশিত 'লোকরহস্যে'র

ভিতরেও বঙ্কিমচন্দ্র এমনি করিয়াই তৎকালীন সমাজ, সভ্যতা, ধর্ম, রাজনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়াছেন। আমাদের তথাকথিত সভ্যতা এবং সংস্কৃতি যে অনেকস্থলেই আদিম বর্বরতার উপরে একটা মন ভুলান প্রলেপ মাত্র এ কথা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার বহু রচনার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। 'লোক-রহস্যে'র একস্থানে 'ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল' বলিতেছেন,—

"বিষয়কর্ম্ম, আহারান্বেষণ। এখন সভ্যলোক আহারান্বেষণকে বিষয়কর্ম্ম বলে। ফলে সকলেই যে আহারান্বেষণকে বিষয়কর্ম্ম বলে, এমত নহে। সম্ভ্রান্ত লোকের আহারান্বেষণের নাম বিষয়কর্ম্ম, অসম্ভ্রান্তের আহারান্বেষণের নাম চুরি, বলবানের আহারান্বেষণের নাম দস্যুতা, লোকবিশেষে দস্যুতা শব্দ ব্যবহার হয় না, তৎপরিবর্ত্তে বীরত্ব বলিতে হয়। যে দস্যুর দণ্ডপ্রণেতা আছে, সেই দস্যুর কার্য্যের নাম দস্যুতা, যে দস্যুর দণ্ডপ্রণেতা নাই, তাহার দস্যুতার নাম বীরত্ব। আপনারা যখন সভ্য সমাজে অধিষ্ঠিত হইবেন, তখন সেই সকল নামবৈচিত্র্য স্মরণ করিবেন, নচেৎ লোক অসভ্য বলিবে।"

অন্যত্র দেখিতে পাই, ব্যাঘ্রগণের সভা মধ্যে যখন 'পণ্ডিতবর ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল' তাঁহার সুদীর্ঘ বক্তৃতা সমাপন করিয়া বিপুল লাঙ্গুল-চটচটার ভিতরে উপবেশন করিলেন তখন 'দীর্ঘনখ' নামক ব্যাঘ্র বক্তাকে স্পষ্টতঃ গণ্ডমূর্খ বলিয়া গালি দিয়াছিল, তাহাতে আপত্তি করিয়া 'অমিতোদর' নামক ব্যাঘ্র বলিয়াছিল,—

"আপনি ক্ষান্ত হউন। সভ্যজাতীয়েরা অতি স্পষ্ট করিয়া গালি দেয় না। প্রচ্ছন্নভাবে আপনি আরও গুরুতর গালি দিতে পারেন।"

তৎকালীন দেশপ্রীতির ভণ্ডামিকে লক্ষ্য করিয়া একস্থানে বঙ্কিম লিখিয়াছেন—

"তখন বৃহল্লাঙ্গুল মহাশয় জন্মভূমির প্রেমে অভিভূত হইয়া অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। বোধ হইল তিনি অশ্রুপাত করিতেছিলেন এবং দুই একবিন্দু স্বচ্ছ ধারাপতনের চিহ্ন ভূতলে দেখা গিয়াছিল। কিন্তু কতিপয় যুবা ব্যাঘ্র তর্ক করেন যে, সে বৃহল্লাঙ্গুলের অশ্রুপতনের চিহ্ন নহে। মনুষ্যালয়ের প্রচুর আহারের কথা স্মরণ হইয়া সেই ব্যাঘ্রের মুখে লাল পড়িয়াছিল।"

'লোক-রহস্যে'র প্রথম দুইটি প্রবন্ধের ভিতর দিয়া পশুগণের সভায় ব্যাঘ্র বা বানরগণের যত বক্তৃতাদি দেখিতে পাই, তাহার প্রায় প্রত্যেকটি কথার একটি বিদ্রূপাত্মক ধ্বনি রহিয়াছে; মনুষ্যেতর পশুগণের বক্তৃতায় এই ব্যঙ্গ

সত্যই উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। তৎকালে প্রচলিত রাজনীতির দুইটি ধারা ছিল। শক্তিশালী জাতিগুলি সভ্যতা বিস্তারের নামে দুর্বল জাতিগুলিকে আয়ত্তে আনিয়া তাহাদিগকেই জৈবিক উপজীব্য করিয়া লইত; বাঙালীর ন্যায় দুর্বল জাতিগুলি শুধু সভা-সমিতিতে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া এবং যথাসাধ্য সবলের ক্রূর রোষদৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করিয়া সবলের নিন্দাবাদ করিয়াই আত্মপ্রসাদ নামক আত্ম-প্রতারণা লাভ করিত। রাজনীতির এই দুইটি ধারা অতি চমৎকার ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে নিম্নোদ্ধৃত রচনাংশে।

"দীর্ঘনখ এইরূপ বক্তৃতা করিলেন। পরে, সভাপতি অমিতোদর বলিতে লাগিলেন,—

"এক্ষণে রাত্রি অধিক হইয়াছে, বিষয়-কর্ম্মের সময় উপস্থিত। বিশেষ হরিণের পাল কখন্ আইসে, তাহার স্থিরতা কি? অতএব দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া কালহরণ কর্ত্তব্য নহে। বক্তৃতা অতি উত্তম হইয়াছে—এবং বৃহল্লাঙ্গূল মহাশয়ের নিকটে আমরা বড় বাধিত হইলাম। এক কথা এই বলিতে চাহি যে, আপনারা দুই দিন যে বক্তৃতা শুনিলেন, তাহাতে অবশ্য বুঝিয়া থাকিবেন যে, মনুষ্য অতি অসভ্য পশু। আমরা অতি সভ্য পশু। সুতরাং আমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে যে, আমরা মনুষ্যগণকে আমাদের ন্যায় সভ্য করি, মনুষ্যদিগকে সভ্য করিবার জন্য জগদীশ্বরই আমাদিগকে এই সুন্দরবনভূমিতে প্রেরণ করিয়াছেন।....এইরূপ সভ্যতাই আমরা শিখিতে (শিখাইতে) চাই। অতএব আপনারা এবিষয়ে মনোযোগী হউন! ব্যাঘ্রদিগের কর্ত্তব্য যে, মনুষ্যদিগকে অগ্রে সভ্য করিয়া পশ্চাৎ ভোজন করেন।"

"সভাপতি মহাশয় এইরূপে বক্তৃতা সমাপন করিয়া লাঙ্গূল চটচটার মধ্যে উপবেশন করিলেন, তখন সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদানানন্তর ব্যাঘ্রদিগের মহাসভা ভঙ্গ হইল। তাঁহারা যে যথায় পারিলেন, বিষয়-কর্ম্মে প্রয়াণ করিলেন।

"যে ভূমিখণ্ডে সভার অধিষ্ঠান হইয়াছিল, তাহার চারিপার্শ্বে কতকগুলিন বড় বড় গাছ ছিল। কতকগুলিন বানর তদুপরি আরোহণ করিয়া, বৃক্ষপত্র-মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া ব্যাঘ্রদিগের বক্তৃতা শুনিতেছিল। ব্যাঘ্রেরা সভাভূমি ত্যাগ করিয়া গেলে একটি বানর মুখ বাহির করিয়া অন্য বানরকে ডাকিয়া কহিল, "বলি ভায়া, ডালে আছ?"

দ্বিতীয় বানর বলিল, "আজ্ঞে আছি।"

প্রথম বানর, "আইস, আমরা এই ব্যাঘ্রদিগের বক্তৃতার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই।"

দ্বি, বা। কেন?

প্র, বা। এই বাঘেরা আমারদিগের চিরশত্রু। আইস, কিছু নিন্দা করিয়া শত্রুতা সাধা যাউক।

দ্বি, বা। অবশ্য কর্ত্তব্য। কাজটা আমাদিগের জাতির উচিত বটে।

প্র, বা। আচ্ছা, তবে দেখ, বাঘেরা কেহ নিকটে নাই ত?

দ্বি, বা। তথাপি আপনি একটু প্রচ্ছন্ন থাকিয়া বলুন।

* * * *

এইরূপে বানরেরা ব্যাঘ্রদিগের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত রহিল। দেখিয়া এক স্থূলোদর বানর বলিল যে, "আমরা যেরূপ নিন্দাবাদ করিলাম, তাহাতে বৃহল্লাঙ্গূল বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবে।"

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার রচনার ভিতর দিয়া তৎকালীন সাহিত্য, সভ্যতা, সংস্কৃতি, রাজনীতি প্রভৃতিকে কি ভাবে পরিহাসের মধু মিশাইয়া সমালোচনা করিয়াছেন তাহা আমরা দেখিলাম। পূর্বেই বলিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতরে যেমন ছিল একটি পরিহাসপটু গভীর রসিক, অন্যদিকে ছিল একটি কঠোর শাসক—একটি সংস্কর্তা। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, এই সমালোচনা, এই সংস্কারের বুদ্ধি সাহিত্যিক রূপ লাভ করিয়াছিল কি প্রকারে? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে বঙ্কিমচন্দ্রের এই জাতীয় রচনাগুলি আলোচনা করিলে দেখিব, এখানে সংস্কার-বুদ্ধি বা প্রচারবুদ্ধিই প্রধান হইয়া ওঠে নাই, প্রধান হইয়া উঠিয়াছে তাহাদের সকলের ভিতর দিয়া বঙ্কিমের রস-সত্তার প্রকাশ। রচনাগুলির অন্তর্নিহিত যে প্রেরণা তাহা মুখ্যতঃ সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম বা রাজনীতির সংস্কার নহে, এই জন্যই এগুলি সাহিত্য। সেই 'কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে' —সাহিত্যের প্রাণ-বস্তুকে প্রাধান্য দিয়াই সংস্কার এবং প্রচার, সাহিত্যের দিক্ হইতে এখানে তাই আমরা বেশী কিছু আপত্তি তুলিতে পারি না।

'কমলাকান্তের দপ্তরে'র কতকগুলি রচনার ভিতরে রচনা-রীতির একটি বিশেষ ঢঙ্ দেখিতে পাই। অষ্টাদশ শতাব্দী এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজি রচনা-সাহিত্যেও এই বিশেষ ঢঙটি প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। এই জাতীয় রচনাকে বলা হয় 'ফ্যামিলিয়ার এসেস্' (Familiar Essays)। এই ধরণের রচনার বৈশিষ্ট্য এই, ইহার বিষয়বস্তু যে কি হইতে পারে এবং কি না হইতে

প্রারে সে সম্বন্ধে কোনই বিধি-নিষেধ নাই। অতি তুচ্ছ, অতি ক্ষুদ্র—একান্ত অকিঞ্চিৎকর কোনও একটি বিষয় বা প্রসঙ্গ ধরিয়া লেখক কথা বলিতে আরম্ভ করেন, তারপরে একটু একটু করিয়া তাহার ভিতরে আসিয়া পড়ে বহু সত্য ও তথ্য—বহু গম্ভীর আলোচনা; কথা বলিতে বলিতে মাঝে মাঝে তিনি গভীরে চলিয়া যান। পূর্বেই আমরা দেখিয়াছি যে, ভাল রচনা সহৃদয় দুইটি বন্ধুর মন খুলিয়া আলাপ আলোচনার মত; সে আলোচনা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সর্বদাই যে কোন গুরু বিষয় লইয়াই আরম্ভ হয় এমন কথা বলা যায় না, অতি সাধারণ বিষয় লইয়াই আরম্ভ হয় তাহার সূত্রপাত, ক্রমে হৃদয়ের দ্বার যায় খুলিয়া। আসল কথা, রচনা-সাহিত্যের যাহা প্রাণবস্তু তাহা প্রধানতঃ লেখকের ব্যক্তিত্বের স্পন্দন ও তাহার ভিতর দিয়া আমাদের সহিত তাঁহার নিকটতম পরিচয়। সুতরাং স্বভাবতঃই রচনা-সাহিত্যের প্রাণ অনেকখানি বিষয়-নিরপেক্ষ। এই জন্যই ভাল রচনা-মাত্রেই বিষয়-নিরপেক্ষ; ভাল রচনা লিখিতে হইলে যে ভাল বিষয়কেই গ্রহণ করিতে হইবে তাহা বলা যায় না, —অধিকাংশই নির্ভর করে লেখকের মনোধর্মের উপরে। কোন্ মুহূর্তে বিশ্বসৃষ্টির কোন্ একান্ত সাধারণ জিনিসও তাহার মনের উপরে আঘাত করিয়া যে কোন্ সূক্ষ্ম রাগিণীর ঝঙ্কার তুলিবে, এ বিষয়ে পূর্বাহ্ণেই কোন কথা বলিয়া রাখা সকল বস্তুবিদ্ এবং মনস্তত্ত্ববিদের ক্ষমতার অতীত। এই জন্যই দেখিতে পাই, এই 'ফ্যামিলিয়ার এসেস্'-এর লেখকগণ যে কি বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া কি কথা বলিবেন তাহার কিছুই ঠিক নাই। তাঁহাদের বিষয়বস্তুও যেমন অতি সাধারণ, রচনা-ভঙ্গিও অনুরূপ সাধারণ। একটি সহজভাব, একটি অকপট সারল্যই তাঁহাদের রচনা-ভঙ্গীকে সাহিত্যের মর্যাদা দান করে। ধরা যাক্ রাস্কিনের "এ ব্লেড্ অব্ গ্র্যাস্" (A Blade of Grass) রচনাটির কথা, একটি ঘাসের শীষকে অবলম্বন করিয়া রাস্কিনের কবিচিত্ত নিজেকে যেন একেবারে ঢালিয়া দিয়াছে এই ছোট রচনাটির ভিতরে—ঠিক যেন 'a lyric in prose'—একটি গদ্য লিরিক্। একটি ঘাসের শীষের ভিতরে লেখক নিজের মনের সবটুকু মাধুরী মিশাইয়া দিয়া ইহার ভিতরে কত নিগূঢ় সত্য, সৌন্দর্য, মাধুর্য এবং অপূর্ব মাহাত্ম্যের সৃষ্টি করিয়া তাহাকে যেন নূতন করিয়া গড়িয়া লইয়াছেন। রিচার্ড জেফেরিজের 'ব্রিটিশ মিউজিয়ামে পারাবত' (The Pigeons at the British Museum) রচনাটিতে দেখিতে পাই, ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সম্মুখে স্বচ্ছ সূর্যকিরণে যে পারাবতগুলি বসিয়া রহিয়াছে

তাহাদেরই কথাপ্রসঙ্গে লেখক একটু একটু করিয়া এই উপসংহারে পৌঁছিলেন, —"In the sunshine, by the shady verge of woods, by the sweet waters where the wild dove sips, there alone will thought be found"—"ছায়াসমাকীর্ণ বনপ্রান্তে স্বচ্ছমধুর জলের কাছে সূর্যকিরণে বসিয়া বন্য পারাবতগুলি যেখানে চঞ্চুদ্বারা জলপান করে, শুধু সেইখানেই ভাবনা খুঁজিয়া পাওয়া যায়।"

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র অনেকগুলি রচনার ভিতরেও দেখিতে পাই এই 'ফ্যামিলিয়ার এসেস্'-এর ঢঙ্। 'পতঙ্গ' শীর্ষক চতুর্থসংখ্যা দপ্তরে দেখিতে পাই,—

"ঝিমাইতে ঝিমাইতে দেখিলাম যে, একটা পতঙ্গ আসিয়া ফানুষের চারি পাশে শব্দ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। 'চোঁ-ও-ও-ও' 'বোঁ-ও-ও' করিয়া শব্দ করিতেছে। আফিমের ঝোঁকে মনে করিলাম, পতঙ্গের ভাষা কি বুঝিতে পারি না?"

ইহার পর চলিল নানা প্রসঙ্গ,—উপসংহারে আসিয়া দেখিলাম,—

"এখন হইতে আমার বোধ হইতে লাগিল যে, মনুষ্য মাত্রই পতঙ্গ, সকলের এক একটি বহ্নি আছে। সকলে সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে চাহে। সকলেই মনে করে, সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে তাহার অধিকার আছে—কেহ মরে, কেহ কাচে বাধিয়া ফিরিয়া আসে। জ্ঞানবহ্নি, ধনবহ্নি, মানবহ্নি, রূপবহ্নি, ধর্মবহ্নি, ইন্দ্রিয়বহ্নি—সংসার বহ্নিময়···বহ্নি কি, আমরা জানি না। রূপ, তেজ, তাপ, ক্রিয়া, গতি, এ সকল কথার অর্থ নাই। এখানে দর্শন হারি মানে। বিজ্ঞান হারি মানে, ধর্মপুস্তক হারি মানে, কাব্যগ্রন্থ হারি মানে। ঈশ্বর কি, ধর্ম কি, স্নেহ কি? তাহা কি, কিছু জানি না। তবু সেই অলৌকিক অপরিজ্ঞাত পদার্থ বেড়িয়া বেড়িয়া ফিরি। আমরা পতঙ্গ না ত কি?"

'আমার মন' (পঞ্চম সংখ্যা), 'বসন্তের কোকিল' (সপ্তম সংখ্যা), 'ফুলের বিবাহ' (নবম সংখ্যা) 'বড়-বাজার' (দশম সংখ্যা), 'ঢেঁকি' (চতুর্দশ সংখ্যা) প্রভৃতি রচনাগুলির ভিতরেও এই একই আকৃতি-প্রকৃতি দেখিতে পাই। কমলাকান্তের এই সকল দপ্তরের ভিতরে ইতস্ততঃ ছড়ান এইজাতীয় অনেকগুলি উক্তির ভিতরে হয়ত আমরা কোম্‌তের 'নিশ্চয়বাদ' (Positivism) এবং মিলের হিতবাদের গন্ধ পাইতে পারি; কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই

দেখিতে পাইব, এই দপ্তরগুলির ভিতরে এ সকল উক্তি নিছক উপদেশও হইয়া উঠে নাই, দর্শনও হইয়া ওঠে নাই,—ইহারা লাভ করিয়াছে রসমূর্তি,—এইখানেই ইহাদের সাহিত্যিক স্বরূপ।

'বিড়াল' শীর্ষক দপ্তরে বিড়ালের সুপ্রসিদ্ধ উক্তি—

"আর আমাদিগের দশা দেখ—আহারাভাবে উদর কৃশ, অস্থি পরিদৃশ্যমান, লাঙ্গুল বিনত, দাঁত বাহির হইয়াছে, জিহ্বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে, অবিরত আহারাভাবে ডাকিতেছি, মেও! মেও! খাইতে পাই না। আমাদের কাল চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না! এ পৃথিবীতে মৎস্য-মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। খাইতে দাও—নহিলে চুরি করিব।...চোরের দণ্ড আছে, নির্দ্দয়তার কি দণ্ড নাই? দরিদ্রের আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই?"

ইহার পশ্চাতে যে ব্যঞ্জনা রহিয়াছে তাহা ক্ষুরধার তীক্ষ্ণ—অথচ করুণ। এই সংখ্যা দপ্তর আমাদিগকে লি হাণ্টের (Leigh Hunt) "দি ক্যাট বাই দি ফায়ার" (The Cat by the Fire) রচনাটির কথা মনে করাইয়া দিতে পারে; ভঙ্গীতে উভয়ের ভিতরে সাদৃশ্য আছে।

(আমরা এতক্ষণ রচনা-সাহিত্য হিসাবে 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র একটা পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছি, এবং তাহার ভিতর দিয়া রচনা-সাহিত্য হিসাবে ইহার চমৎকারত্বই বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু রচনা-সাহিত্য হিসাবে 'কমলাকান্তের দপ্তর' একেবারে নির্দোষ নহে; সুতরাং এই দোষগুলিরও সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতে পারে।

এই 'দপ্তর' এবং 'পত্র'গুলির একটি প্রধান দোষ বহুস্থানে বর্ণনার অতিরেক। এমন অনেক স্থান আছে যেখানে অল্প দু'চার কথায় যে জিনিস বলা যাইতে পারিত, লেখক তাঁহার বহুভাষণে তরল, শিথিল এবং শ্রান্তিকর করিয়া তুলিয়াছেন। ইহাতে রচনার ব্যঞ্জনাগুণ অনেক ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। যেখানে আভাসই সুন্দর হইত সেখানে বহুভাষ অসৌষ্ঠব হইয়াছে। অনেক স্থানে লেখক নিজের যত কথা বলিয়াছেন তত কথা না বলিয়া—কিছু বলিয়া বাকিটা পাঠকের উপর ছাড়িয়া দিলে ভাল হইত।

দ্বিতীয়তঃ, বঙ্কিম তাঁহার রচনায় সর্বত্র 'রসিকতা'র নির্মলতা এবং শুভ্রতা রক্ষিতে পারেন নাই। উপহাসের চেষ্টা মাত্রাধিক্যে স্থানে স্থানে অপহাসে পর্যবসিত হইয়াছে, এবং স্থান বিশেষে এই রসিকতার মাত্রাধিক্য মনকে

রচনাটির অসৌষ্ঠব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বঙ্কিমের হাস্যরস সর্বত্র তাহার সূক্ষ্মতাকেও বজায় রাখিতে পারে নাই। ইংরেজি 'উইট্' জাতীয় 'রসিকতা' বঙ্কিমের খুব কম; তাঁহার 'রসিকতা' প্রায় সর্বত্রই 'হিউমর'-এর পর্যায়ের। কিন্তু এই 'হিউমর'-এর ভিতরেও অনেক স্থানে স্থূলতা আসিয়া পড়িয়াছে; হাস্যরসের এই স্থূলতা স্থানে স্থানে আরও অনুপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে আদিরসের মিশ্রণে।

বঙ্কিমের 'রসিকতা'র দু'এক স্থানে আর একটি দোষ হইযাছে তাহার সহবেদনহীন হুলের তীব্রতা। হাস্যরস যেখানে বিদ্রূপাত্মক সেখানেও সে স্বভাবতঃ বৈরাত্মক নহে। আমরা খোশমেজাজে যেখানে বিদ্রূপের দ্বারা আনন্দ লাভ করি সেখানেও বিদ্রূপের আলম্বনের সহিত আমাদের একটা সহবেদনশীল সহৃদয়তা থাকে; বিদ্রূপ যেখানে ক্ষতকর বা জ্বালাকর সেখানে বিদ্রূপকারী তাঁহার খোশ মেজাজ হারাইয়া ফেলিযাছেন মনে করিতে হইবে।

এই সকল দোষের ফলে দপ্তরের তিন চারিটি ব্যতীত অন্যগুলি সমগ্রভাবে উপভোগ্য হইয়া উঠিতে পারে নাই। সেগুলি অংশ বিশেষে ভাল লাগে—ছাড়িযা ছাড়িয়া পড়িয়া গেলে ভাল লাগে—কিন্তু সমগ্র রচনাটিকে সমানভাবে ভাল লাগে না।)

বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকরহস্য' কমলাকান্তের দপ্তরের পর্ববর্তী রচনা। দু'একটি রচনা ব্যতীত 'লোকরহস্যে'র অন্যান্য লেখা সাংবাদিকতার স্তর হইতে সাহিত্যের স্তরে উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, সাময়িকতাই সাংবাদিকতার লক্ষণ। সাময়িক চাহিদাকে মিটাইবার জন্যই এই সম্প্রদায়ের সামগ্রীর পরিবেশন হয়,—সস্তা মূল্য লইয়া কোন লেখা যতই সাময়িক আদর লাভ করুক না কেন, সে সাহিত্যের আদর লাভ করিতে পারে না।

আমরা পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের 'গদ্যপদ্য' রচনার উল্লেখ করিয়াছি। প্রসঙ্গক্রমে একথাও বহুবার আলোচনা করিয়াছি যে, গদ্য রচনাও যেখানে সাহিত্য—অর্থাৎ যেখানে সে একটা সাহিত্যিক সৃষ্টি—সেখানে পদ্যের সহিত তাহার আকৃতিগত ভেদ ছাড়া কোন স্পষ্ট মৌলিক প্রকৃতিগত ভেদ আবিষ্কার করা শক্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার ভিতরেও এই জাতীয় অন্ততঃ তিনটি রচনা আছে। একটা রসব্যঞ্জক সাহিত্যিক সৃষ্টির ভিতর দিয়া এ-জাতীয় রচনাগুলি অপূর্ব

স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে। আমরা পরে দেখিতে পাইব, রবীন্দ্রনাথের হাতে এই জাতীয় রচনা একটা বিশিষ্ট পরিণতি লাভ করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের এইজাতীয় রচনার ভিতরে 'মেঘ', 'বৃষ্টি' এবং 'খদ্যোতে'র নাম করা যাইতে পারে। 'বৃষ্টি'র শিল্পকৌশলটিই অভিনব।—

"চল নামি—আষাঢ় আসিয়াছে—চল নামি।

"আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু, একা একজনে যূথিকাকলির শুষ্ক মুখও ধুইতে পারি না—মল্লিকার ক্ষুদ্র হৃদয় ভরিতে পারি না। কিন্তু আমরা সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি কণা মনে করিলে পৃথিবী ভাসাই। ক্ষুদ্র কে?

"দেখ, যে একা, সেই সামান্য। যাহার ঐক্য নাই, সেই তুচ্ছ। দেখ ভাই সকল, কেহ একা নামিও না—অৰ্দ্ধপথে ঐ প্রচণ্ড রবির কিরণে শুকাইয়া যাইবে—চল সহস্রে সহস্রে, লক্ষে লক্ষে, অৰ্ব্বুদে অৰ্ব্বুদে এই বিশোষিতা পৃথিবী ভাসাইব।

"পৃথিবী ভাসাই। পর্ব্বতের মাথায় চড়িয়া, তাহার গলা ধরিয়া বুকে পা দিয়া, পৃথিবীতে নামিব; নির্ঝরপথে স্ফটিক হইয়া বাহির হইব; নদীকূলের শূন্যহৃদয় ভরাইয়া, তাহাদিগকে রূপের বসন পরাইয়া মহাকল্লোলে ভীমবাদ্য বাজাইয়া, তরঙ্গের উপরে তরঙ্গ মারিয়া, মহারঙ্গে ক্রীড়া করিব। এস সবে নামি!

* * * *

"দেখ দেখ, আমাদের দেখিয়া পৃথিবীর আহ্লাদ দেখ! গাছপালা মাথা নাড়িতেছে—নদী দুলিতেছে—ধান্যক্ষেত্র মাথা নামাইয়া প্রণাম করিতেছে—চাষা চষিতেছে—জলে ভিজিতেছে; কেবল বেণে বউ আমসী ও আমসত্ত্ব লইয়া পলাইতেছে। মর্ পাপিষ্ঠা, তুই একখানা রেখে যা না—আমরা খাব! দে মাগীর কাপড় ভিজিয়ে দে।

* * * *

"তা যাক্—আমাদের বল দেখ! দেখ, পর্ব্বত-কন্দর দেশ-প্রদেশ ধুইয়া লইয়া নূতন দেশ নির্ম্মাণ করিব। বিশীর্ণা সূত্রাকারা তটিনীকে কূলপ্লাবিনী দেশমার্জ্জনী অনন্ত-দেহ-ধারিণী জল-রাক্ষসী করিব। কোন দেশের মানুষ রাখিব—কোন দেশের মানুষ মারিব, কত জাহাজ বহিব, কত জাহাজ ডুবাইব —পৃথিবী জলময় করিব। অথচ আমরা কি ক্ষুদ্র! আমাদের মত বলবান্ কে?"

এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা-ক্ষমতা অপূর্ব উৎকর্ষ এবং চারুত্ব লাভ করিয়াছে। ইহার অভিনবত্ব এইখানে যে, বৃষ্টি সম্বন্ধে কোন স্কুলমার্কা রচনা লিখিতে গেলে আমরা যাহা লিখিতাম, এখানে তাহার সবই আছে,—তাহা সব লইয়াও রচনাটি অপূর্ব সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে। আষাঢের ঘন বর্ষার বর্ণনা এখানে সবই রহিয়াছে, বর্ষাগমে পৃথিবীর দিকে দিকে যে কি উল্লাস ও চঞ্চলতা দেখা যায়—বর্ষার কি লাভ কি ক্ষতি—কাহার কতটুকু সুবিধা—কাহার অসুবিধা—তাহার খুঁটিনাটি বর্ণনা পর্যন্ত রহিয়াছে,—কিন্তু ইহার অতিরিক্ত জিনিস রহিয়াছে অনেকখানি। একদিকে বর্ষা তাহার বর্ষণশব্দ পর্যন্ত লইয়া যেমন একেবারে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে—বর্ষাগমে পৃথিবীর অবস্থা যেমন চিত্রে চিত্রে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে,—অন্য দিকে আবার বর্ণনার খাঁচে খাঁচে অতি মধুর করিয়া শুনিতেছি বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তর্নিহিত সেই ঐক্যের বাণী, সেই বিশ্বহিতের বাণী, সেই সংসারের ক্ষুদ্রের সঙ্গে অন্তরের গভীর সমবেদনা; শুধু তাহাই নয়, বঙ্কিমের সেই চিরপরিচিত পরিহাসকুশলতাও এখানে মধুর হইয়া উঠিয়াছে, বৃষ্টির বাণীর সহিতই বঙ্কিমের সমস্ত বাণী মিলিয়া মিশিয়া আষাঢের বর্ষণমুখর স্নিগ্ধ ধারারই রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র শুধু ঔপন্যাসিক ছিলেন না—তাঁহার আজীবন সাধনা ছিল বাঙলা-সাহিত্যকে সকল দিক হইতে দৃঢ় বনিয়াদের উপরে গড়িয়া তোলা, তাহাকে সুখ-দুঃখে, হাস্য-পরিহাসে—মানুষের জীবনের যাহা কিছু সুন্দর এবং মধুর এবং মঙ্গলের তাহা দ্বারাই ভরিয়া তুলিতে। তাই তাঁহার প্রতিভা-শক্তি একদা কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল রচনা-সাহিত্যেরও দিকে। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের হাতে এই রচনা-সাহিত্য আরও অনেক সূক্ষ্ম মধুর বিকাশ লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু প্রথম গড়িয়া তুলিবার ভার ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে। শুধু প্রথম স্রষ্টা হিসাবেই নহে, সত্যকারের রচনাকার হিসাবেও বঙ্কিমের স্থান বাঙলা-সাহিত্যে গৌরবোজ্জ্বল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বঙ্গদর্শনের লেখকগণ

বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক রচনাকারগণের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি উপন্যাসও লিখিয়াছিলেন, কিন্তু মনে হয়, তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভার পরিচয় তাঁহার রচনায় এবং তাঁহার রচনা-শক্তির বিকাশ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত পালামৌ সম্বন্ধে ছয়টি রচনায়।

আপাতদৃষ্টিতে পালামৌ একটি ভ্রমণ-কাহিনী, কিন্তু ভ্রমণ-কাহিনীই ইহার সবটুকু পরিচয় নয়, ভ্রমণ-কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া পরিণত বয়সের লেখক তাঁহার শৈশব, কৈশোর, এবং যৌবনের সকল মধুর স্মৃতি,—তাঁহার জীবনের সরলতা, সরসতা, চেতন এবং অচেতনে ভরা বাহিরের চারি পাশের জগৎটার সহিত তাহার অন্তরঙ্গতাকেই ইতস্তত: অকুণ্ঠিতচিত্তে ছড়াইয়া দিয়াছেন। প্রৌঢ়জীবনের শান্তিময় নির্জন অবসরে বসিয়া তিনি গতজীবনের বিচিত্র স্মৃতির ভিতরে একেবারে ডুবিয়া গিয়া সেখান হইতেই বহুবিচিত্র মণি-মাণিক্য আনিয়া আমাদিগকে প্রীতি-উপহার দিয়াছেন।

পালামৌর কাহিনী লিখিতে বসিয়া লেখক অবশ্য দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন,—"অনেক দিনের কথা লিখিতে বসিয়াছি, সকল স্মরণ হয় না। পূর্ব্বে লিখিলে যাহা লিখিতাম, এক্ষণে যে তাহাই লিখিতেছি এমত নহে। পূর্ব্বে সেই সকল নির্জ্জন পর্ব্বত, কুসুমিত কানন প্রভৃতি যে চক্ষে দেখিয়াছিলাম, সে চক্ষু আর নাই।" কিন্তু পূর্বে লিখিলে লেখক ইহা অপেক্ষা আরও অনেক ভাল লিখিতে পারিতেন কিনা তাহা সন্দেহ, পূর্বের লেখায় হয় যৌবনোচিত উচ্ছ্বাস আধিক্য বেশী থাকিতে পারিত, কিন্তু পরিণত বয়সের নিরালা অবসরে গত জীবনের ভিতরে অবগাহন করিয়া যে বহুমূল্য স্মৃতির সংগ্রহ এবং সমস্ত রচনার ভিতরে সেই স্মৃতিকে টুকরা টুকরা করিয়া বিকীর্ণ করিয়া দেওয়া—এই দুর্লভ জিনিসটি পাইতে পারিতাম কিনা সন্দেহ।

পালামৌ পড়িতে বসিয়া প্রথমেই মনে হয়, ভ্রমণ-কাহিনীর ছলে লেখক যেমন করিয়া আমাদের সঙ্গে 'কথা বলিতেছেন', লেখার ভিতর দিয়া এমন

করিয়া কথা বলিতে আমরা আর খুব বেশী দেখি নাই। বস্তুতঃ সমস্তগুলি রচনার ভিতরেই মনে হয়,—লেখক যেন কলম ধরিয়া লেখেন নাই;—খোলা মনে শুধু কথা বলিয়া গিয়াছেন—আপন জনের নিকটে গত জীবনের 'গল্প' বলিয়া গিয়াছেন। লেখক নিজেও বলিয়াছেন,—"এক্ষণে আমায় কেহ অনুরোধ করে না, অথচ আমি সেই বৃত্তান্ত লিখিতে বসিয়াছি। তাৎপর্য্য বয়স। গল্প করা এ বয়সের রোগ, কেহ শুনুন বা না শুনুন, বৃদ্ধ গল্প করে।" গত জীবনের স্মৃতির ভিতরে মাঝে মাঝে ডুবিয়া গিয়া তাহাকে নূতন করিয়া মনে মনে উপভোগ করিতে মানুষের একটা গভীর আনন্দ আছে। গত জীবনের 'গল্পে'র ভিতর দিয়া মনের জ্ঞাতে অজ্ঞাতে আমরা পুরাণ জীবনকে নূতন করিয়া যাপন করি,—মানসিক জীবন-যাপনের ভিতরে একটা পরোক্ষ আনন্দ থাকে, সেই পরোক্ষ আনন্দের আবেগেই বৃদ্ধ তাঁহার গল্প বলিতে ভালোবাসেন,—সেই আনন্দের আবেগেই লেখক এই রচনাগুলির ভিতর দিয়া নিজের গল্প করিয়া গিয়াছেন। এ সম্বন্ধে লেখক নিজেই বলিয়াছেন,—

"মৌয়ার ফুল শেফালিকার মত ঝরিয়া পড়ে, প্রাতে বৃক্ষতলে একেবারে বিছাইয়া থাকে। সেখানে সহস্র সহস্র মাছি, মৌমাছি ঘুরিয়া ফিরিয়া উড়িয়া বেড়ায়, তাহাদের কোলাহলে বন পূরিয়া যায়। বোধহয় দূরে কোথায় একটা হাট বসিয়াছে। একদিন ভোরে নিদ্রা ভঙ্গে সেই শব্দে যেন স্বপ্নবৎ কি একটা অস্পষ্ট সুখ আমার স্মরণ হইতে হইতে আর হইল না। কোন্ বয়সের কোন্ সুখের স্মৃতি তাহা প্রথমে কিছুই অনুভব হয় নাই, সে দিকে মনও যায় নাই। পরে তাহা স্পষ্ট স্মরণ হইয়াছিল। অনেকের এইরূপ স্মৃতি বৈকল্য ঘটিয়া থাকে। কোন একটি দ্রব্য দেখিয়া বা কোন একটি সুর শুনিয়া অনেকের মনে হঠাৎ একটা সুখের আলোক আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন মন যেন আহ্লাদে কাঁপিয়া উঠে অথচ কি জন্য এই আহ্লাদ, তাহা বুঝা যায় না। বৃদ্ধেরা বলেন, ইহা জন্মান্তরীণ সুখস্মৃতি। তাহা হইলে হইতে পারে; যাঁহাদের পূর্ব্বজন্ম ছিল, তাঁহাদের সকলই সম্ভব। কিন্তু আমার নিজ সম্বন্ধে যাহা বলিতেছিলাম, তাহা ইহজন্মের স্মৃতি। বাল্যকাল আমি যে পল্লীগ্রামে অতিবাহিত করিয়াছি, তথায় নিত্য প্রাতে বিস্তর ফুল ফুটিত, সুতরাং নিত্য প্রাতে বিস্তর মৌমাছি আসিয়া গোল বাধাইত। সেই সঙ্গে ঘরে বাহিরে, ঘাটে পথে হরিনাম—অস্ফুটস্বরে, নানা বয়সের নানা কণ্ঠে, গুন্ গুন্ শব্দে হরিনাম মিশিয়া কেমন

একটা গম্ভীর সুর নিত্য প্রাতে জমিত, তাহা তখন ভাল লাগিত কিনা স্মরণ নাই, এখনও ভাললাগে কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু সেই সুর আমার অন্তরে অন্তরে কোথায় লুকান ছিল, তাহা যেন হঠাৎ বাজিয়া উঠিল। কেবল সুর নহে, লতা পল্লবশোভিত সেই পল্লীগ্রাম, নিজের সেই অল্প বয়স, সেই সময়ের সঙ্গিগণ, সেই প্রাতঃকাল, কুসুমসুবাসিত সেই প্রাতর্বায়ু, তাহার সেই ধীর সঞ্চরণ সকলগুলি একত্রে উপস্থিত হইল। সকলগুলি একত্রিত হইল বলিয়া এই সুখ, নতুবা কেবল মৌমাছির শব্দে সুখ নহে।"

[৬ষ্ঠ অংশ]

এই অতীত জীবনের স্মৃতির মধ্যে অবগাহনের ভিতরে বঙ্কিমের সহিত সঞ্জীবের আশ্চর্য মিল রহিয়াছে, উপরি উদ্ধৃত অংশের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'একা' রচনাটির তুলনা করিলেই এ কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করা যাইবে। রচনার রীতির দিক হইতেও উভয়ের সাধর্ম্য লক্ষণীয়।

পালামৌ এর কাহিনী বলিতে বলিতে লেখকের বহুবার প্রসঙ্গচ্যুতি ঘটিয়াছে, লেখক নিজেই বুঝিতে পারিয়াছেন,—পালামৌকে অবলম্বন করিয়া নিজের জীবনের কথা—নিজের সুখ-দুঃখের কথা—রুচি-অরুচি, খেয়াল খুশীর কথাই বার বার আসিয়া ভিড় করিতেছে; তাই থাকিয়া থাকিয়া নিজেই বহুবার বলিয়াছেন,—"এক্ষণে এ সকল কথা যাউক, অনেকের নিকট ইহা শিবের গীত বোধ হইবে, কিন্তু এ বয়সে যখন যাহা মনে হয় তখনই তাহা বলিতে ইচ্ছা যায়; লোকের ভাল লাগিবে না এ কথা মনে তখন থাকে না। যাহাই হউক আগামী বারে সতর্ক হইব।" কিন্তু সতর্ক লেখক কোনবারেই হইতে পারেন নাই, তাঁহার রচনার এটা দোষও হইয়াছে, আবার গুণও হইয়াছে। নিজের সম্বন্ধে এবং বিষয় সম্বন্ধে কঠোর ভাবে সচেতন থাকিয়া যে লেখা, তাহা প্রায়ই সাহিত্যিক রচনা হয় না,—বলিবার আনন্দে আপন ভুলিয়া—বিষয় ভুলিয়া যে বলা, তাহাই মধুরতম বলা, তাহাই সত্যকারের রচনা-সাহিত্য। কি কথা বলিতে মনের অজ্ঞাতে কি কথা মনে পড়িয়া যায় —গত জীবনের সেই সব স্মৃতি—বর্তমান জীবনের গভীর প্রবণতাগুলি বার বার আসিয়া বর্ণনার ধারা ভাঙ্গিয়া দিয়া মাঝে মাঝে অনেক ফাঁক রাখিয়া যায়—এই ফাঁকগুলি ভরিয়া ওঠে লেখকের মনের দানে। পালামৌর বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে এই জাতীয় কত স্মৃতির টুকরা যে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে, তাহা একত্রে উদ্ধার করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন নাই; শুধু আর একটি মাত্র সুকুমার

স্মৃতি তুলিয়া দিতেছি। পালামৌবাসী কোলদিগের বিবাহ বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক বলিতেছেন,—

"কোলের নববধূ আমি কখন দেখি নাই। কুমারী এক রাত্রের মধ্যে নববধূ! দেখিতে আশ্চর্য্য! বাঙ্গালায় দুরন্ত ছুঁড়িরা ধূলাখেলা করিয়া বেড়াইতেছে, ভাইকে পিটাইতেছে, পরের গোরুকে গালি দিতেছে, পাড়ার ভালখাগীদের সঙ্গে কোঁদল করিতেছে, বিবাহের কথা উঠিলে ছুঁড়ি গালি দিয়া পালাইতেছে। তাহার পর একরাত্রে ভাবান্তর। বিবাহের পর দিন প্রাতে আর সে পূর্ব্বমত দুরন্ত ছুঁড়ি নাই। একরাত্রে তাহার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। আমি একটি এইরূপ নববধূ দেখিয়াছি। তাহার পরিচয় দিতে ইচ্ছা হয়।

"বিবাহের রাত্রি আমোদে গেল। পরদিন প্রাতে উঠিয়া নববধূ ছোট ভাইকে আদর করিল, নিকটে মা ছিলেন নববধূ মার মুখ প্রতি একবার চাহিল, মার চক্ষে জল আসিল, নববধূ মুখাবনত করিল, কাঁদিল না। তাহার পর ধীরে ধীরে এক নির্জ্জন স্থানে গিয়া দ্বারে মাথা রাখিয়া অন্যমনস্কে দাঁড়াইয়া শিশিরসিক্ত সামিয়ানার প্রতি চাহিয়া রহিল। সামিয়ানা হইতে টোপে টোপে উঠানে শিশির পড়িতেছে। সামিয়ানা হইতে উঠানের দিকে দৃষ্টি গেল, উঠানের এখানে সেখানে পূর্ব্বরাত্রের উচ্ছিষ্টপত্র পড়িয়া রহিয়াছে, রাত্রের কথা নববধূর মনে হইল, কত আলো! কত বাদ্য! কত লোক! কত কলরব! কত স্বপ্ন! এখন সেখানে ভাঙ্গা—ভাঁড়, ছেঁড়া পাতা! নববধূর সেই দিকে দৃষ্টি গেল।" [পালামৌ, ৫ম অংশ]

কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্রের রচনার ভিতরে বারংবার প্রসঙ্গচ্যুতি এবং সেই অবসরে বিবিধ টীকা-টিপ্পনী এবং বক্তৃতা সর্বত্র গুণের হয় নাই, অনেক স্থানে দোষের হইয়া উঠিয়াছে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য স্মরণযোগ্য। সঞ্জীবচন্দ্রের "প্রতিভার ঐশ্বর্য ছিল কিন্তু গৃহিণীপণা ছিল না।" পালামৌ রচনায় "সৌন্দর্য যথেষ্ট আছে, কিন্তু পড়িতে পড়িতে প্রতিপদে মনে হয় লেখক যথোচিত যত্ন সহকারে লেখেন নাই। ইহার রচনার মধ্যে অনেকটা পরিমাণে আলস্য ও অবহেলা জড়িত আছে, এবং তাহা রচয়িতারও অগোচর ছিল না।"

এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ আরও বলিয়াছেন,—"পালামৌ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত তিনি যে ছাঁদে লিখিয়াছেন, তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে আশপাশের নানা কথা আসিতে পারে —তাহার মধ্যেও নির্ব্বাচন এবং পরিমাণ সামঞ্জস্যের আবশ্যকতা আছে। যে

সকল কথা আসিবে তাহারা আপনি আসিয়া পড়িবে অথচ কথার স্রোতকে বাধা দিবে না। ঝরণা যখন চলে তখন যে পাথরগুলাকে স্রোতের মুখে ঠেলিয়া লইতে পারে তাহাকেই বহন করিয়া লয়, যাহাকে অবাধে লঙ্ঘন করিতে পারে তাহাকে নিমগ্ন করিয়া চলে, আর যে পাথরটা বহন বা লঙ্ঘন-যোগ্য নহে তাহাকে পাশ কাটাইয়া যায়; সঞ্জীববাবুর এই ভ্রমণ-কাহিনীর মধ্যে এমন অনেক বক্তৃতা আসিয়া পড়িয়াছে যাহা পাশ কাটাইবার যোগ্য, যাহাতে রসের ব্যাঘাত করিয়াছে এবং লেখকও অবশেষে বলিয়াছেন, "এখন এ সকল কচকচি যাক।" কিন্তু এই সকল কচকচিগুলিকে সযত্নে বর্জন করিবার উপযোগী সতর্ক উদ্যম তাঁহার স্বভাবতই ছিল না। যে কথা যেখানে আসিয়া পড়িয়াছে অনাবশ্যক হইলেও সে কথা সেই খানেই রহিয়া গিয়াছে।"

(আধুনিক সাহিত্য)

'পালামৌ' রচনাগুলির ভিতরে লেখক তাঁহার বহু অভিজ্ঞতালব্ধ প্রজ্ঞার কথা বলিয়াছেন কিন্তু বক্তব্যের ভিতরে এই প্রজ্ঞা কোথায়ও ভার হইয়া ওঠে নাই। বিশেষতঃ সকল প্রজ্ঞার সহিত মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে একটি সরস কমনীয় হাসি; ইহাকেই বলে 'সস্মিত প্রজ্ঞা'—"wisdom in a smiling mood"; আরও বৈশিষ্ট্য এই, এখানে এই প্রজ্ঞা এবং হাসি ইহার কোনটিই জোর করা নয়,—স্বতঃস্ফূর্ত। আমরা পূর্বে 'রসিকতা'র সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছিলাম, যথার্থ 'রসিকতা' আমাদের সমগ্র দেহমনে একটা সহজাত গুণরূপে ছড়াইয়া থাকে। 'পালামৌ'-এর সমস্ত রচনার ভিতরেই মিশিয়া আছে একটা সূক্ষ্ম 'সরসতা'—এ 'সরসতা' একান্তভাবেই লেখকের সহজাত গুণ। প্রতিবেশি-চরিত্র সম্বন্ধে মন্তব্য প্রসঙ্গে লেখক ঋষির ঋষিত্বের যে বিদগ্ধজনোচিত সংজ্ঞানির্দেশ করিয়াছেন বাঙালী পাঠককে তাহা স্মরণ করাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই। একশিলা পাহাড় সম্বন্ধে মন্তব্যটিও চমৎকার।

'পালামৌ' আত্মনিষ্ঠ রচনা হইলেও বিষয়বস্তু একেবারে অপ্রধান হইয়া যায় নাই। লেখকের রচনার ভিতর দিয়া আত্মনিষ্ঠা ও বিষয়নিষ্ঠা পরস্পরে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকিয়া পরস্পর পরস্পরের অনুপূরক হইয়া উঠিয়াছে। পালামৌ এমন কোন প্রসিদ্ধ দর্শনীয়স্থান নহে,—সে ছোটনাগপুরের একটি নগণ্য বন্য পার্বত্য প্রদেশ; একটা বন্যতা জড়ান রহিয়াছে তাহার সব কিছুর ভিতরে—ছোট ছোট পাহাড়গুলির ভিতরে,—মাঠে ঘাটে—বৃক্ষলতায়—পশুপাখীতে—সেখানকার সকল অধিবাসীর ভিতরেও। কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতির

এই অখ্যাত বন্য প্রদেশটি একটা জমাটবাঁধা কৌতূহলের উৎস হইয়া উঠিয়াছে এই বন্য প্রকৃতির সহিত লেখকের সহজাত অন্তরঙ্গতার ফলে। প্রকৃতির সহিত লেখক-মনের গভীর যোগের ফলে, পালামৌ তাহার সকল পার্বত্য দৃশ্য —পাখীর ডাক—পশুর বিচরণ—অসভ্য অশিক্ষিত মানুষের আদিম জীবন ধারা লইয়া যেন একটা অখণ্ডবস্তু হইয়া উঠিয়াছে। কালো কালো পাহাড়গুলি—কালো কালো মহিষগুলি—কালো কালো মানুষগুলি—সবই সেখানে এক হইয়া উঠিয়াছে,—একটা অখণ্ড বন্যপ্রকৃতির খণ্ড খণ্ড অংশ।

পালামৌর বর্ণনায় বন্য বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানুষের বন্য জীবনের সহিত লেখকের যে অন্তরঙ্গতা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার ভিতরে একদিকে যেমন দেখিতে পাই একটা ব্যাপক সামগ্রিক দৃষ্টি, অপরদিকে আবার দেখিতে পাই লেখকের রূপগ্রাহী আনুবীক্ষণিক দৃষ্টি। একদিকে যেমন লেখকের দৃষ্টি প্রত্যেকটি কোল বালক-বালিকা—প্রত্যেকটি তরুলতা—পশুপাখী মাঠঘাটের উপরে থামিয়া তাহার প্রত্যেকটির রূপ, গুণ, শব্দ-গন্ধকে পৃথক পৃথক করিয়া উপভোগ করিয়াছে, আবার কোথাও লেখক একটা ব্যাপক সামগ্রিক দৃষ্টি লইয়া ভাবস্থ হইয়াছেন। একদিকে যেমন দেখিতে পাই, পথিপার্শ্বে ক্ষুদ্র নাসিকাস্থ অঙ্গুরীবং অলঙ্কারের মধ্যে নর্মনিমজ্জনকারিণী পাহাড়ী বালিকা, আবার—"হঠাৎ একটি লতার প্রতি দৃষ্টি পড়িল, তাহার একটি ডালে অনেকদিনের পর চারি পাঁচটি ফুল ফুটিয়াছিল। লতা আহ্লাদে তাহা আর গোপন করিতে পারে নাই, যেন কাহাকে দেখাইবার জন্য ডালটি বাড়াইয়া দিয়াছিল।" তারপরে সেই 'রাধে মন্যুং পরিহর' স্বরের অনুকারী হরিয়াল পাখীটি; তারপরে—"প্রাঙ্গণের একপার্শ্বে ব্যাঘ্র নিরীহ ভাল মানুষের ন্যায় চোখ বুজিয়া আছে, মুখের নিকট সুন্দর নখর সংযুক্ত একটি থাবা দর্পণের ন্যায় ধরিয়া নিদ্রা যাইতেছে। বোধহয় নিদ্রার পূর্বে থাবাটি একবার চটিয়াছিল।" অন্যদিকে আবার দেখিতে পাই,—

"তাহার পর আরও দুই এক ক্রোশ অগ্রসর হইলে, তাম্রাভ অরণ্য চারিদিকে দেখা যাইতে লাগিল; কি পাহাড়, কি তলস্থ স্থান সমুদয় যেন মেষদেহের ন্যায় কুঞ্চিত লোমরাজিরদ্বারা সর্ব্বত্র সমাচ্ছাদিত বোধ হইতে লাগিল। শেষে আরও কতকদূর গেলে বন স্পষ্ট দেখা গেল। পাহাড়ের গায়ে, নিম্নে, সর্ব্বত্র জঙ্গল, কোথাও আর ছেদ নাই। কোথাও কর্ষিত ক্ষেত্র নাই, গ্রাম নাই, নদী নাই, পথ নাই কেবল বন—ঘন নিবিড় বন।"

আবার—

"এই পাহাড়ের ক্রোড় অতি নির্জ্জন, কোথাও ছোট জঙ্গল নাই সর্ব্বত্র ঘাস। অতি পরিষ্কার, তাহাও বাতাস আসিয়া নিত্য ঝাড়িয়া দেয়। মৌয়া গাছ তলায় বিস্তর।····· আমি সেই ছায়ায় বসিয়া "দুনিয়া" দেখিতাম। এই উচ্চস্থানে বসিলে পাঁচ সাত ক্রোশ পর্য্যন্ত দেখা যাইত। দূরে চারিদিকে পাহাড়ের পরিখা, যেন সেইখানে পৃথিবীর শেষ হইয়া গিয়াছে। সেই পরিখার নিম্নে গাঢ় ছায়া, অল্প অন্ধকার বলিলেও বলা যায়। তাহার পর জঙ্গল নামিয়া ক্রমে স্পষ্ট হইয়াছে। জঙ্গলের মধ্যে দুই একটি গ্রাম হইতে ধীরে ধীরে ধূম উঠিতেছে, কোন গ্রাম হইতে হয়ত বিষণ্ণভাবে মাদল বাজিতেছে, তাহার পরে আমার তাঁবু, যেন একটি শ্বেত কপোতী জঙ্গলের মধ্যে একাকী বসিয়া কি ভাবিতেছে। আমি অন্যমনস্কে এই সকল দেখিতাম, আর ভাবিতাম এই আমার "দুনিয়া"।"

পালামৌর লেখকের একটি তাজা কবিপ্রাণ ছিল; কিন্তু সেই কবি-ধর্ম্মের ভিতরে কোন অসঙ্গত উচ্ছ্বাসপ্রবণতা নাই। কোন ঘটনা বা দুঃখকে লইয়া কাব্য করিতে গিয়া তিনি তাহাকে তিক্ত করিয়া তোলেন নাই—এইখানে তাঁহার মাত্রাজ্ঞানের পরিচয়। অল্প আঁচড়ে মনে দাগ কাটিবার কৌশলটি লেখকের চমৎকার আয়ত্ত ছিল,—ঠিক সচেতন কৌশলও নহে,—ইহাই লেখকের সহজাত কবিধর্ম। লাতেহার পাহাড়ের বর্ণনায় দেখিতে পাই,—

"নিত্য অপরাহ্নে আমি লাতেহার পাহাড়ের ক্রোড়ে গিয়া বসিতাম, তাঁবুতে শত কার্য্য থাকিলেও আমি তাহা ফেলিয়া যাইতাম! চারিটা বাজিতে আমি অস্থির হইতাম। কেন কখনও ভাবিতাম না; পাহাড়ে কিছুই নূতন নাই; কাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, কোন গল্প হইবে না, তথাপি কেন আমায় সেখানে যাইতে হইত জানি না। এখন দেখি এ রোগ আমার একার নহে। যে সময়ে উঠানে ছায়া পড়ে, নিত্য সে সময় কুলবধূর মন মাতিয়া উঠে, জল আনিতে যাইবে; জলে যে যাইতে পাইল না সে অভাগিনী, সে গৃহে বসিয়া দেখে উঠানে ছায়া পড়িতেছে, আকাশে ছায়া পড়িতেছে, পৃথিবীর রং ফিরিতেছে, বাহির হইয়া যে তাহা দেখিতে পাইল না, তাহার কত দুঃখ। বোধহয় আমিও পৃথিবীর রং ফেরা দেখিতে যাইতাম। কিন্তু আর একটি আছে, সেই নির্জ্জন স্থানে মনকে একা পাইতাম, বালকের ন্যায় মনের সহিত ক্রীড়া করিতাম।" [পালামৌ, ৩ য় অংশ]

এখানে একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, কবিত্ব করার কোনও সচেতন চেষ্টা নাই,—অথচ কবি মনটি নিজেকে প্রকাশ করিয়াছে কি সহজভাবে! একটি শিশু-সুলভ সহজ ভাবই লেখকের লেখাকে স্থানে স্থানে অপূর্ব কবিত্ব দান করিয়াছে। সেই সংস্কারবিহীন সহজভাবের জন্যই পৃথিবীর রূপে লেখক শিশুর ন্যায়ই মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। এই শিশুসুলভ রূপমুগ্ধতা অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে বন্যপ্রকৃতিকে লইয়াও—বন্য মানুষের সহজ জীবনধারাকে লইয়াও! একটি জঙলা পাখীর রূপ সম্বন্ধে লেখক বলিতেছেন,—

"তাহার কি আশ্চর্য্যরূপ! সেই পক্ষিণীতে যে রূপরাশি দেখিয়াছিলাম, এই যুবতীতে ঠিক তাহাই দেখিলাম। আমি কখন কবির চক্ষে রূপ দেখি নাই, চিরকাল বালকের মত রূপ দেখিয়া থাকি, এই জন্য আমি যাহা দেখি তাহা অন্যকে বুঝাইতে পারি না। রূপ যে কি জিনিষ, রূপের আকার কি, শরীরের কোন্ কোন্ স্থানে তাহার বাসা, এ সকল বার্ত্তা আমাদের বঙ্গকবিরা বিশেষ জানেন, এই জন্য তাঁহারা অঙ্গ বাছিয়া বাছিয়া বর্ণনা করিতে পারেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি তাহা পারি না। তাহার কারণ আমি কখন অঙ্গ বাছিয়া রূপ তল্লাস করি নাই। আমি যে প্রকারে রূপ দেখি নির্লজ্জ হইয়া তাহা বলিতে পারি; একবার আমি দুই বৎসরের একটি শিশুকে গৃহে রাখিয়া বিদেশে গিয়াছিলাম, শিশুকে সর্ব্বদাই মনে হইত, তাহার ন্যায় রূপ আর কাহারও দেখিতে পাইতাম না, অনেক দিনের পর একটি ছাগশিশুতে সেই রূপরাশি দেখিয়া আহ্লাদে তাহাকে বুকে করিয়াছিলাম। আমার সেই চক্ষু! আমি রূপরাশি কি বুঝিব?" [৪র্থ অংশ]

পৃথিবীর সকল বস্তুতে সমভাবে রূপ দেখিবার এই সংস্কারবিহীন মনই লেখককে রূপবর্ণনায় একান্ত অকপট করিয়াছিল। এই অকপট সহজভাব এবং রূপ এবং রস-গ্রহণের সহজাত ক্ষমতা সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে কোল কন্যাগণের নৃত্যবর্ণনায়।—

"হাস্য উপহাস্য শেষ হইলে, নৃত্যের উদ্যোগ আরম্ভ হইল। যুবতী সকলে হাত ধরাধরি করিয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি রেখাবিন্যাস করিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে বড় চমৎকার হইল, সকলগুলিই সমউচ্চ, সকলগুলিই পাথুরে কাল; সকলেরই অনাবৃত দেহ; সকলের সেই অনাবৃত বক্ষে আরসির ধুকধুকি চন্দ্রকিরণে এক একবার জ্বলিয়া উঠিতেছে। আবার সকলের মাথায় বনপুষ্প, ওষ্ঠে হাসি।

সকলেই আহ্লাদে পরিপূর্ণ আহ্লাদে চঞ্চল, যেন তেজঃপুঞ্জ অশ্বের ন্যায় সকলেই দেহবেগ সংযম করিতেছে।

* * * * *

"যুবতীরা তালে তালে নাচিতেছে, তাহাদের মাথার বনফুল সেই সঙ্গে উঠিতেছে, নামিতেছে, আবার সেই ফুলের দুটি একটি ঝরিয়া তাদের স্কন্ধে পড়িতেছে। শীতকাল। নিকটে দুই তিন স্থানে হু হু করিয়া অগ্নি জ্বলিতেছে, অগ্নির আলোকে নর্ত্তকীদের বর্ণ আরও কাল দেখাইতেছে; তাহারা তালে তালে নাচিতেছে, নাচিতে নাচিতে ফুলের পাপড়ির ন্যায় সকলে এক একবার "চিতিয়া" পড়িতেছে; আকাশ হইতে চন্দ্র তাহা দেখিয়া হাসিতেছে, আর বটমূলের অন্ধকারে বসিয়া আমি হাসিতেছি।" [৪র্থ অংশ]

সঞ্জীবচন্দ্রের প্রকাশভঙ্গির ভিতরেও বহুস্থানে একটা দুর্লভ চমৎকারিত্ব আছে। অল্প বর্ণনায়,—দুই একটি রেখায় তিনি যে ছবি ফুটাইতেন তাহার ভিতরে বেশ একটি গূঢ় ব্যঞ্জনা থাকিত। বরাকর নদীর বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক বলিতেছেন,—"শেষে যুবতীরা হাসিতে হাসিতে দৌড়িয়া নদীতে নামিতেছে। তাহাদের ছুটাছুটিতে নদীর জল উচ্ছ্বসিত হইয়া কূলের উপর উঠিতেছে।" বন্য যুবতীদের উচ্ছ্বসিত যৌবনের লীলাচাঞ্চল্য এই একটিমাত্র পংক্তির বর্ণনায় ভাষা পাইয়াছে। এইরূপ সংক্ষিপ্ত ধ্বন্যাত্মক বর্ণনা প্রচুর রহিয়াছে। কোলগণের রূপ বর্ণনায় লেখক বলিয়াছেন,—"কিন্তু স্বদেশে কোল-মাত্রই রূপবান, অন্ততঃ আমার চক্ষে। বন্যরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।" তারপরে আমরা পূর্ব্বেই লেখকের তাঁবুর বর্ণনা দেখিয়াছি,—"জঙ্গলের মধ্যে দুই একটি গ্রাম হইতে ধীরে ধীরে ধূম উঠিতেছে, কোন গ্রাম হইতে হয়ত বিষণ্ণভাবে মাদল বাজিতেছে, তাহার পরে আমার তাঁবু, যেন একটি শ্বেত কপোতী জঙ্গলের মধ্যে একাকী বসিয়া কি ভাবিতেছে।" কোল যুবতীদের নৃত্যবর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক বলিয়াছেন,—"বৃদ্ধেরা ইঙ্গিত করিলে যুবাদের দলে মাদল বাজিল, অমনি যুবতীদের দেহ যেন শিহরিয়া উঠিল। যদি দেহের কোলাহল থাকে তবে যুবতীদের দেহে সেই কোলাহল পড়িয়া গেল, পরেই তাহারা নৃত্য আরম্ভ করিল।" নব-পরিণীতা বধূর একরাত্রের আশ্চর্য পরিবর্তনের কথা বলিতে গিয়া লেখক বলিতেছেন,—"নববধূর মুখশ্রী একরাত্রে একটু গম্ভীর হয়, অথচ তাহাতে একটু আহ্লাদের আভাসও থাকে। তদ্ব্যতীত যেন একটু সাবধান, একটু নম্র, একটু সঙ্কোচিত বলিয়া বোধ হয়। ঠিক যেন শেষ রাত্রের পদ্ম।"

উপরে উদ্ধৃত প্রত্যেকটি বর্ণনার ভিতরেই একটা নিজস্বভঙ্গি এবং আশ্চর্য নৈপুণ্য রহিয়াছে,—এই জন্যই কয়েকটি খুঁটিয়া দেখাইলাম।

সঞ্জীবচন্দ্র ব্যতীত আরও বহু লেখকের বহুবিধ রচনা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হইয়াছে। 'বঙ্গদর্শন' বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে শুধু আলঙ্কারিক অর্থে নহে —আক্ষরিক অর্থেই যুগান্তকারী। 'বঙ্গদর্শন' শুধু বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার বাহন নহে, সেই যুগেরই প্রতিভার বাহন ছিল। 'বঙ্গদর্শন' যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মত "সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনির্," এবং 'মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী-নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত কাব্য-নাটক-উপন্যাস, কত প্রবন্ধ, কত সমালোচনা, কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাত কলরবে মুখরিত করিয়া তুলিত। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।" 'বঙ্গদর্শনে'র মারফতে এই আষাঢ়-বর্ষণের ন্যায় অবিরল এবং প্রচুর লেখায় লেখায় বাঙলা রচনা-সাহিত্য-ক্ষেত্রেও নূতন শ্যামলিমা—নূতন ফল-পুষ্পের আবির্ভাব দেখা দিল। রচনা-সাহিত্যের দিক হইতে বিচার করিলে বঙ্কিমচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কোন ফাঁক নাই,— বাঙলা রচনা-সাহিত্যে যে কি করিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা একটু একটু করিয়া গড়িয়া উঠিতেছে তাহা বেশ স্পষ্ট করিয়াই বোঝা যায়।

'বঙ্গদর্শনে'র ভিতরে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা ব্যতীত অন্যান্য যত লেখকের রচনা বাহির হইয়াছে, তাহার ভিতরে যেমন দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সমাজ-শিক্ষা এবং সংস্কৃতিবিষয়ক বহু নিবন্ধ-প্রবন্ধ রহিয়াছে, সাহিত্য-সমালোচনা বিষয়ক বিবিধ প্রবন্ধ রহিয়াছে—তেমনই আবার গুরু-লঘু বিষয়ে বহু সাহিত্যিক রচনাও রহিয়াছে। রচনার সহিত লেখকের নাম না দেওয়া থাকাতে অবশ্য বহু রচনারই লেখকের নাম জানা যায় না। রচনাগুলি অধিকাংশই যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবে পরিপুষ্ট এ কথার আর উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

এই জাতীয় রচনার ভিতরে কতকগুলি রচনা আছে সেই যুগের বাঙালীর সামাজিক রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, শিক্ষা-সভ্যতা ও সাহিত্য সম্বন্ধে। এগুলি লিখিত একটি পরিহাসকুশল লঘুচালে,—একটা ব্যঙ্গের সুর সর্বত্রই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। লঘুচালে লিখিত বলিয়া এখানে ভাবিবার কথা কিছুই নাই এমন নহে,—এগুলি উদ্দেশ্যবিহীনও নহে। সব রচনার ভিতরেই নবাগত পাশ্চাত্ত্যের বাঁধভাঙা ধাক্কা সামলাইয়া জাতীয়

স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার একটা চেষ্টা রহিয়াছে। নমুনাস্বরূপে 'আমরা বড়লোক' ('বঙ্গদর্শন' ১২৭৯, বৈশাখ), 'জাতভিক্ষুক' (১২৮০, বৈশাখ) 'হরিহর বাবু' (১২৮২, শ্রাবণ), 'শ্রীশঙ্করাচার্য্য বঙ্গদেশী' কর্তৃক লিখিত 'বঙ্গীয় শঙ্করাচার্য্যের নালিশ' (১২৮৭, আষাঢ়), ও 'শঙ্করাচার্য্যের তিরস্কার' (১২৮৭, শ্রাবণ) প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। 'আমরা বড়লোক' নামক প্রবন্ধে লেখক তৎকালীন বাঙ্গালীর শুধু পোষাক পরিচ্ছদের বৈচিত্র্য এবং আড়ম্বরের দ্বারা 'বড়লোক' সাজিবার স্পৃহাকে ঠাট্টা করিয়াছেন। এই পোষাকের আড়ম্বরের ফলে কে যে বাঙালী, কে অবাঙালী,—বাঙালীর পোষাক-পরিচ্ছদের কি বৈশিষ্ট্য, তাহা কিছুই বুঝিবার উপায় ছিল না। 'জাতভিক্ষুক' রচনায় একটু লঘুহাস্যরস পরিবেশনের ভিতর দিয়া লেখক দেখাইয়াছেন, বাঙালী 'জাতভিক্ষুক',—সমাজের নিম্নতম স্তরের ভিখারী হইতে ঊর্ধ্বতম স্তরের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লোক—সবই ভিক্ষুক, ভিক্ষুকের ভিতরে প্রকারভেদ রহিয়াছে মাত্র। 'হরিহর বাবু' রচনায় 'রাশভারী' হরিহর বাবুর রাশভারিত্বের সমালোচনা-প্রসঙ্গে মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে লেখক মৃদুহাস্যে অনেক কথা বলিয়াছেন। 'শ্রীশঙ্করাচার্য্য বঙ্গদেশী' কমলাকান্ত চক্রবর্তীরই অনুজ,—সুতরাং তাহার রচনা 'কমলাকান্তের দপ্তরে'রই সমজাতীয়।

'বঙ্গদর্শনে' আর এক জাতীয় রচনা রহিয়াছে, যেখানে তুচ্ছ ক্ষুদ্র বিষয়কে অবলম্বন করিয়া একটা হাল্কা চালে অনেক কথা বলা হইয়াছে। যেমন 'রসিকতা' (১২৭৯, আষাঢ়) রচনাটিতে রসিকতার ভিতর দিয়াই রসিকতার স্বরূপ এবং প্রকার লইয়া উপভোগ্য আলোচনা হইয়াছে। আবার কতকগুলি রচনা আছে, যেখানে রসিকতার লঘুতা নহে,—চিন্তার সহিত হৃদয়াবেগের মিশ্রণে পাঠকের সহিত আত্মীয়তা আছে। যেমন 'উদ্দীপনা' (প্রথমাংশ, ১২৭৯, বৈশাখ), 'লজ্জা কেন করি' (১২৮২, কার্তিক), 'বাঙ্গলার পাঠক পড়ান ব্রত' (১২৮৭, মাঘ) প্রভৃতি। এই যুগের সব জাতীয় রচনা সম্বন্ধেই একটি কথা খুব স্পষ্ট হইয়া উঠে,—ইংরেজির 'ফ্যামিলিয়র এসেস্'-এর (Familiar Essays) রচনা-ধর্ম এই যুগের বাঙলা-রচনায় একেবারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, এবং পূর্বেই দেখিয়াছি, বাঙলা-সাহিত্যে এই রচনা-ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্কিমচন্দ্র। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত যত চিন্তাশীল স্বল্পায়তন রচনা রহিয়াছে (যেমন 'ঐক্য', ১২৭৯, মাঘ; 'শক্তিধর্ম্ম ও সাহস শিক্ষা,' ১২৮৪, শ্রাবণ; 'অলঙ্কার শাস্ত্র', ১২৮৮ বৈশাখ; 'অদৃষ্ট', ১২৮৯, শ্রাবণ প্রভৃতি)

তাহার কোনটাই অতি উর্ধ্ব হইতে নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ উপদেশ-বাণ বা বিদ্যালয়ের বেত্র-ফলক নহে; প্রত্যেক রচনার ভিতরেই লেখক নিজে অনেক কথা নিজের মতন করিয়া ভাবিয়াছেন, এবং সেই ভাবনার ভিতর দিয়া নিজে যেন উপলব্ধি করিয়াছেন যে, যে বিষয়ে তিনি আলোচনা করিতে চাহিতেছেন, সে বিষয়ে তাঁহার নিজের কিছু বলিবার আছে। এই জন্য চিন্তাপ্রধান রচনাগুলিও লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং চিন্তার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। অধিকন্তু লেখকগণ শুধু তাঁহাদের বক্তব্যের ভারটাই আমাদের স্কন্ধে চাপাইতে চাহিতেন না, ভারী বক্তব্যকেও সুন্দর করিয়া বলিবার একটা প্রবৃত্তি এবং প্রবণতা দেখা দিয়াছিল।

'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত আর এক রকমের রচনা ছিল যাহাকে আমরা কাব্যধর্মী লিরিক্ রচনা আখ্যা দিতে পারি। আমরা পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের এই জাতীয় রচনার উল্লেখ করিয়াছি। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত এই জাতীয় রচনার ভিতরে আমরা এখানে 'হৃদয় উদাস' (১২৮৭, শ্রাবণ—'যৌবনে সন্ন্যাসী' লিখিত) রচনাটির উল্লেখ করিতে পারি। 'হৃদয় উদাস' ভাব, ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির দিক হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের এই জাতীয় রচনার একান্ত সমধর্মী। মানুষের হৃদয় যে থাকিয়া থাকিয়া কখনও উদাস হইয়া যায়—তাহার মূলীভূত কারণ, সে তাহার মনের মানুষ পায় না। এই মনের মানুষের ভিতর দিয়া মানুষ নিরন্তর নিজেকে ছড়াইয়া দিয়া একটা গভীর মূল্যে আত্মোপলব্ধি করিতে চায়—সেই আত্মোপলব্ধি না হইলেই জীবন মূল্যহীন হইয়া ওঠে—হৃদয় উদাস হইয়া যায়। লেখক এই কথাগুলিই তাঁহার লীলায়িত কাব্যের ভাষায় রচনাটির ভিতরে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু রচনাটির ভাব কাব্যধর্মী এবং ভাষা আবেগময়ী হইলেও সস্তা উচ্ছ্বাসের বিরক্তিকর আতিশয্যে রচনা 'কাব্যিক' হইয়া ওঠে নাই—হৃদয়াবেগের সহিত একটা সুকুমার ভাবনার অনুরণন রচনাটিকে হৃদ্য করিয়া তুলিয়াছে।

'বঙ্গদর্শন', 'সাহিত্য', 'প্রচার' প্রভৃতি তৎকালে প্রচারিত সাময়িক পত্রগুলির একজন প্রসিদ্ধ লেখক ছিলেন চন্দ্রনাথ বসু। চন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের ভিতরে অনেক সময়ে মতামতের আলোচনা-সমালোচনা হইয়াছে, এই জন্য চন্দ্রনাথ বসু তৎকালে রবীন্দ্রনাথের প্রতিদ্বন্দ্বী না হইলেও প্রতিপক্ষ সাহিত্যিক বলিয়া সাহিত্য-সমাজে একটা কথা প্রচলিত আছে।

চন্দ্রনাথ বসুর তত্ত্বালোচনামূলক অনেক লেখা আছে,—সে সব আমাদের আলোচনার বাহিরে। তিনি 'পৃথিবীর সুখদুঃখ' নামে যে আত্মচরিত

লিখিয়াছেন, এবং যাহার ভিতরে লেখক 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি' ধরণের অনেক কথা বলিয়াছেন বলিয়া ভূমিকা করিয়াছেন তাহা আমাদের ভাল লাগে নাই। কিন্তু চন্দ্রনাথের এই সব লেখা ছাড়া কতগুলি রচনা রহিয়াছে যেগুলি মূলতঃ সাহিত্যিক রচনা। এই জাতীয় রচনার ভিতরে 'বঙ্গদর্শনে' (১২৮৮, ভাদ্র, আশ্বিন, ১২৮৯ বৈশাখ) প্রকাশিত 'ফুলের ভাষা' রচনাটির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

'ফুলের ভাষা' রচনাটির ভিতর দিয়া লেখক ফুলকে সৃষ্টির অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির মধুরতম প্রকাশ করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ফুল এখানে প্রতীক মাত্র—বিশ্বজীবনের বিকাশরহস্য ঘনীভূত রূপ গ্রহণ করিয়াছে একটি ফুলের ভিতরে। লেখকের কল্পনা যেমন পাঠকের কল্পনাকে ঈষৎ দোলা দিতে দিতে যায়, লেখকের ভাষাও তেমনি স্বচ্ছ গিরিনির্ঝরিণীর ন্যায় কলনিক্কণে প্রবহিতা। সমগ্র রচনার পশ্চাতে লেখকের বিশেষ একটি ভাবদৃষ্টি রহিয়াছে —সেই ভাবদৃষ্টির ব্যাপকতা এবং গভীরতা রচনাটিকে মনোহারিত্ব দান করিয়াছে। আরম্ভেই দেখিতে পাই—

"আকাশে নক্ষত্র ফোটে; পৃথিবীতে ফুল ফোটে। নক্ষত্র অন্ধকারের ভিতর দিয়া ফুল দেখিয়া বলে, তুই ফুটিস্ বলিয়া আমি ফুটি; ফুল অন্ধকারের ভিতর দিয়া নক্ষত্র দেখিয়া বলে, তুই ফুটিস্ বলিয়া আমি ফুটি। আকাশ বিশ্বের আধখানা; পৃথিবী বিশ্বের আর আধখানা। তাই বলি যখন আকাশে নক্ষত্র ফোটে আর পৃথিবীতে ফুল ফোটে, তখন আর আধাআধি ভাব থাকে না। তখন বিশ্বের উপরার্দ্ধ এবং বিশ্বের নিম্নার্দ্ধ মিশিয়া এক হইয়া যায়। ফুলের ডোরে উপর নীচ বাঁধা।"

নিম্নের পৃথিবী এবং ঊর্দ্ধের আকাশ জুড়িয়া একই প্রাণধর্মের লীলা— কোথাও কোন ছেদ নাই; সেই একই প্রাণধর্মের লীলা অসীম আকাশে নিজেকে যেমন প্রকাশ করে একটি নক্ষত্রের ভিতর দিয়া—মাটির পৃথিবীতে সে তেমনি নিজেকে প্রকাশ করে একটি ফুলের ভিতর দিয়া। এই সত্যটিকে এমন সুন্দর এবং সংহতভাবে বলিবার ক্ষমতা সে যুগে খুব সুলভ ছিল না।

প্রসঙ্গক্রমে লেখক বলিতেছেন,—মানুষ যেদিন ফুলকে প্রথম চিনিয়াছে সেই দিনই তাহার পশুসত্তার ভিতরে প্রথম মনুষ্যসত্তার স্ফুরণ,—কারণ, আদিম সৌন্দর্য-বোধের ভিতর দিয়াই মানুষ প্রথমে তাহার পশুসত্তার ঊর্দ্ধ্বে-নিবাসী মনুষ্যসত্তার প্রথম সন্ধান পাইয়াছিল।—

"ফুল, তুমি মানব-গুরু! মানুষে মানুষ আছে আর পশু আছে। মানুষের আকাঙ্ক্ষা, পশুত্বটুকু নষ্ট করিয়া মনুষ্যত্বটুকু প্রবল করে। সেই নিমিত্ত মানুষ পৃথিবীতে অদ্ভুত হইয়া অবধি আজ পর্য্যন্ত কত চেষ্টা করিয়াছে। কত ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছে, কত দর্শনের সৃষ্টি করিয়াছে, কত স্কুল, কলেজ, টোল করিয়াছে, কত দেশ ভ্রমণ করিয়াছে। কিন্তু এই প্রভূত চেষ্টার প্রথম কার্য্য—ফুল তোলা। যেদিন আদিম মনুষ্য আদিম পশুর ন্যায় ক্ষুধার জ্বালায় মহারণ্যে বিচরণ করিয়া পশুবধকরতঃ মধ্যাহ্নে বৃক্ষমূলে বসিয়া কাঁচা মাংস চিবাইয়া খাইয়া সহচর সিংহ ব্যাঘ্রের ন্যায় নিদ্রার দ্বারা ক্লান্ত দেহের শান্তি সম্পাদন করিয়া অপরাহ্নে অস্তাচলগামী সূর্য্যের মৃদুমধুর সুবর্ণজ্যোতিঃ দেখিয়া, কি জানি কেন, বিলম্বিত লতা হইতে একটি সুবর্ণজ্যোতিঃ পুষ্প ছিঁড়িয়া মাথার চুলে গুঁজিল, সেইদিন মনুষ্যের বিশাল ইতিহাসের সূত্রপাত হইল। সেই দিন জানা গেল যে মহারণ্যনিবাসী সহচর সিংহব্যাঘ্র অনন্তকাল মহারণ্যেই বাস করিবে, কিন্তু তাহাদের আদিম সহচর মনুষ্য মহারণ্য বিনষ্ট করিয়া মহা সম্পদ সৃষ্টি করিবে। সেই দিন জানা গেল যে সহচর সিংহব্যাঘ্রে কেবল পৃথিবী আছে, কিন্তু মনুষ্যে পৃথিবী এবং স্বর্গ দুইই আছে। সেই দিন জানা গেল যে সহচর সিংহব্যাঘ্র চিরকাল নতশিরে পৃথিবীতে বিচরণ করিবে, কিন্তু মনুষ্য অনন্ত আকাশ ভেদ করিয়া বিশ্বের ঊর্দ্ধতম প্রদেশে উঠিবে।"

আবার—

"মরুভূমিতে ফুল ফুটিয়া অপচয় হয় মাত্র! মিথ্যা কথা। অসার কথা। অগভীর আত্মার কথা। প্রশস্ত মরুভূমি জীবশূন্য, তৃণশূন্য—জ্বালাময়, অগ্নিময়—প্রকৃতির রুদ্র, বিকট, ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি! যেমন করিয়া দেখ, সে মূর্ত্তি হইতে কেবল অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে; রুদ্রভাব ফাটিয়া বাহির হইতেছে; কঠোরতা, নিষ্ঠুরতা প্রশ্বাসিত হইতেছে। কিন্তু ঐ দেখ ঐ ভয়ঙ্কর মরুভূমিতে একটি ফুল ফুটিয়াছে—ঐ কঠোর, কঠিন, নিষ্ঠুর রুদ্র মূর্ত্তিতে একটি অনির্ব্বচনীয় কোমলতা অঙ্কিত রহিয়াছে! প্রকৃতি ঐ কোমলতায় অনুপ্রাণিত! ঐ কোমলতা লইয়া প্রকৃতি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে, প্রকৃতি আপনাকে সার্থক মনে করিতেছে।"

এই ফুলের দিকে তাকাইয়াই লেখক একটি দিব্য ভাবদৃষ্টিতে নিখিল বিশ্বের অন্তর্নিহিত একপ্রাণতা—একতানতাকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন; অনুভব করিয়াছেন, তাহার হৃদয়ের স্পন্দন একটা গভীর ঐকতানে এই

নিখিল বিশ্বের প্রাণস্পন্দনের সহিতই অবিনাভাবে বিধৃত হইয়া আছে,—সেই অদ্বয় দৃষ্টিই লেখককে বিশ্বজীবনের সহিত নিবিড়ভাবে যুক্ত করিয়া দিয়াছিল।

"সুবিস্তীর্ণ কাননে সন্ধ্যা-সমীরণ মন্দ মন্দ বহিতেছে, গাছের পাতা অল্প অল্প নড়িতেছে। আকাশে নক্ষত্র মিট্‌মিট্‌ করিতেছে। দুই একখানা পাতলা শাদা মেঘ আস্তে আস্তে উড়িয়া যাইতেছে। সেই মেঘের ভিতর দিয়া একরাশি ছায়ারূপী জ্যোৎস্না একখানা আবেশময় আবরণে আকাশ, পৃথিবী, দিগদিগন্ত ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। কাননে অসংখ্য ফুল ফুটিয়াছে। শরীর আবেশময়, পৃথিবী আবেশময়। কি হইয়াছে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, বুঝিবার ক্ষমতাও নাই, ইচ্ছাও নাই। চক্ষে কিছু স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি না। যেন কি একখানা হইয়া গিয়াছি, যেন এই আবেশময় দৃশ্যে মিশিয়া গিয়াছি। এই একরকম হইয়া পড়িয়া আছি আর কত কি দেখিতেছি কত কি শুনিতেছি। শুনিতেছি, কানন, পৃথিবী, অনন্তশূন্য জুড়িয়া এক অপূর্ব্ব, অস্ফুট, সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি হইতেছে। সে সঙ্গীত তৃণ হইতে নির্গত হইতেছে, কত শত লতা হইতে নির্গত হইতেছে, কত ছোট ছোট কত বড় বড় গাছ হইতে নির্গত হইতেছে, কত সলিলরাশি হইতে, কত প্রস্তর কত পর্ব্বত হইতে নির্গত হইতেছে, ভূগর্ভ হইতে ঊর্দ্ধতম আকাশ হইতে নির্গত হইতেছে। যেন তৃণ, লতা, পাতা, গাছ, পাথর, পর্ব্বত, জল, জঙ্গল সকলে মাতিয়া একস্বরে একতানে গাহিতেছে—আজ আমরা সব এক হইয়াছি, আজ আমাদের মধ্যে ছোট বড় নাই, উচ্চ নীচ নাই, আজ আমরা বিরোধশূন্য, বিদ্বেষশূন্য, বিকারশূন্য, আজ আমরা চক্ষু পাইয়াছি, এক চক্ষে সকলে সকলকে এক-আত্মা দেখিতেছি, আজ আমরা প্রাণ পাইয়াছি, আজ আমরা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণে মিশিয়াছি।"

এই রচনা যে গদ্য লিরিক্ তাহা আর বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন করে না। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ হইতে একটু একটু করিয়া কি ভাবে যে রবীন্দ্র-প্রতিভার আবির্ভাব ঘটিতেছে বাঙলা রচনা-সাহিত্যের ইতিহাসে তাহার বেশ ক্রমস্তর পাওয়া যায়। এই রচনা রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কালের গদ্য লিরিকগুলির সমগোত্রীয় রচনা।

ভাব এবং ভাবনা—এই উভয়ের সঙ্গতিতে লিখিত রচনার ভিতরে চন্দ্রনাথের 'অনন্ত মুহূর্ত্ত' * রচনাটিও উল্লেখযোগ্য। "কালের গতি অবিরাম।

* 'প্রচারে' প্রথম প্রকাশিত, পরে 'ত্রিধারা' নামক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট।

কাল কেবল চলিতেছে। তবে কোথায় চলিতে আরম্ভ করিয়াছে কেহ জানে না, কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু সকলেই দেখে চলিতেছে—কেবলই চলিতেছে।” কিন্তু বিশ্বসৃষ্টি জুড়িয়া এই যে কালের অবিরাম আবর্ত চলিতেছে, সেই আবর্তকে রোধ করিয়া একটি পরম মুহূর্তের ভিতরে অনন্তকালকে বাঁধিয়া রাখিতে পারেন জগতের কবিগণ। মানুষের জীবনে এমন এক একটি মুহূর্ত আসে যখন সৌন্দর্য বা রসের নিবিড় আস্বাদনে মনের বৃত্তিনিচয় স্তব্ধ হইয়া যায়,—সেই তন্ময়তার ভিতরে শুধু চঞ্চল মনই যে অচল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে তাহা নহে, চঞ্চল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের দুর্বার আবর্তও যেন একটি মুহূর্তের ভিতরে স্তব্ধ হইয়া যায়,—মানুষের জীবনের এই দুর্লভ মুহূর্তটিই ‘অনন্ত মুহূর্ত’। এই অনন্ত মুহূর্তগুলিকে লইয়াই কবিগণ যুগে যুগে তাঁহাদের কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত, ইংরেজি ও বাঙলা সাহিত্য হইতে লেখক এই ‘অনন্ত মুহূর্তে’র দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। এই জাতীয় রচনা চন্দ্রনাথের আরও আছে। কিন্তু এই রচনাগুলি সম্বন্ধে, বিশেষ করিয়া ‘ফুলের ভাষা’ সম্বন্ধে মনে হয়, লেখক তাঁহার বক্তব্যকে আরও সংযত এবং সংহত করিয়া বলিলে বক্তব্য এবং রস উভয়ই আরও জমাট বাঁধিতে পারিত। স্থানে স্থানে রচনা একটু অতিভাষণে এবং অতিবর্ণনে তরলায়িত।

চন্দ্রনাথের চিন্তামূলক প্রবন্ধগুলির ভিতরে স্থানে স্থানে চিন্তার মৌলিকতার প্রমাণ মেলে। ‘সিদ্ধিদাতা গণেশ’ * রচনাটির ভিতরে এই জাতীয় মৌলিকতার পরিচয় রহিয়াছে। গণেশের পৌরাণিক মূর্তিটিকে লেখক বেশ যুগোচিত মানবীয় ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

‘বঙ্গদর্শনে’র আর একজন প্রসিদ্ধ লেখক ছিলেন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। ‘বঙ্গদর্শনে’ প্রকাশিত তাঁহার অনেকগুলি লেখা ‘নানা প্রবন্ধ’ নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ‘নানা প্রবন্ধে’র সব লেখাই প্রবন্ধ, সৃষ্টিমূলক রচনা নহে,—সুতরাং লেখাগুলির মূল্য মুখ্যতঃ তাহাদের প্রবন্ধগুণে। এই লেখাগুলির ভিতরে লেখকের শুধু পাণ্ডিত্যেরই প্রকাশ নাই—নিজস্ব চিন্তার প্রকাশ আছে,—আবার সেই পাণ্ডিত্য এবং নিজস্ব চিন্তাকে সুস্পষ্ট অথচ সুন্দর করিয়া সাহিত্যিক ভাষায় প্রকাশ করিবার ক্ষমতাও লেখকের ছিল। তাঁহার “দেবতত্ত্ব’ সম্বন্ধে আলোচনা একদিকে যেমন আমাদের নব নব কৌতূহল জাগ্রত করে, তেমনই আলোচনার ধারার ভিতরে একটা হেঁয়ালিহীন পরিচ্ছন্নতা

* ‘ত্রিধারা’, পৃঃ (৮৩—৮৭)।

আছে,—প্রকাশভঙ্গির ভিতরে অনাড়ম্বর সরলতা আছে। প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লেখকের মনে হয়ত একটা সহজাত পক্ষপাতিত্ব রহিয়াছে, কিন্তু সেই পক্ষপাতিত্বের ভিতরেও রহিয়াছে তথ্য-সমৃদ্ধ বুদ্ধির ওকালতি,—অহৈতুক উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য কম। সুপ্রণালীবদ্ধ উচ্ছ্বাসবিহীন আঁটসাঁট লেখাই রাজকৃষ্ণের প্রবন্ধগুলির বৈশিষ্ট্য। সাহিত্য, সমাজ, সভ্যতা ও নীতি সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলির ভিতরে লেখকের একটি চিকণ বিশ্লেষণ-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়,—এই বিশ্লেষণ-শক্তিই তাঁহার চিন্তাকে অনেক স্থানে মৌলিকতা দান করিয়াছে; তবে তিনি দেশবিদেশ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেনও অনেক।

ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বহু প্রবন্ধ নিবন্ধ লিখিয়া যাঁহারা এই যুগে যশস্বী হইয়াছেন তাঁহাদের ভিতরে যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, রামদাস সেন, পূর্ণচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'গঙ্গাধর শর্ম্মা ওরফে জটাধারীর রোজনামচা'ও প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য। ইহা ঠিক লেখকের আত্মচরিত নহে, নিজের জীবনস্মৃতির সহিত বহু সত্যমিথ্যা মিশাইয়া একজাতীয় রস-রচনা। রচনার অধিকাংশ স্থলেই তৎকালোচিত একটা বিদ্রূপ এবং পরিহাসের সুর বর্তমান,—তবে বর্ণনা করিতে করিতে মাঝে মাঝে লেখক বেশ গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছেন। মাঝে মাঝে একটু কবিত্বেরও আমেজ রহিয়াছে। বর্ণনা একঘেয়েমি দোষে অনেক স্থানে শ্রান্তিকর। সব রচনা জুড়িয়া তৎকালীন সমাজের একটা ছবি দিবার চেষ্টা রহিয়াছে।

এই যুগের রচনা-সাহিত্যের আলোচনায় চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় রচিত 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে'র কথাও একেবারে বিস্মৃত হওয়া উচিত হইবে না। জাতি বিচারে গ্রন্থখানিকে লিরিক্‌ধর্মী গদ্যকাব্য বলা যাইতে পারে। অনেক স্থলে উচ্ছ্বাসতারল্য এবং উক্তিবাহুল্য অবশ্য লেখকের শোকাভিভূত হৃদয়কে আমাদের নিকটে বাষ্পাকারে উপস্থাপিত করে, কিন্তু লেখক কোথাও যে গভীর হইয়া ওঠেন নাই, একথা বলা যায় না। ভাষার আবেগ এবং ভাবনার তরঙ্গাভিঘাত'মিলিয়া দোষে-গুণে রচনাটিকে একটি অভিনবত্ব দান করিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং তাঁহার প্রত্যক্ষ প্রভাবে পরিবর্ধিত অক্ষয়চন্দ্র সরকার এই যুগের একজন কৃতী রচনাকার ছিলেন। 'বঙ্গদর্শনে'র লেখকগণের ভিতরে তিনিই অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক ছিলেন। আশৈশব পিতা গঙ্গাচরণ সরকারের দ্বারা সাহিত্য-সাধনায়

প্রোৎসাহিত হইলেও * পরিণত বয়সে যে বঙ্কিমচন্দ্রকেই তিনি আদর্শ রাখিয়া চলিয়াছেন এ-কথার প্রমাণ তাঁহার বহু রচনার ভিতরেই স্পষ্ট। তাঁহার 'দুর্গোৎসব' সম্বন্ধীয় আলোচনায় † বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গামূর্তির নবপরিকল্পনার প্রভাব স্পষ্ট,—রচনা-ভঙ্গীতেও 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র 'আমার দুর্গোৎসবে'র প্রভাব রহিয়াছে। 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র ঢঙে অক্ষয়চন্দ্রও দু'একটি রচনা লিখিয়াছিলেন,—তন্মধ্যে 'চন্দ্রালোকে' রচনাটিকে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার নিজের দপ্তরগুলির ভিতরেই স্থান দিয়াছিলেন। 'বঙ্গদর্শন', 'সাধারণী' এবং 'নবজীবনে' অক্ষয়চন্দ্রের অনেক রচনা প্রকাশিত হয়। এই সব সাময়িক পত্রে লিখিত অক্ষয়চন্দ্রের অনেকগুলি ব্যঙ্গরচনা বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোক-রহস্য' এবং 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র ব্যঙ্গ-রচনাগুলি দ্বারা অনুপ্রাণিত। ‡

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার আওতায় বর্ধিত হইলেও অক্ষয়চন্দ্রকে 'পরগাছা' বলিয়া মনে করা একান্ত ভুল হইবে। বঙ্কিমধর্মী হইয়াও তিনি ব্যক্তিত্বে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত অভিন্ন নহেন,—তাঁহার স্বতন্ত্র মন আছে,—সে মনের প্রকাশেও স্থানে স্থানে একটা স্বধর্ম লক্ষিত হয়।

অক্ষয়চন্দ্রের রচনার বিষয়-বস্তুর ভিতরে বেশ একটা বৈচিত্র্য আছে। রচনার ভিতরে যেমন ভাবনা-মূলক রচনা আছে তেমনই ভাবমূলক রচনাও আছে; আবার অতি পরিচিত সাধারণ বস্তু বা ঘটনা লইয়া লঘুচালের রচনা, এবং তৎকালীন ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য সম্বন্ধে ব্যঙ্গরচনাও রহিয়াছে। অক্ষয়চন্দ্রের রচনাগুলি অনেক ক্ষেত্রে স্বল্পায়তন—, রচনাসাহিত্যের পক্ষে বেশ উপযোগী। কিন্তু তাঁহার ভাব-মূলক ও ভাবনা-মূলক রচনাগুলি প্রকৃতিতে একটু উচ্ছ্বাস-প্রধান, এই উচ্ছ্বাস-প্রাধান্য তাঁহার প্রকাশভঙ্গী এবং ভাষাকেও একটু উচ্ছ্বাস-প্রধান করিয়া তুলিয়াছে। এই কারণেই বোধ হয় তাঁহার রীতি স্থানে স্থানে একটু বেশী সংস্কৃতঘেঁষা এবং আড়ম্বরপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তবে ভাবনামূলক কতগুলি ছোট ছোট রচনা রহিয়াছে যেখানে ভাবনা, ভাব ও ভাষা একটা অনাড়ম্বর সাবলীল সঙ্গতি লাভ করিয়াছে।

---

* 'বঙ্গ-ভাষার লেখক' গ্রন্থে অক্ষয়চন্দ্র কর্তৃক লিখিত 'পিতাপুত্র' শীর্ষক বিবরণ দ্রষ্টব্য।

† 'মহাপূজা' নামে এই রচনাগুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

‡ নমুনা স্বরূপ অক্ষয়চন্দ্রের 'তুলনায় সমালোচনা', 'ভাই হাততালি', 'বিষম বাজার বা সম্মার্জ্জনী-মেলা', 'সিংহের উপাধি-বিতরণ' প্রভৃতি ব্যঙ্গ রচনাগুলি উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই রচনাগুলি অন্যান্য রচনার সহিত 'রূপক ও রহস্য' নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি—যে-কোন বিষয়কে অবলম্বন করিয়া আপন মনের ভাব ও ভাবনা মিশাইয়া খেয়াল-খুশীতে রচনা লিখিবার রীতিটি এযুগে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল ; অক্ষয়চন্দ্রের 'গগন-পটো' ('সাহিত্য-সাধনা'), 'ক্রোটনের কথা' ('রূপক ও রহস্য'), 'গ্রাবু' প্রভৃতি এই জাতীয় রচনা বেশ উল্লেখযোগ্য। 'লোকরহস্যে' প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ ব্যঙ্গরচনার ন্যায় অক্ষয়চন্দ্রের ব্যঙ্গাত্মক অনেক রচনাই 'সাংবাদিকতা'র ঊর্ধ্বে উঠিয়া 'সাহিত্য'-পদলাভের যোগ্য হইয়া ওঠে নাই। তা ছাড়া অক্ষয়চন্দ্রের ব্যঙ্গ-রচনার রীতি বঙ্কিমী রীতি,—এ বিষয়ে তিনি আর সুরও চড়াইতে পারেন নাই, কোন বৈচিত্র্যও সৃষ্টি করিতে পারেন নাই,—এক্ষেত্রে তাঁহার যশ তাই বঙ্কিমের যশ দ্বারাই আচ্ছন্ন রহিয়াছে। অক্ষয়চন্দ্রের 'তোমরা যদি আর্য্য হও, আমরা অনার্য্য' ('রূপক ও রহস্য') রচনাটি পরবর্তী কালের প্রথম চৌধুরী লিখিত 'তোমরা ও আমরা' শীর্ষক রচনাটির প্রাক্‌রূপ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

সপ্তম অধ্যায়

রবীন্দ্র-প্রভাবের পূর্ববর্তী অন্যান্য লেখকগণ

বঙ্কিমী আওতার বাহিরে এই যুগের একজন প্রসিদ্ধ লেখক ছিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪)। তাঁহার ধর্ম-জীবনের ঔজ্জ্বল্য তাঁহার সাহিত্যিক রূপকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, তাই আমাদের নিকটে আজ তাঁহার 'ব্রহ্মানন্দ' মূর্তিটি যত বড় হইয়া দেখা দেয়, তাঁহার সাহিত্যিক রচনাকার মূর্তি তত বড় হইয়া দেখা দেয় না। বস্তুতঃপক্ষেও কেশবচন্দ্রের কোন রচনাই ঠিক 'লেখা' নয়,—মূলতঃ তাহার সবই ধর্মোপদেশ; তাঁহা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'সুলভ-সমাচারে'ই এই সব উপদেশ বাহির হইত। তাঁহার কতগুলি বক্তৃতা ভক্তমণ্ডলী কর্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়া গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। * কেশবচন্দ্রের এই সব রচনা মূলতঃ ধর্ম ও উপদেশমূলক বক্তৃতা হইলেও এগুলির সাহিত্যিক মূল্য উপেক্ষণীয় নহে। কেশবচন্দ্র বক্তৃতা করিতেন তাঁহার অন্তরঙ্গ একটি বিশেষ গোষ্ঠীর ভিতরে,—সেখানে তিনি কোন শাস্ত্র অবলম্বনে পাণ্ডিত্যের বাঁধাবুলি আওড়াইতেন না, তাঁহার নিকট সর্বাপেক্ষা বড় শাস্ত্র ছিল তাঁহার 'জীবন-বেদ'; এক একদিনের বক্তৃতা বা উপদেশে তিনি এই 'জীবন-বেদ' হইতে সত্য আহরণ করিয়া অন্তরঙ্গদের সম্মুখে ধরিতেন; ভক্তমণ্ডলীর সম্মুখে এই 'জীবন-বেদে'র মৌখিক বিবৃতিই তাঁহার রচনা। জীবনে কেশবচন্দ্র সর্বদাই 'অগ্নিমন্ত্রে'র সাধক ছিলেন; তাঁহার রচনা একদিকে যেমন জীবন হইতে উৎসারিত হইয়া একটা অকপট স্বচ্ছতা লাভ করিয়াছিল, তেমনই অগ্নিমন্ত্রের সাধনায় একটা ওজোগুণ লাভ করিয়াছিল। তাঁহার 'অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা' শুধু বক্তব্যের দিক হইতে নহে, রচনার দিক হইতেও এই ওজোগুণের পরিচয় দেয়।—

"অগ্নির ভিতর জীবন থাকে বলিয়াই অগ্নিকে আমি বরণ করি, আলিঙ্গন করি ও অত্যন্ত ভাল বাসিয়া থাকি। উত্তাপ দেখিলেই ভরসা হয়, আনন্দ হয়, উৎসাহ হয়। যদি দেখি, অগ্নির তেজ কমিতেছে, বুঝি, এবার লোক

* 'কেশবচন্দ্র ও বঙ্গ-সাহিত্য' গ্রন্থে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় কেশবচন্দ্রের নানাবিধ রচনার একটি সার-সঙ্কলন দিয়াছেন।

জলে ঝাঁপ দিয়া মরিবে। যদি দেখি পাঁচ বৎসরের উৎসাহের পর কেহ ঠাণ্ডা হইতেছে, বুঝিয়া লই, এ লোক এবার পাপ করিতে চলিল, এবার মৃত্যু আসিয়া ইহার ঘাড় ধরিবে। এই জন্যই উত্তাপবিহীন অবস্থাকে অপবিত্র অবস্থা মনে করিতাম। যেদিন প্রাতঃকালে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত না হইয়া শয্যা হইতে উঠিতাম, মৃত্যু ভাবিতাম। নরক ও শীতলভাব, আমি একই মনে করিতাম। কি মনের চারিদিকে কি সামাজিক অবস্থার চারিদিকে, ততই উৎসাহের অগ্নি জালিয়া রাখিতাম।"

[জীবন বেদ, ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের সংস্করণ, পৃঃ ১৮]

কেশবচন্দ্রের বচনরীতিতে কোনও আড়ষ্টতা নাই—স্বতঃ-উৎসারিত গতির ক্ষিপ্রতা আছে। যে যুগের কথা বলিতেছি সে যুগে এজাতীয় অনাড়ম্বর স্বতঃউৎসারণ একটি বৈশিষ্ট্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কেশবচন্দ্রের প্রায় লেখা এবং বক্তৃতার ভিতর ধর্মের রস সাহিত্যরস হইতে ভারী হইয়া উঠিলেও স্থানে স্থানে উভয়ের ভিতরে সুসঙ্গতি স্থাপিত হইয়াছে। নমুনা স্বরূপে তাঁহার 'শারদীয় উৎসব' সম্বন্ধীয় রচনার উল্লেখ করা যাইতে পারে—

"শরৎ কেবল বারি বর্ষণ করে, তাহা নহে; কিন্তু ইহা আবার শস্য উৎপাদন করে। পৃথিবী সমস্ত বৎসর শস্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। জল যদি না হয়, ধান্য হয় না। এই জন্য সমস্ত পৃথিবীর লোক আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকে, আকাশে একখানি মেঘ দেখা দিল, আর কৃষকসমাজে কত আনন্দ! মেঘের মূল্য লক্ষ টাকা। আসল চাতক—দুঃখী পৃথিবী। উত্তপ্ত পৃথিবী আকাশের জলের প্রত্যাশায় রহিয়াছে। পুষ্করিণী, সরোবর অথবা নদী দ্বারা পৃথিবীর সেই আশা পূর্ণ হয় না। কেবল আকাশের সুপ্রসন্নতার উপরেই পৃথিবীর নির্ভর। কখন বৃষ্টি হইবে, কখন বৃষ্টি হইবে—কেবল ইহা প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। একবার বৃষ্টি হইল, আর সকলই আনন্দের সহিত বলিল, 'স্বর্গ হইতে লক্ষ টাকা আজ পৃথিবীতে পড়িল, আকাশ হইতে রাশি রাশি টাকা পড়িল।'……জল পাইয়া মরুভূমি সকল উর্ব্বর হইল এবং তাহাতে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হইল। ধান্যের মধ্যে লক্ষ্মীর সমাগম হয়, এইজন্যই এই সময় লক্ষ্মী পূজার নিমিত্ত স্থির হইয়াছে। আকাশ হইতে লক্ষ্মী জল হইয়া নামিলেন; পৃথিবী হইতে আবার তিনি ধান্য, শস্য এবং ফল-মূল হইয়া উঠিলেন।" *

কেশবচন্দ্রের সমসাময়িক এবং বাগ্মিতাগুণে সুপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক কৃষ্ণপ্রসন্ন

* 'কেশবচন্দ্র ও বঙ্গসাহিত্য'; ২২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সেন (১৮৪৯-১৯০২) মহাশয়ের নামও বিবিধ কারণে বাঙলা-রচনা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পাইবার যোগ্য। কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনও ছিলেন ধর্মপ্রচারক, তৎকালীন খ্রীষ্টান ধর্ম এবং ব্রাহ্মধর্মের আঘাত হইতে হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করিয়া স্বমাহাত্ম্যের তাহাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাই ছিল কৃষ্ণপ্রসন্নের আজীবন সাধনা। ধর্মপ্রচারক পরিব্রাজক হইয়া কৃষ্ণপ্রসন্ন বিভিন্ন স্থানে যে সকল বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার কিছু কিছু লিপিবদ্ধ হইয়াছে; 'পরিব্রাজকের বক্তৃতা' নামে তাহার কতগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। 'পরিব্রাজকের বক্তৃতা'গুলি তাহাদের লিপিবদ্ধরূপে বিবিধ সাহিত্যিক গুণে স্থানে স্থানে রচনা-সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে। ভাবের আবেগের সহিত ওজস্বিনী ভাষার তরঙ্গায়িত প্রবাহ মিলিয়া পাঠকচিত্তে বেশ একটা প্রেরণা দান করে। পরিব্রাজক শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত হইলেও এই ভাষণগুলির ভিতরে তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ বিশ্বাসগুলিকে লইয়া তাঁহার নিজের ধর্মজীবনটিই যেন পাঠকের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। বিশ্বাসের দৃঢ়তা এবং অকপটতা—প্রকাশভঙ্গির ওজস্বিতা এবং চারুতা এই ভাষণগুলিকে সাহিত্য হিসাবেও মূল্য দান করিয়াছে।

বাঙলা-সাহিত্যে নবীনচন্দ্র সেনের (১৮৪৬-১৯০৯) প্রসিদ্ধি কবিরূপে; কিন্তু তিনি গদ্যও একেবারে কম লেখেন নাই। তাঁহার 'আমার জীবন' এবং 'প্রবাসের পত্র' তাঁহার গদ্য রচনার নিদর্শন। নবীনচন্দ্র প্রকৃতিতেই কবি, সুতরাং 'আমার জীবনে'র শুধু 'জীবন' না হইয়া সাহিত্য হইয়া উঠিবারই সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু এই সুদীর্ঘ আত্মজীবনী স্থানে স্থানে সাহিত্যিক গুণ-সম্পন্ন হইয়া উঠিলেও সাহিত্যগুণ যেন কোথাও বেশীক্ষণ জমাট বাঁধিয়া উঠিতে পারে নাই। এখানে সেখানে সাহিত্যিক ঝলক্ উজ্জ্বল হইয়া উঠিলেও পর মুহূর্তেই সে যেন কেমন ম্লান হইয়া যায়—বর্ণনা কোনও একটি পরিমিত আয়তনের ভিতরে রস-নিবিড় হইয়া উঠিতে পারে নাই। তাঁহার কাব্যের ন্যায় তাঁহার গদ্য রচনায়ও বর্ণনার বাহুল্য এবং উচ্ছ্বাসের আধিক্য দোষ হইয়াছে। তবে নবীনচন্দ্রের গদ্যরীতি অনাড়ম্বর এবং সাবলীল। নবীনচন্দ্রের একটা সহজ পরিহাসকুশলতাও তাঁহার সুদীর্ঘ লেখাকে সরসতা দান করিয়াছে। 'প্রবাসের পত্র' সাহিত্যের নমুনা স্বরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে মাত্র,—তাহা উত্তম সাহিত্য হইয়া ওঠে নাই।

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লঘু এবং গুরু বিষয়ে কিছু কিছু রচনা

রহিয়াছে। রচনা হিসাবে এগুলি চলনসই মাত্র, কোন বিশেষ প্রতিভার বিকাশ নাই ইহার ভিতরে। নাট্যকার গিরিশচন্দ্রেরও বিবিধ বিষয়ে কতগুলি চিন্তাশীল প্রবন্ধ রহিয়াছে। 'বান্ধব'-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৪৩-১৯১১) মহাশয় 'বান্ধবে' প্রকাশিত তাঁহার রচনাবলীর জন্য তৎকালীন সাহিত্য-সমাজে যথেষ্ট শ্রদ্ধা এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। 'বান্ধবে' প্রকাশিত তাঁহার রচনাগুলি পরবর্তী কালে 'প্রভাত-চিন্তা', 'নিশীথ-চিন্তা', 'নিভৃত-চিন্তা' প্রভৃতি নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই রচনাগুলি প্রকাশিত হইবার সময়ে তৎকালীন সাহিত্যের সমঝদারগণ কেহ কেহ কালীপ্রসন্ন ঘোষকে বঙ্গের 'ইমার্‌সন্‌' আখ্যা দান করিয়াছিলেন,—কেহ কেহ বা তাঁহাকে বঙ্গের 'কার্‌লাইল্‌' আখ্যায় অভিহিত করিয়াছিলেন। নিরপেক্ষ বিচারে আজকাল আমরা কালীপ্রসন্নের লেখাগুলিকে 'ইমার্‌সন্‌' বা 'কার্‌লাইলে'র লেখার তুল্য মূল্য দান করিতে রাজী না; তবে একথা সত্য যে সাহিত্যক্ষেত্রে ইমার্‌সন্‌, কার্‌লাইল্‌ প্রভৃতি কালীপ্রসন্নের আদর্শ ছিলেন।

কালীপ্রসন্নের লেখাগুলি উচ্চদরের রচনা-সাহিত্য না হইলেও প্রকৃতিতে রচনাধর্মাশ্রিত। 'নিভৃত-চিন্তা', 'নিশীথ-চিন্তা' নামগুলি লক্ষণীয়। কর্মব্যস্ত জীবনের কোলাহলের আড়ালে নিভৃতে নিশীথে যে সকল কথা মনকে নানা ভাবে দোলা দিয়াছে, তাহাই লেখক এই রচনাগুলির আকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রচনাগুলির পশ্চাতে শুধু যে লেখকের চিন্তা রহিয়াছে তাহা নহে, লেখকের বহু অনুভূতিও রহিয়াছে, অনুভূতির উপরে প্রতিষ্ঠিত চিন্তা অবলম্বনেই এই রচনাগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে ও ইহার ভিতরে শুধু চিন্তা প্রকাশের চেষ্টাই একমাত্র বস্তু হইয়া ওঠে নাই,—রস-পরিবেশনের চেষ্টাও রহিয়াছে। কিন্তু অনেকখানি রচনাধর্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইলেও কালীপ্রসন্নের রচনা উচ্চ শ্রেণীর রচনা হইয়া উঠিতে পারে নাই। ইহার ভিতরে মনস্বিতাও রহিয়াছে, কবিত্বও রহিয়াছে, কিন্তু মনস্বিতারও ঔজ্জ্বল্য বা প্রাখর্য নাই, কবিত্বেরও গভীরতা নাই; উভয়ই যেন একটু সস্তাদরের হইয়া পড়িয়াছে। কালীপ্রসন্নের ভাব ও ভাষা উভয়ই সাড়ম্বর এবং ফেনায়িত; ফলে পড়িয়া যাইতে একরূপ মন্দ লাগে না—কিন্তু মনের ভিতরে তেমন কোন দাগ কাটে না। মাত্রাধিক উচ্ছ্বাসের তাপে বক্তব্যকে তরলায়িত এবং ফেনায়িত করিয়া প্রকাশ করা এই যুগের অনেক লেখকেরই একটা প্রকাণ্ড দোষ, কালীপ্রসন্নের রচনা এই দোষ হইতে মুক্ত নহে। ফলে তাঁহার

রচনার ফলশ্রুতি কোন নিবিড়তা লাভ করিতে পারে না। আরও স্বল্পায়তনের ভিতরে রচনাকে যদি সংহত করিয়া তুলিতে পারিতেন তবে কালীপ্রসন্ন যে মনস্বিতা ও কবিত্ব পরিবেশন করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা পাঠকচিত্তকে আরও নাড়া দিতে পারিত। তুলনায় আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, কালীপ্রসন্নের 'তারা আর ফুল' ('নিশীথ-চিন্তা') রচনাটি আর চন্দ্রনাথ বসুর পূর্বালোচিত 'ফুলের ভাষা' শীর্ষক রচনাটির প্রধান বক্তব্যের ভিতরে একটা মিল রহিয়াছে ; উভয়েই পৃথিবীর ফুল এবং আকাশের তারাকে সমধর্মী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। চন্দ্রনাথ বসুর রচনাটির ভিতরেও অযথা উচ্ছ্বাস রহিয়াছে—একটা ফেনানোর প্রবৃত্তি রহিয়াছে ; রচনাটিকে আরও সংক্ষিপ্ত এবং সংহত করিতে পারিলে রস আরও জমিতে পারিত ; কিন্তু এই সকল দোষ সত্ত্বেও 'ফুলের ভাষা' যতটুকু জমিয়া উঠিয়াছে, 'তারা আর ফুল' মোটেই সেরূপ জমে নাই ; 'তারা আর ফুল' এবং 'ফুলের ভাষা'র ভিতরকার ভাবনা ও ভাবের মধ্যেই একটা প্রকাণ্ড ভেদ রহিয়াছে। কালীপ্রসন্নের রচনা আমাদের চিত্তে রসমিশ্রভাবনার ঈষৎ উদ্বোধ করিয়াই থামিয়া যায়—তাহাকে আর বিশেষ কোন উচ্চগ্রামে পৌছাইয়া দিতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের সঙ্গে বাঙলা-সাহিত্যের সমস্ত দিক দিয়াই একটি নূতন যুগের সূচনা হইয়াছে। কিন্তু এই রবীন্দ্রযুগের সূচনা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আরম্ভ হইলেও এ যুগের পত্তন হইগাছে বিংশ শতাব্দীতে। রবীন্দ্রনাথ যত কাব্য-কবিতা, গান, নাটক, উপন্যাস ও রচনা লিখিয়াছেন তাহা সে যুগে সকল সাহিত্যিকেরই সচকিত দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেও রবীন্দ্র-প্রতিভার একাধিপত্য তখন পর্যন্তও স্বীকৃত হয় নাই ; সুতরাং তৎকালীন সাহিত্য-সমাজ রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাদ্বারা বিশেষরূপে প্রভাবান্বিত হয় নাই। বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এবং এই সময় হইতে বাঙলা-সাহিত্যও সমস্তদিকেই রবীন্দ্র-প্রতিভার আওতায় গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। রবীন্দ্র-প্রতিভাকে মুখ্যতঃ কেন্দ্র করিয়া যে যুগটি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকেই আমরা বিশেষ করিয়া রবীন্দ্র-যুগ নামে অভিহিত করিব। এই কারণেই দেখিতে পাই, রবীন্দ্রনাথের সমবয়সী এবং অল্পবিস্তর বয়োজ্যেষ্ঠ বা বয়ঃকনিষ্ঠ যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের সমকালে রচনা লিখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ঠিক রবীন্দ্র-যুগের লোক নন ; রবীন্দ্রপূর্ব যুগের ধারাটিই ক্রমাভিব্যক্তি-প্রথায় ইহাদের ভিতর

বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের রচনা-সাহিত্য আলোচনার পূর্বে বাঙলা-সাহিত্যের এই জাতীয় রচনাকারগণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করি। নিম্নে আলোচিত লেখকগণ সকলেই খুব সার্থক রচনাকার না হইলেও তাঁহাদের সম্মিলিত বহুবিচিত্র দানে বাঙলার রচনা-সাহিত্য যে নানাভাবে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭—১৯১৯) সাহিত্যিক রচনাকার না হইলেও সুলেখক ছিলেন। তাঁহার 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' এবং 'আত্মচরিত' বহুস্থানে সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে। শৈশব-স্মৃতি ও বাল্যস্মৃতি বর্ণনায় শিবনাথ তাঁহার মন-খোলা ঋজু ভঙ্গিতে এবং নির্মল রসিকতায় পাঠকের অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর দার্শনিক প্রবন্ধকার রূপেই খ্যাত; কিন্তু তাঁহার কিছু কিছু লেখা সাহিত্যিক রচনা হইয়া উঠিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রনাথের তৎকালীন সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে কিছু কিছু রচনা আছে। এই রচনাগুলিতে দ্বিজেন্দ্রনাথ স্থানে স্থানে এমন সহজ সরল রসিক পুরুষ হইয়া আমাদের এত কাছাকাছি আসিয়া পৌছিয়াছেন যে অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য তাঁহার আজীবন দার্শনিক রূপটি ভুলিয়া যাইতে হয়। ইহার ভিতরে রচনভঙ্গিটি অনেকস্থানে ঘনিষ্ঠ-বচনভঙ্গি হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই পরিহাসকুশলতা এবং ঘনিষ্ঠতার ভিতরেও দ্বিজেন্দ্রনাথের যুক্তি-তর্ক-আলোচনার নৈয়ায়িক পরিচ্ছন্ন পন্থার ব্যত্যয় ঘটে নাই। মূলতঃ দ্বিজেন্দ্রনাথের লেখাগুলি প্রবন্ধ, কিন্তু এই জাতীয় প্রবন্ধগুলিই নানা স্থানে রচনাগুণান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। 'সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা' * প্রবন্ধটির আরম্ভটি দেখিলেই এইজাতীয় প্রবন্ধের প্রকৃতি খানিকটা বোঝা যাইবে।

"আমি অদ্য একটি অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যে ক্ষুদ্র প্রবন্ধখানি হস্তে ,করিয়া এখানে আমি আজ আপনাদের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছি, তাহার নাম "সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা।" একেতো চিকিৎসা মাত্রই অন্ধকারে ঢেলা নিক্ষেপ; তাহাতে আবার কবিরাজি চিকিৎসা—যাহার সহিত উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান-রশ্মির জন্মেও দেখা-সাক্ষাৎ নাই! আবার সামাজিক রোগের চিকিৎসা—যাহার গহন অরণ্যে মহামহা বিজ্ঞানবিৎ

* দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রকাশিত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রণীত 'প্রবন্ধমালা' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

পণ্ডিতেরা অন্ধকারে দিশাহারা হইয়া যা'ন! একে চিকিৎসা—তাহাতে কবিরাজি চিকিৎসা—তাহাতে আবার সামাজিক চিকিৎসা! একে রজনী দ্বিপ্রহর—তিথি তায় অমাবস্যা—ঋতু তায় মেঘাচ্ছন্ন বর্ষা! কিন্তু হইলে হইবে কি—আমি এখন মাঝ-গঙ্গায় উপস্থিত! আমা হইতে এ-পারও যত দূর, ও-পারও তত দূর! এখন আমার পক্ষে এগোনও যা—পেছোনোও তা; বিপদ দুয়েতেই সমান! .এসময়ে পিছোনো লাভে হইতে কেবল কলঙ্কের ভাগী হওয়া!"

'সোনার কাটি রূপার কাটি' প্রবন্ধটির রীতিও সাহিত্যিক রচনারীতি। ইহার আরম্ভটির ভিতরেও একটি অতিপরিচিত ঘরোয়া ভাব আছে।—

"আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, অদ্য এখানে আমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তিও উপস্থিত নাই, যিনি তাঁহার মুখমণ্ডলের আদিম নিষ্কলঙ্ক অবস্থায়, শীতকালের রাত্রে হিহি করিয়া লেপ মুড়ি-সুড়ি দিয়া বা বর্ষারাত্রের সুধীর ধারায় যখন ভেকের কোলাহল মুহুর্মুহু জাগিয়া উঠে তখন ঘরের এক নিভৃত কোণে জড়-সড় হইয়া, অথবা বৈশাখের ফুরফুরে সন্ধ্যা-সমীরণের সহিত ফিন্‌ফিনে উড়ানীর সখ্য-বেগ সম্বরণপূর্ব্বক ছাতে মাদুরের উপরে অর্দ্ধ-উপবিষ্ট বা অর্দ্ধ-শয়ান হইয়া, দিদিমা মা কাকীমা জেঠাইমা পিসিমা বা মানুষকারিণী ধাত্রীর মুখের পানে নয়ন-মন ঘণ্টা-দুয়ের মত গচ্ছিত রাখিয়া, সোনার কাটি রূপার কাটির গল্পের মাঝে মাঝে হুঁ না দিয়াছেন, কিম্বা সেই উপন্যাসের পৃষ্ঠে "তার পর তার পর" শব্দের চাবুক কখনো বা মৃদুভাবে কখনো বা সজোরে প্রয়োগ না করিয়াছেন।

সাহসে ভর করিয়া তো এতগুলা কথা বলিয়া ফেলিলাম, কিন্তু তবুও আমার মনোমধ্যে নানাপ্রকার কিন্তু হইতেছে।"......

রবীন্দ্রনাথের অন্যতম অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অনুবাদক—বিশেষতঃ সংস্কৃত নাটকের অনুবাদক হিসাবেই বাঙলা-সাহিত্যে সুপরিচিত; তিনি নানাবিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধও কিছু কিছু লিখিয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রমণকাহিনীগুলি নানাস্থানে সাহিত্যের মর্যাদা লাভের অধিকারী হইয়াছে। বর্ণনাগুলি স্থানে স্থানে ছবির মতন ফুটিয়াছে, রচনা-রীতিও সাবলীল।

স্বামী বিবেকানন্দের (১৮৬২—১৯০২) লেখাগুলির* মূল্য আমাদের চোখে

* স্বামিজীর নামে প্রচলিত বাঙলা গ্রন্থগুলি অনেকই তাঁহার ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ; দু'একখানি মাত্র তাঁহার নিজের লেখা।

পড়ে না। কিন্তু লেখার ভিতর দিয়া লেখকের আন্তরিক স্পর্শ তাঁহার সমস্ত লেখাকে একটা নিজস্ব মাহাত্ম্য দান করিয়াছে। বিবেকানন্দের ভিতরে ছিল যে চরমশ্রেয়োবোধে প্রতিষ্ঠিত কর্মচঞ্চল সন্ন্যাসী, যে মহানুভব মানবপ্রেমিক—যে মিথ্যাচারবিরোধী সংস্কারক তাঁহার লেখার ভিতরে তাহার জীবন্ত পরিচয় আছে। কথা বলা এবং লেখার বিরোধটাকে স্বামিজী অনেক স্থানে আশ্চর্য রকম মিটাইয়া লইয়াছেন, কথ্যভাষা এবং কথ্যরীতির উপরে তাঁহার একটা বিশেষ দখল ছিল; অন্তরক্ত গোষ্ঠীর ভিতরে তিনি যেমন করিয়া অনুপ্রাণিত-ভাবে অনর্গল কথা বলিয়া যাইতেন,—তেমন করিয়াই তিনি অনায়াসে লিখিয়া যাইতে পারিতেন। সাহিত্যে তিনি সর্বদাই কথ্যভাষা ও কথ্যরীতির পক্ষপাতী ছিলেন, কায়ক্লেশে ভাষাকে 'সাধু' করিয়া সাজাইবার তিনি মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না,—কথ্যভাষা ও রীতিকেই তিনি এমন করিয়া ভাঙ্গিয়া-টিপিয়া গড়িয়া লইতে চাহিয়াছিলেন যেন সে সবজাতীয় মনোভাব প্রকাশেরই উপযোগী হয়। * এই বিশিষ্ট ভঙ্গি গ্রহণ করার ফলে বিবেকানন্দের লেখার ভিতর দিয়া তাঁহাকে স্থানে স্থানে স্পষ্ট কথা বলিতে শোনা যায়। ভাষার উপরে অসাধারণ দখল না থাকিলে এই রীতিটিকে এইভাবে জমাইয়া তোলা সহজ হইত না।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় তাঁহার নানাবিধ প্রবন্ধদ্বারা বাঙলা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিজ্ঞান ইহার সকল বিষয়েই তাঁহার কিছু কিছু আলোচনা আছে। তবে মুখ্যতঃ তিনি প্রবন্ধকার। এই লেখাগুলির ভিতরে প্রবন্ধের গুণ—অর্থাৎ তথ্য, তত্ত্ব, বিচার-বিশ্লেষণ, চিন্তাশীলতা এবং সমস্ত উপাদানের সুসঙ্গত সমাবেশ—প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে, কিন্তু তদতিরিক্ত একটা সাহিত্যিক গুণও রহিয়াছে। অবশ্য কতকগুলি প্রবন্ধ আছে যেখানে প্রতিপাদ্য কথাগুলিই

---

* "স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই. তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হ'তে পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার ক'রে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সে দিকে ফেরে, তেমন কোন তৈয়ারি ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে—যেন সাফ ইস্পাৎ, মুচ্‌ড়ে মুচ্‌ড়ে যা' ইচ্ছে কর—আবার যে-কে-সেই, একচোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা, সংস্কৃতের গদাই-লস্করি চাল—ঐ একচাল—নকল ক'রে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে।"—ভাববার কথা।

আসল, এবং দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি অধিকাংশই এই জাতীয়; কিন্তু শিক্ষা, সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য এবং জীবনচরিত বিষয়ক রামেন্দ্রসুন্দরের যে লেখাগুলি আছে তাহার সাহিত্যিক রচনাগুণও প্রশংসনীয়। রামেন্দ্রসুন্দরের এই জাতীয় তথ্যবহুল চিন্তাশীল প্রবন্ধগুলির ভিতরেও আমরা সর্বদাই একটা জিনিস লক্ষ্য করিতে পারি যে, ধারী ভারী জিনিসকেও তিনি অনায়াসে সুন্দর করিয়া উপস্থাপিত করিতে পারিতেন। রামেন্দ্রসুন্দর বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন-আলোচনা প্রসঙ্গে নিজেই একস্থানে বলিয়াছেন,—"সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিই কাব্যের প্রাণ। কেবল নীতিশাস্ত্র কেন, যদি কেহ দর্শনশাস্ত্র বা রসায়নশাস্ত্রকেই নবেলের বিষয় করিতে চাহেন, তাহাতে আপত্তি করিব না। কিন্তু বিষয়টি যদি সুন্দর না হয়, তাহা হইলে তাহা কাব্য হয় না।

"সৌন্দর্য্যেরও প্রভারভেদ আছে; গাছপালার ছবি সুন্দর হইতে পারে, গুপ্তকথার হরিদাসও সুন্দর হইতে পারেন, কিন্তু মানবজীবনের ও জগৎ-সংসারের গোড়ার কথাগুলি যিনি সুন্দর করিয়া দেখাইতে পারেন, তিনিই প্রথমশ্রেণীর কবি। গোড়ার কথা দেখাইলেই কবি হয় না; সেটা দার্শনিকের ও বৈজ্ঞানিকের ও ধর্ম্মতত্ত্ববিদের কাজ, কিন্তু তাহা সুন্দর করিয়া দেখাইতে পারিলেই কবি হয়।"

ইহা হইতেই বুঝিতে পারি যে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক লেখা এবং সাহিত্যিক সৃষ্টির মৌলিক প্রভেদ সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর স্পষ্ট সচেতন ছিলেন। সাহিত্যিকগুণ সম্বন্ধে এই স্পষ্ট সচেতনতার জন্যই রামেন্দ্রসুন্দরের দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলির ভিতরেও সাহিত্যিকগুণ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তথ্যবহুল দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলির সহিত রামেন্দ্রসুন্দর যতটা সম্ভব নিজেকে মিলাইয়া লইতেন; ফলে তাঁহার বলাটা অনেক সময়ই হইত নিজের মতন করিয়া বলা। তাহাতে বিষয়বস্তুর গৌরবের কোথাও লাঘব হইয়াছে একথা মনে হয় না, বরঞ্চ প্রবন্ধ সাহিত্যগুণের আমেজে আস্বাদ্য হইয়া উঠিয়াছে। 'প্রলয়' সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া লেখক বলিতেছেন,—

"বাল্যকালে একদিন পিতামহীর নিকট শুনিতে পাই, পৃথিবী এক সময়ে উল্‌টিয়া যাইবে। সেদিন ভাল নিদ্রা হইয়াছিল কি না স্মরণ নাই। মনের ভিতর প্রবল বিভীষিকার সঞ্চার হইয়াছিল, এইটুকু স্মরণ আছে। পরদিন পাঠশালায় একটি প্রবীণতর বন্ধু আশ্বাস দেন, পৃথিবী উল্‌টাইবে সন্দেহ নাই; তবে এখনও তাহাতে লক্ষ বৎসর বিলম্ব আছে। এই আশ্বাসবাণী শুনিয়া

পৃথিবীর ভবিষ্যৎ উল্‌টান অপেক্ষা পণ্ডিত মহাশয়ের বর্ত্তমান সামীপ্য অধিক উদ্বেগের কারণ নির্দ্ধারিত করিয়াছিলাম।

"সম্প্রতি বৈজ্ঞানিকগণ প্রলয়তত্ত্ব সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনা ও গবেষণা করিয়াছেন। ফলে পিতামহী ঠাকুরাণীর উক্তির সহিত বন্ধুর আশ্বাসবাণী যোগ করিলে যে কয়টা কথা হয়, তাহার অধিক কথা বিজ্ঞানশাস্ত্রও কিছু বলে না। প্রলয় একদিন ঘটিবে সন্দেহ নাই; তবে এখনও বিলম্ব আছে।"

এই আরম্ভের ভিতরেই এমন একটা আবেষ্টনী রচিত হইয়াছে যাহার মধ্যে একটা ব্যক্তি-স্পর্শ আছে। ইহা একজন বিশেষ মানুষের বিশেষ করিয়া কথা বলা। এই সব আলোচনার ভিতরে স্থানে স্থানে ঘরোয়া ভাবে কথা বলিবার ভঙ্গিরও একটা আভাস আছে। 'পৃথিবীর বয়স' নিরূপণ করিতে গিয়া লেখক বলিতেছেন,—

"জননী বসুন্ধরার বয়স নিরূপণ করিতে গিয়া মোটের উপর আন্দাজে নির্ভর করিতে হয়। কেন না জননী ভূমিষ্ঠ হইবার সময় তাঁহার পুত্র কন্যার মধ্যে কাহারও উপস্থিতির সম্ভাবনা ছিল না, সেইজন্য জন্মকাল নির্ণয়োপযোগী কোষ্ঠীর একান্ত অভাব। তথাপি যে জন্মকাল নির্দ্ধারণ একেবারে অসম্ভব, তাহা স্বীকার করিয়া আপন অক্ষমতা প্রদর্শনে বড়ই লজ্জাবোধ হয়। পক্ককেশের প্রাচুর্য্য ও লোল চর্ম্মের পরিমাণের সহিত ভগ্নাবশিষ্ট দন্তের সংখ্যা মিলাইলে অতি বড় প্রাচীনের ও বয়ঃক্রম অনেক সময় নির্ণীত হইয়া থাকে। অতএব এই প্রচলিত সাধারণ নিয়ম অবলম্বন করিয়া প্রাচীনা জননীর বয়স নিরূপণ করিতে গেলে নিতান্ত বাতুলতা না হইতে পারে।"

রামেন্দ্রসুন্দরের রচনার আর একটি বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করিতে পারি। দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক হইলেও তিনি 'অ্যাবষ্ট্রাক্ট' কথা খুব বেশী বলিতেন না; নানাভাবে দৃষ্টান্ত এবং উপমার সাহায্যে চিন্তাগুলিকে সর্বদা মূর্ত করিবার চেষ্টা করিতেন। রবীন্দ্রনাথ এই রীতির চরম উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন, কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের ভিতরেও এই রীতির বেশ একটা পরিণতি দেখিতে পাই। এই রীতিটির ভিতরেই একটা মৌলিক সাহিত্যিক মনের পরিচয় রহিয়াছে। এই দৃষ্টান্ত এবং উপমা প্রয়োগের ভিতরেও রামেন্দ্রসুন্দরের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল; এই দৃষ্টান্ত এবং উপমা তিনি প্রায়শঃই গ্রহণ করিতেন প্রাচীন ভারতীয় নানাবিধ শাস্ত্র ও সাহিত্য হইতে; ফলে তাঁহার লেখার বিষয়বস্তুতেই শুধু নয়, লেখার রীতিতেও একটি ভারতীয়তার গন্ধ ছিল। রামেন্দ্রসুন্দরের

লেখা পড়িলে বেশ বোঝা যাইত, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সহিত তাঁহার একটি নিবিড় পরিচয় ছিল এবং সেই নিবিড় পরিচয় তাঁহার মনে গভীর শ্রদ্ধা জাগ্রত রাখিয়াছিল। তাঁহার রচনার ভিতরে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের ন্যায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অনেক তুলনামূলক আলোচনা দেখা যায়। এক্ষেত্রে তিনিও বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের ন্যায় পরস্পরের আদান-প্রদানের পক্ষপাতী থাকিলেও তাঁহার শ্রদ্ধা ও অনুরাগের আধিক্য ছিল ভারতীয়তার প্রতিই।

আমরা রচনা-সাহিত্যের লক্ষণ আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়াছি যে রচনার ভিতরে একটি সৃষ্টিমূলক উপাদান থাকে। রামেন্দ্রসুন্দরের লিখিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবন-চরিতের ভিতরে এই জাতীয় একটি সৃষ্টির উপাদান রহিয়াছে। এখানে শুধু বিদ্যাসাগরের জীবন সম্বন্ধে কতগুলি তথ্য সন্নিবিষ্ট হয় নাই; সমস্ত সংবাদ ও তথ্যকে অবলম্বন করিয়া লেখক একটি সামগ্রিক দৃষ্টিতে বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিপুরুষকে তাঁহার মনের ভিতরে একটা বিশেষরূপে সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহার রচনার ভিতরে বিদ্যাসাগরের সেই রূপটিই প্রকাশিত হইয়াছে। সাহিত্য সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের আলোচনার ভিতরে মৌলিকতার পরিচয় রহিয়াছে। সাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁহার নিজস্ব চিন্তা ছিল,—সেই নিজস্ব চিন্তার ভিতরে যেমন অন্তর্দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা রহিয়াছে তেমনই রসজ্ঞজনোচিত সাঙ্ঘটিক বা সামগ্রিক (synthetic) দৃষ্টির পরিচয় রহিয়াছে। তাঁহার 'মহাকাব্যের লক্ষণ' সম্বন্ধে আলোচনা বাঙলা-সাহিত্যের পাঠক মহলে অতি পরিচিত।

রামেন্দ্রসুন্দরের রচনার আর একটি বৈশিষ্ট্য তাঁহার বক্রোক্তি, যাহা তাঁহার সকল রচনাকেই একটা সরসতা এবং চারুতা দান করিয়াছে। এই বক্রোক্তির ভিতরে বহুস্থানে একটা বিদ্রূপাত্মক শাণিত হাস্য ঈষৎ ঝলকে বক্তব্যটিকে উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছে। তরল কথাকে সংস্কৃতবহুল গুরুগম্ভীর ভাষায় প্রকাশ করার ভিতরে একটা বিদ্রূপাত্মক সরসতা রহিয়াছে; রামেন্দ্রসুন্দর এই রীতিটিকেও রচনায় প্রচুরভাবে ব্যবহার করিয়াছেন; 'ইংরেজী শিক্ষার পরিণাম' শীর্ষক প্রবন্ধের আরম্ভটিতেই এই পরিহাসকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়।—

"পুরাণ পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায়, সে কালের তেজীয়ান্ মুনিঋষিগণের সন্তান-সন্ততি সকল সময়ে জন্মগ্রহণের জন্য প্রচলিত

নিয়মানুসারে দশ মাস কাল গর্ভাবস্থানরূপ যাতনা ভোগের অপেক্ষা রাখিতেন না। দেশ-কাল-পাত্রের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না রাখিয়াই যত্রতত্র অকস্মাৎ এক এক ঋষি-বংশধরের আবির্ভাব হইত, এবং তিনিও প্রায় ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র সাঙ্গোপাঙ্গ বেদশাস্ত্রের উচ্চারণ আরম্ভ করিয়া একটা ভাবী বিপ্লবের সূচনা করিয়া ফেলিতেন।

"ষাটি বৎসর পূর্ব্বে এদেশে সাব্যস্ত হইয়াছিল, ইংরাজী বিদ্যা না শিখিলে আমাদের মনুষ্যত্ব জন্মিবে না। সাব্যস্ত হইবা মাত্র বিলাতী সরস্বতী দশ মাসের অপেক্ষা না রাখিয়া একেবারে কতকগুলি শ্মশ্রুগুম্ফধারী সুপক্ক সন্তান প্রসব করিলেন; এবং অকস্মাৎ দেশ মধ্যে একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। কেহ আশা করিলেন, ভারতমাতা অচিরেই হিমাচলের উচ্চতম শিখরে উন্নীতা হইবেন; কেহ আশঙ্কা করিলেন, এইবার ইহারা বুড়ীকে ভারতসাগরে ডুবাইয়া মারিল।"

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিত প্রবন্ধগুলি অধিকাংশই পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক; সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধও অধিকাংশ ঐতিহাসিক। হাল্কা ধরণের লেখাও অল্প কিছু কিছু আছে। সাহিত্য-সমালোচনার দু'একটি লেখা বেশ রচনা হইয়া উঠিয়াছে; নমুনা-স্বরূপে 'নারায়ণ' পত্রিকায় প্রকাশিত (৩য় বর্ষ) "উর্ব্বশী বিদায়' 'কণ্বের কোমলমূর্ত্তি' প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

শাস্ত্রী মহাশয়ের 'বাল্মীকির জয়' কি-জাতীয় সাহিত্য? ব্যাপকদৃষ্টিতে ইহাতে রচনা-সাহিত্যের উপাদান অনেক লক্ষিত হইবে। বাল্মীকি-চরিত্রকে একটি বিশেষ উপাখ্যানের ভিতর দিয়া লেখক একটি বিশেষ মূর্ত্তিতে দেখিয়াছেন এবং সেই মূর্তিটিই এখানে অঙ্কিত করিয়াছেন। এখানে উপাখ্যানটিই প্রধান নহে,—আবার এই উপাখ্যানকে অবলম্বন করিয়া লেখকের কতগুলি কথাই বড় হইয়া ওঠে নাই,—উপাখ্যানের সহিত লেখকের ভাবদৃষ্টি মিশ্রিত হইয়াছে এবং সাবলীল সরস ভাষায় প্রকাশিত হইয়া লেখাটি একটা সাহিত্যিক মূল্য লাভ করিয়াছে।

এই যুগের শিবধন বিদ্যার্ণব মহাশয়ের পূর্বস্মৃতিমূলক লেখাগুলিও রচনা-সাহিত্য হিসাবে সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। 'পল্লী পার্ব্বণ' (বঙ্গদর্শন, ১৩৫৮, অগ্রহায়ণ) এই জাতীয় একটি হৃদয়গ্রাহী রচনা। বাঙলা দেশের শ্যামপল্লীর ক্রোড়ে উৎসব-আনন্দের শৈশবস্মৃতিগুলি জীবন্ত এবং মধুর হইয়া উঠিয়াছে।

এই যুগের আর দুইজন অবিশ্রান্ত লেখকের নাম একসঙ্গে করিতে হয়, ইহারা অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং রজনীকান্ত গুপ্ত। দুইজনেই ঐতিহাসিক হইয়াও সাহিত্যিক ছিলেন। তৎকালীন মাসিকপত্রগুলিতে এই উভয় লেখকেরই ঐতিহাসিক এবং ঐতিহ্যমূলক বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, এবং পরবর্তিকালে গ্রন্থাকারেও তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। উভয় লেখকেরই এই সাধনা ছিল যে ইতিহাসকে তাঁহারা সন তারিখ এবং ঘটনা সমূহের পারম্পর্য নির্ণয়ের ভিতরেই সীমাবদ্ধ রাখেন নাই, ইতিহাসের সত্যকে কোনক্রমে ক্ষুণ্ণ না করিয়াও তাঁহারা তাহার ভিতরে জাতীয়তামন্ত্রে দীক্ষিত প্রাণের আবেগ যুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের সকল আশা, আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ তাঁহাদের ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলির ভিতরে স্ফূর্তি লাভ করিয়াছে। অন্তরের উৎসাহ ভাষা ও রীতিকেও প্রভাবান্বিত করিয়াছিল,—তাই তাঁহাদের লেখা সাধারণতঃ ওজোগুণোদ্দীপ্ত।

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় এযুগের একজন স্থলেখক ছিলেন। নানা বিষয়ে তাঁহার যেমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ চিন্তাশীল প্রবন্ধও রহিয়াছে, আবার সুকুমার সাহিত্যিক রচনাও রহিয়াছে। তাঁহার 'বসন্ত ও বর্ষা', (প্রচার, ৪র্থ বর্ষ) রচনাটির ভিতরে একটু শিথিলতা এবং বাড়াবাড়ি সত্বেও একটি ভাবস্থ দৃষ্টি রহিয়াছে—লেখাটির উপসংহারে এই দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।—

"বর্ষা আমাদিগকে গৃহে প্রতিষ্ঠিত করে',—কারণ তখন আমাদের চিত্ত স্থির, হৃদয় কেন্দ্রীভূত, আত্মা দ্বৈতভাবশূন্য, অদ্বৈত ভাবাপন্ন; তখন গৃহেই জগৎ, জগৎই গৃহ, তখন বাহিরের বস্তু অপ্রয়োজন, কাজেই আমরা গৃহে প্রতিষ্ঠিত। বসন্তে আমরা বাহিরে বড়ই বেড়াইয়া বেড়াই,—কারণ তখন আমাদের চিত্ত চঞ্চল, মনটা কেমন উড়ু উড়ু। তখন হৃদয় বাসনার বেগে বিপথগামী, বাহিরের বস্তু লইয়া ব্যতিব্যস্ত। বসন্তে মধুকর এ ফুল হইতে ওফুলে, ওফুল হইতে সেফুলে দৌড়িয়া বেড়ায়, আত্মার একত্ব অনুভব করিয়া উঠিতে পারে না। অতএব বর্ষা ও বসন্ত উভয়ের কে "অদ্বৈতবাদী" ও কে "দ্বৈতবাদী" তাহা বারেক আবার বিবেচ্য।"

চিন্তাশীলতার সহিত হাস্যরসের ফোড়ন দিয়া ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার রচনাগুলিকে বেশ উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। নমুনা স্বরূপে তাঁহার দু'একটি রচনা সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই তাঁহার রচনার প্রকৃতি বোঝা যাইবে। যেমন 'হিন্দু জাতির একনিষ্ঠতা' (বঙ্গদর্শন, ১৩০৮, বৈশাখ)।

শিরোনামাদৃষ্টে লেখাটির ঐতিহ্যমূলক তথ্যবহুল প্রবন্ধ হইবারই কথা ছিল,—কিন্তু ব্রহ্মবান্ধবের আরম্ভটি বেশ সরস,—

"করতল চটুচটাধ্বনি মুখরিত সভাগৃহে হিন্দু জাতির মহিমা সময়ে অসময়ে পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। চাটুবাদলোলুপ বাগ্মিগণ "আমরা হিন্দু," "আমরা শ্রেষ্ঠ" এবম্প্রাতীয়ক গৌরব-বচনমধু শোতৃবর্গের কর্ণকুহরে ঢালিয়া দেন। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, হিন্দুর হিন্দুত্ব আর্য্যদিগের গৌরব কোন্ ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত, কোন্ মন্ত্রে পরিরক্ষিত, তাহা হইলে কেবল একটা বাঙ্‌নিষ্পত্তিবিহীন মস্তক কণ্ডুয়ন-সূচনা দৃষ্ট হয় মাত্র।"

ইহার পরে অবশ্য লেখক হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য নিজ মতানুযায়ী আলোচনা করিয়াছেন; সে আলোচনায় কেবল তরল পরিহাস নাই,—চিন্তাশীলতা ও পাণ্ডিত্যেরও পরিচয় রহিয়াছে। 'তিন শত্রু' (বঙ্গদর্শন, ১৩০৮, শ্রাবণ) লেখাটিও সরস। লেখকের মতে তৎকালীন জাতীয় জীবনের তিন শত্রু ছিল—

"প্রথম—বৃথাভিমানী 'হিন্দু'-'হিন্দু'-রবনির্ঘোষকারী গোঁড়ার দল। তাঁহাদের নিকটে সনাতনে ও নূতনে, আর্যে ও অনার্যে, ভগবদ্‌গীতায় ও মনসা ঘেঁটুর গীতে কোন প্রভেদ নাই।... ...

"দ্বিতীয়—ইংরাজিনবিশ হিন্দু নামধারী রামপক্ষিভক্ষীর দল। ইহাদের যে পাঠ পড়াও সেই পাঠই পড়েন। "রাধাকৃষ্ণ" বলাও, তাও বলেন, "কালীকল্পতরু" ভজাও, তাও ভজেন।......

"তৃতীয়—সমন্বয়বাদীর দল। এঁরা জোড়াতাড়া দিয়া একীভূত করেন। আমাদেরও কিছু আছে, ওদেরও কিছু আছে, সকলেরই কিঞ্চিৎ আছে। এই বিকীর্ণ 'কিঞ্চিৎ'গুলা জড় করিয়া একটা স্তূপ বাঁধিলে পূর্ণাবয়ব সর্ব্বাঙ্গীণ সত্য লাভ করা যায়।"

অতি সামান্য বিষয়কে অবলম্বন করিয়া হাস্যে, গাম্ভীর্যে, আন্তরিকতায় তাহাকে উপভোগ্য করিয়া তুলিবার বিশেষ ক্ষমতা ছিল ব্রহ্মবান্ধবের। যেমন তাঁহার 'পিঠে-পুলি' ('সন্ধ্যা'য় প্রকাশিত)—

"অদ্বৈতানন্দ-সাগরে ডুবিতে ডুবিতে এই পিঠে-পুলির রসে মজিলাম। কাজ নাই আমার ভূমানন্দ—অদ্বৈত অনুভূতির নির্ব্বিকল্প সমাধি। আমি জন্ম-জন্মান্তর বাঙ্গালার শ্যাম অঙ্কে জন্মাইব, ঐ পিঠে পুলিরই অনুপম অনুরাগে। এ আমার মোহ নহে, বুড়ো বয়সের লোভও নহে, আজ অদ্বৈততত্ত্বকে ভাল করিয়া অনুভব করিলাম, উহা ত নাস্তিত্ব নহে—উহা যে অস্তিত্বের অমৃতে অমৃতায়মান

—'রসো বৈ সঃ'—যাহা আছে সবই রসমহিমায় মহিম-মধুর। তাই আরণ্যক ঋষির সত্যদৃষ্টি—'মধুমৎ পার্থিবং রজঃ'। আমি আজ অনুভব করিয়াছি—আমার সবই ভূমার মহিমায় মহিমান্বিত। তাই আজ আমার পিসিমার হাতে গড়া পুলি-পিঠের স্বাদ লইতে লইতে সেই অদ্বৈত রসাস্বাদন করিতেছি। বিশ্বাস হয় না? ভালবাসিও, আমার—তোমারও বঙ্গভূমিকে!—তবে পুলি-পিঠের স্বাদে ভূমানন্দই অনুভূত হইবে।"

রচনাকার হিসাবে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম শ্রদ্ধার সহিত স্মর্তব্য। 'সাহিত্য,' 'নারায়ণ' পত্রিকায় ইঁহার বিবিধ প্রবন্ধ ও রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি বেশ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন,—হিন্দুশাস্ত্রে এবং দেশ-বিদেশের সাহিত্যে ইঁহার অধিকার ছিল। কিন্তু তাঁহার সবগুলি লেখাই নিছক শাস্ত্রজ্ঞান বা পাণ্ডিত্য দ্বারা ভরা ছিল না,—স্বীয় অনুভূতি ও কল্পনা দ্বারা তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান স্থানে স্থানে স্নিগ্ধ মধুর হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দুর ধর্ম-কর্ম, পাল-পার্বণ, উৎসব-আনন্দকে তিনি বহুস্থানে একটা নূতন আলোকে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন,—এই নূতন দৃষ্টির ভিতরে একটা মানবীয়তার স্পর্শ তাঁহার রচনার বৈশিষ্ট্য। তাঁহার লিখিত 'ভ্রাতৃদ্বিতীয়া' রচনাটি এই জাতীয় রচনার একটি চমৎকার উদাহরণ। 'নববর্ষ' সম্বন্ধে তাঁহার দুইটি রচনা (সাহিত্য, ২৪ বর্ষ, ১ম সংখ্যা ও ২৫ বর্ষ, ১ম সংখ্যা) তাঁহার চিন্তাশীলতার সহিত কল্পনা ও হৃদয়াবেগের মিশ্রণজনিত রচনার দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'নারায়ণ' (১৩২৩ ফাল্গুন) পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার 'দোল-পূর্ণিমা' রচনাটিও ভাবে এবং প্রকাশ-ভঙ্গিতে একটা বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে।

রাজনীতি, ধর্মনীতি ও ঐতিহ্যমূলক প্রবন্ধ লেখায় বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। বিপিনচন্দ্রের অধিকাংশ লেখাই প্রবন্ধ হইলেও সবই প্রবন্ধ নহে; চিন্তাশীলতার সহিত ব্যক্তিজীবনের হৃৎস্পন্দনের যোগে রচনাও তাঁহার কিছু কিছু আছে। নমুনা স্বরূপে 'বঙ্গদর্শনে' (১৩১৪, অগ্রহায়ণ) প্রকাশিত তাঁহার 'প্রাণের কথা' রচনাটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'প্রাণের কথা' একদিকে যেমন 'প্রাণের কথা' (জৈবিক প্রাণশক্তি সম্বন্ধীয়) অন্যদিকে আবার 'প্রাণের কথা'ও (হৃদয়ের কথা) বটে,—ইহা বুদ্ধি ও প্রাণের পরস্পর-সহকারিত্বে রচনা। 'নারায়ণ' পত্রিকায় তাঁহার বিবিধ বিষয়ক বহু প্রবন্ধ ও রচনা প্রকাশিত হইয়াছে।

জলধর সেন মহাশয়ের 'হিমালয়ে'র ভ্রমণ-কাহিনীটি স্থানে স্থানে সাহিত্যিক রচনা হইয়া উঠিয়াছে। বর্ণনার ভিতরে যেমন একটা ঘরোয়াভাবে কথা বলিবার রীতি আছে, তেমনই একটা সহজ সাবলীলতা আছে।

প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পাষাণের কথা' প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়কে অবলম্বন করিয়া স্থানে স্থানে বেশ সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে। প্রকাশভঙ্গির অভিনবত্বই ইহাকে স্থানে স্থানে রচনা-সাহিত্যের মর্যাদা দান করিয়াছে।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ; বাঙলা গদ্য লেখা তাঁহার অতি অল্প,—কিন্তু এক 'অব্যক্তে'র ভিতরে প্রকাশিত লেখাগুলির জন্য তিনি বাঙলা-রচনা-সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পাইবার অধিকারী হইয়া গিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের ভিতরে একটি কবিপ্রাণও ছিল ; এই কবি প্রাণের পরিচয় তাঁহার গবেষণাত্মক নিবন্ধাবলীর ভিতরে ছড়াইয়া আছে। জগতের জড় এবং চেতন সম্বন্ধে তিনি যে-সকল সত্য লাভ করিয়াছেন তাহা শুধু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা লাভ করেন নাই, তাহার পশ্চাতে আছে তাঁহার কবিহৃদয়ের অনুভূতি। 'গাছের কথা' বলিতে গিয়া লেখক বলিয়াছেন,—"তোমরা দেখিয়াছ, ছেলের মুখ দেখিয়া মা বুঝিতে পারেন, ছেলে কি চায়? অনেক সময় কথারও আবশ্যক হয় না। ভালবাসিয়া দেখিলেই অনেক গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়।"

"আগে যখন একা মাঠে কিংবা পাহাড়ে বেড়াইতে যাইতাম, তখন সব খালি-খালি লাগিত। তারপর গাছ, পাখী, কীট-পতঙ্গদিগকে ভালবাসিতে শিখিয়াছি। সে অবধি তাদের অনেক কথা বুঝিতে পারি, আগে যাহা পারিতাম না।" এই গভীর দরদ লইয়াই বিস্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তিনি বিশ্ব-সৃষ্টি ও তাহার অন্তঃপ্রবাহিত জীবনধারার দিকে তাকাইয়াছেন। এই দরদ—বিস্ময়বিমুগ্ধতা—ইহাই ত কবিদৃষ্টি। সহজাত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সহিত এই সহজাত কবিদৃষ্টি মিলাইয়া জগদীশচন্দ্র যে সকল সত্য লাভ করিতেন তাহার প্রকাশভঙ্গির ভিতরেও এই উভয়ের একটা সঙ্গতি ছিল। 'ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে' রীতিমতন রচনা-সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে। অতীতযুগের পৌরাণিক দৃষ্টি এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সহিত রহস্যভরা কবিদৃষ্টি মিলাইয়া এইজাতীয় সার্থক রচনা বাঙলা-সাহিত্যে একান্ত বিরল।

ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'অভয়ের কথা' এবং 'ঠাকুরাণীর কথা' মূলতঃ দার্শনিক আলোচনা হইলেও প্রকাশভঙ্গিতে স্থানে স্থানে সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে। দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের 'পল্লীচিত্র', 'পল্লীচরিত্র', 'পল্লীবৈচিত্র্য' প্রভৃতি লেখার ভিতরে বাঙলার পল্লীগুলি চিত্রে, চরিত্রে, উৎসব-আনন্দে, পাল-পার্বণে সত্যই জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার ভিতরে লেখকের পল্লীজীবনের সহিত আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা এবং কথার তূলিকায় চিত্র এবং চরিত্র ফুটাইবার কৃতিত্ব উভয়ই প্রকাশ পাইয়াছে। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'রামায়ণী-কথা', 'বেহুলা' প্রভৃতি লেখা স্থানে স্থানে সুন্দর সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে। বিষয়বস্তুর সহিত আপনাকে মিলাইয়া লইবার একটা সহজাত প্রবণতা তাঁহার ক্ষুদ্র বৃহৎ অন্যান্য লেখার ভিতরেও পরিস্ফুট।

অষ্টম অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের সার্বভৌম কবি-প্রতিভার ঔজ্জ্বল্য তাঁহার কথা-সাহিত্য, নাট্যসাহিত্য বা প্রবন্ধ ও রচনা-সাহিত্যের প্রতিভাকে ম্লান করিয়া রাখে নাই বটে, কিন্তু অনেকখানি কোণঠাসা করিয়া রাখিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ প্রকারে এবং পরিমাণে যত বড় কবি ছিলেন তত বড় কবি না হইয়া যদি শুধু যে প্রকারের এবং যে পরিমাণের গল্প-উপন্যাস বা প্রবন্ধ-রচনা লিখিয়া গিয়াছেন তাহার ভিতরেই তাঁহার সৃষ্টি-প্রতিভার প্রয়োগ-পরিধিকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়া যাইতেন, তবে ইহার যে-কোন জাতীয় সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য তাঁহার তজ্জাতীয় পরিচয় আমাদের কাছে আরও বড় হইয়া উঠিতে পারিত। রবীন্দ্রনাথ এত বড় কবি বলিয়াই তিনি যে শ্রেষ্ঠ গল্পলেখকও এ-কথাটা আমরা অনেক সময় ভুলিয়াই যাই।

রবীন্দ্রনাথ বাঙলা-সাহিত্যের বড় রচনাকারও। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, জগতে যত রকম সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার ভিতরে সার্থক রচনা সবচেয়ে কম। জগতের সেই দুর্লভ রচনাকারগণের ভিতরে রবীন্দ্রনাথ একজন। রবীন্দ্রনাথের এই রচনাকার রূপটি সম্বন্ধে আমরা বিশেষ সচেতন এবং অবহিত নহি। আমরা রবীন্দ্রনাথের কাব্য-কবিতা, নাটক-উপন্যাসেই দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া গিয়াছি শুধু তাহাই নহে,—রচনাও তিনি এত লিখিয়াছেন, তাহার এত বৈচিত্র্য যে এক তাঁহার রচনা-সাহিত্যের ক্ষেত্রেই দিগ্‌ভ্রান্তির সম্ভাবনা রহিয়াছে। ছোটখাটো বাগানটির ছোট খাট লতা-পাতা, ফুল-ফলকে লইয়া সুস্পষ্ট কাব্য করা সহজ,—কিন্তু যেখানে দিগন্তজোড়া বনস্থলী বা পর্বতগাত্রে জাগিয়া ওঠে অজস্র ঋতু-উৎসব, সেখানে সব জুড়িয়া জাগে শুধু বিস্ময়।

এই কারণে রবীন্দ্রনাথের রচনাকে কাটিয়া-ছাটিয়া, বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেখান সহজ নহে। ডুবুরি যদি অনেক ডুবিয়া বহু শুক্তির ভিতরে অল্প মুক্তার সন্ধান পায়, তবে সে তাহার মুক্তার ঔজ্জ্বল্য এবং মহার্ঘতা সম্বন্ধে যতখানি অবহিত হইবার সুযোগ পায়, ডুবে ডুবে যে শুক্তি পাইত তাহার অধিকাংশই

যদি মুক্তা হইত তবে তাহার সেই পূর্ববর্তী স্পষ্ট চেতনা সম্ভব হইত না। রবীন্দ্র-রচনা-সাহিত্যেও শুক্তিতে মুক্তার সুলভতা এবং আধিক্য তাহার যথার্থ মূল্যনিরূপণে আমাদিগকে অনেক সময় বিভ্রান্ত করিয়া তোলে।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যলেখার ভিতরে নিবন্ধ আছে, প্রবন্ধ আছে, অল্পায়তনের রচনা আছে;—এই সকলের ভিতরে ধর্ম আছে, ইতিহাস আছে,—সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিক্ষা, রাজনীতি সম্বন্ধেও বহু আলোচনা রহিয়াছে—প্রাচীন সাহিত্য, লোক সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য এবং 'অত্যাধুনিক' সাহিত্য সম্বন্ধেও আলোচনা রহিয়াছে,—জীবন-স্মৃতি আছে, ছিন্ন এবং অচ্ছিন্ন পত্র আছে, পঞ্চভূতও রহিয়াছে—আর রহিয়াছে একটি ভাবস্থ বিশেষ মানসিক অবস্থানকে অবলম্বন করিয়া আত্মনিষ্ঠ রচনা। সাহিত্য-বিচারের সাধারণ পদ্ধতিতে নিবন্ধ-প্রবন্ধ-সমালোচনা প্রভৃতিকে খাঁটি-সাহিত্যের এলাকার কিঞ্চিৎ বাহিরে যথেষ্ট সমীহা পূর্বক স্থাপন করিয়া এই আত্মনিষ্ঠ রচনাগুলিকেই বিশুদ্ধ সাহিত্য বলিয়া গ্রহণ করিতাম; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সে কাজ একটু হঠকারিতা হইবে বলিয়া সংশয় হইতেছে। একটু ব্যাপক অর্থে রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় প্রায় সকল লেখাই সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে। আমরা পূর্বে সাহিত্যের যে ব্যাপক সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছিলাম তাহাতে দেখিয়াছি যে, সমস্ত বক্তব্য এবং বচনকৌশল জুড়িয়া যেখানে একটা রস-ব্যঞ্জনাই মুখ্য হইয়া ওঠে, তাহাই খাঁটি সাহিত্য। কোন্ লেখা কতটুকু সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে না-উঠিয়াছে তাহার বিচার চলিবে সেই লেখার ভিতরকার রস-ব্যঞ্জনার তারতম্য লইয়া। রবীন্দ্রনাথের নিবন্ধ-প্রবন্ধগুলিকে আমরা খাঁটি সাহিত্য বলিতে পারি না, কারণ সেখানে 'সাধ্য' এবং তথ্যসহকারিত্বে মননশীলতার 'সাধন' কিছু অপ্রধান হইয়া ওঠে নাই; কিন্তু তাহা মিশ্র সাহিত্য বটে; কারণ তাঁহার বুদ্ধির হিরণ্ময় রশ্মিজাল তাহার অভিজাত বিশুদ্ধি রক্ষা করিয়া রস-ব্যঞ্জনাকে কোথাও একেবারে ঢাকিয়া ফেলিতে পারে নাই। তাই প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা লইয়াও তিনি যেখানে ঐতিহাসিক আলোচনা করিয়াছেন বা আমাদের শিক্ষা সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে তথ্য ও যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন সেখানেও তিনি বক্তব্যটাকেই শুধু ভাল করিয়া বলেন নাই,—তাহাকে সুন্দর করিয়া—রসাল করিয়া বলিয়াছেন, এবং তাহাকে যতটা সুন্দর করিয়া বলিতে পারিয়াছেন তাহা ততটা সাহিত্যের অঙ্গীভূত হইয়া উঠিয়াছে।

আসলে সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের কাছে কোন 'সাধ্য' বস্তু নয়, 'সিদ্ধ' বস্তু। সাহিত্যের মৌলিক উপাদানগুলি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিসত্তারই উপাদান। কথাটা যত বড় কাব্যিক শোনায়, যৌক্তিক তাহা অপেক্ষা কিছু কম নহে। জীবন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে পরম প্রেয়ো- এবং শ্রেয়োবোধ তাহা একদিকে যেমন তাঁহাকে বিশুদ্ধ ব্যবহারিক বুদ্ধির মাধ্যাকর্ষণ বলে নিরেট পৃথিবীর মধ্যকেন্দ্রেই নিবদ্ধ রাখিতে পারে নাই, তেমনই উর্ধ্বলোকের কোন বিশুদ্ধ শূন্যাকর্ষণও তাঁহাকে কোন রূপ-রসহীন নিস্তরঙ্গ লোকে পৌছাইয়া দেয় নাই। আমাদের জীবন সম্বন্ধে যে সাধারণ মূল্যবোধ তাহা প্রধানভাবে নিয়ন্ত্রিত আমাদের অন্ন, প্রাণ এবং মনের চাহিদা দ্বারা, কিন্তু তাহারও উর্ধ্বে যে বিজ্ঞান রহিয়াছে এবং সর্বোপরি যে আনন্দ রহিয়াছে তাহাকে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেকখানি পোষাকী বাহুল্যে পর্যবসিত করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-সত্তার ভিতরে এই অন্ন, প্রাণ, মন এবং বিজ্ঞানের উর্ধ্বে আনন্দের স্পন্দনটাই বড় হইয়া উঠিয়াছিল, জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাই সৌন্দর্য এবং রসের ভিতর দিয়া এই আনন্দের লীলাটাকেই তিনি বড় করিয়া দেখিয়াছেন। কবি নিজের দেহ-মন জুড়িয়া যেমন নিরন্তর অনুভব করিতেন এই আনন্দ-স্পন্দন, সমগ্র সৃষ্টির অন্তর-বাহির জুড়িয়াও তেমনই দেখিয়াছিলেন সেই একই আনন্দলীলা; বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে তাঁহার কোন বোধই তাই সৌন্দর্যবোধ এবং রসবোধ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া দেখা দিতে পারে নাই। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথের সত্তা বাঙ্ময় স্পন্দনে শুধু সৌন্দর্য এবং রস বিকীর্ণ করিয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সহিত যাহাদের স্বল্পতম ব্যক্তিগত পরিচয় রহিয়াছে, তাঁহারাই জানেন, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত লেখার ভিতর দিয়াই যে তিনি সৌন্দর্য এবং রস পরিবেশন করিয়া গিয়াছেন তাহা নহে,—তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের সকল গুরুগম্ভীর হইতে আরম্ভ করিয়া তুচ্ছতম খুঁটি-নাটি কথাকেও তিনি এত সুন্দর এবং মধুর করিয়া বলিতেন যে তাহাও লিখিয়া রাখিলেই সাহিত্য হইত। প্রত্যেকটি কথাই যে অন্তর্নিহিত রস-সত্তারই ধ্বনিময় প্রস্ফুরণ, তাই তাহারাও সাহিত্যের সামগ্রী। সমগ্র জীবনটাই একটা জীবন্ত সাহিত্য না হইলে কি কেহ কখনও এক জীবনে এত সাহিত্য রচনা করিয়া যাইতে পারেন?

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের রচনা-সাহিত্য সবটাই সম্পূর্ণরূপে তাঁহার নিজস্ব। কথাটা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন

এই যে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য সাহিত্যিক সৃষ্টিতে আমরা হয়ত মাঝে মাঝে যে পাশ্চাত্যের গন্ধ পাইয়াছি তাহাকে নিঃসংশয়ে পরিপক্ব স্বীকরণ বলিয়া মানিয়া লইতে পারি নাই; এই কারণে কাব্যের ক্ষেত্রে মধুসূদন যেমন 'বঙ্গের মিল্টন' তেমনই রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গের শেলী' এজাতীয় একটা অপবাদ বহুদিন বাজারে চলিত ছিল; ঠিক ভাবে হোক বা বেঠিক ভাবে হোক, রবীন্দ্রনাথের রূপক-নাট্য পাঠ করিবার বেলা আমরা 'মেটারলিঙ্ক'কে স্মরণ করি; কিন্তু রচনা-সাহিত্যের বেলা কি চিন্তায়, কি ভাবে, কি কলাকৌশলে কোনও দিক হইতেই এক রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কাহাকেও স্মরণ করিবার কারণ ঘটে না। এই বিশুদ্ধ রচনাগুলিকে জগতের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ রচনাকারগণের রচনা-সাহিত্যের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে; এবং সে তুলনায় সাধর্ম্য অনেক খুঁজিয়া পাওয়াই সম্ভব এবং সঙ্গত; কিন্তু সে সাধর্ম্য কোনওরূপ প্রভাবজনিত নহে—সে সাধর্ম্য শ্রেষ্ঠ রচনা-সাহিত্যের দেশ-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ সহজ সাধর্ম্য।

পূর্বে বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের নিবন্ধ-প্রবন্ধ-রচনার প্রাচুর্যের ভিতরে দিগ্‌ভ্রান্তির ক্ষমার্হ সম্ভাবনা রহিয়াছে; সুতরাং বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের এ-জাতীয় লেখার একটা মোটামুটি ভাগ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই জাতীয় ভাগের সর্বদাই একটা কার্যোপযোগী মোটামুটি ভাগ ছাড়া কোন স্পষ্ট বৈজ্ঞানিক বা নৈয়ায়িক ভাগ হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা নাই; কারণ সাহিত্যিক রচনার স্বরূপ সাধারণতঃ এত বিমিশ্র এবং জটিল যে তাহার সম্বন্ধে এইজাতীয় স্পষ্ট কোন ভাগের কথাই ওঠে না।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যলেখার ভিতরে এক রকমের লেখা রহিয়াছে, তাহা ধর্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতা, শিক্ষা, সমাজ ও তৎকালীন রাজনীতি সম্বন্ধে নিবন্ধ প্রবন্ধ। এ জাতীয় লেখার পরিমাণ নেহাৎ কম নয়। দ্বিতীয় প্রকারের লেখা সাহিত্য-সমালোচনা এবং সাহিত্য ও শিল্পের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা। তৃতীয় তাঁহার জীবন-স্মৃতি এবং আত্ম-বিষয়ক অন্যান্য লেখা। চতুর্থ প্রকারের লেখা 'শান্তি-নিকেতনে' প্রকাশিত ধর্মের ব্যাখ্যান ও ধর্মোপলব্ধি সম্বন্ধে ছোট ছোট অসংখ্য লেখা। পঞ্চম তাঁহার 'পঞ্চভূত'; ইহা মূলতঃ রচনা-সাহিত্য, তবে একটি অভিনব কৌশলে রচিত। ষষ্ঠ তাঁহার খাঁটি সাহিত্যিক রচনা। 'বিচিত্র-প্রবন্ধে'র প্রায় সবগুলি লেখা এবং 'শান্তি-নিকেতনে' প্রকাশিত কয়েকটি লেখা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। সপ্তম তাঁহার কতগুলি গদ্যরচনা যাহা তাঁহার গদ্যকবিতারই প্রাক্‌রূপ। অষ্টম রবীন্দ্রনাথের 'পত্র-সাহিত্য'। ইহার

ভিতরে দেশ-বিদেশের ভ্রমণ-কাহিনী অবলম্বনে পত্রই বেশী; তবে বিবিধ বিষয়ক পত্রাবলীও কম নহে। ইহা ব্যতীতও স্পষ্ট কোন শ্রেণীভূক্ত নয় এমন লেখাও রবীন্দ্রনাথের বহু রহিয়াছে।

প্রথমে রবীন্দ্রনাথের নিবন্ধ-প্রবন্ধগুলির কথাই ধরা যাক। এখানে অবশ্য রস-পরিবেশন অপেক্ষা তথ্য-যুক্তি-সমন্বিত সত্য-প্রচারকেই যথা-সম্ভব কান্তা-সম্মিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু একটা কথা এই প্রসঙ্গে ভাবিয়া দেখিবার। রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় নিবন্ধ-প্রবন্ধের ভিতরে বিশুদ্ধ সাহিত্যিক রস পরিবেশনের চেষ্টা গৌণ হইলেও একথা সত্য যে, এই নিবন্ধ প্রবন্ধগুলি পড়িতে পড়িতে আমাদের মন খুশীতে ভরিয়া ওঠে। এই 'খুশী'টির স্বরূপ কি? এ-খুশীটি একটি বিমিশ্র খুশী। কোথায় যে সে কতটুকু বিশুদ্ধ বুদ্ধির প্রসাদ-জনিত হ্লাদবৃত্তি—আর কোথায় যে সে কবি-হৃদয়ের সহিত পাঠক হৃদয়ের সংবাদ-জনিত সন্তোষ তাহা নির্ণয় করা শক্ত। রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় লেখার ভিতরেও বিশুদ্ধ বুদ্ধির চরিতার্থতা-জনিত আহ্লাদই প্রধান নয়, কারণ ধর্ম, রাজনীতি, সমাজ, শিক্ষা প্রভৃতি জীবনের কোনক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ বিশুদ্ধ বুদ্ধিজীবী হইয়া উঠিতে পারেন নাই। এই জন্য ধর্মসম্বন্ধে তাঁহার যত নিবন্ধ-প্রবন্ধ তাহা কোথাও তথাকথিত দার্শনিকতা হইয়া ওঠে নাই। আসলে একটু লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইব, এই জাতীয় সকল লেখার ভিতরেও সর্বদাই রহিয়াছে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিসত্তার প্রকাশ। এই জাতীয় সমস্ত রচনার তথ্য সরবরাহ করিয়াছে প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথের নিজেরই জীবন,—তাঁহার সকল সহজাত সংস্কার বিশ্বাস এবং প্রবণতা—তাঁহার আশৈশব অনুভূতি—তাহার উপরে বিশ্বজগতের সহিত সুদীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠ পরিচয়। সেই তথ্যগুলিকে প্রকাশ করিবার যে বিশেষ ভঙ্গিটি তাহাও রবীন্দ্রনাথের নিজেরই। রবীন্দ্রনাথের 'মানব ধর্ম' বা এই জাতীয় নিবন্ধের ভিতরে রবীন্দ্রনাথ ধর্ম সম্বন্ধে যত কথা বলিয়াছেন, নিখুঁত 'ন্যায়'-নিষ্ঠ কোন দার্শনিক মতবাদের ছাঁচের ভিতরে আমরা তাহাকে ঠিক ঠিক ঠেলিয়া পুরিতে পারি না; ইহার কারণ, এ ধর্মের সকল তথ্য ও তত্ত্ব সংগৃহীত রবীন্দ্রনাথের নিজের জীবন হইতে। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা সম্বন্ধে যত প্রবন্ধ রহিয়াছে, অন্যকার দিনে আমাদের এ-সম্বন্ধে যে সকল তথ্যের উৎস—অর্থাৎ ইউরোপীয় এবং মার্কিন শিক্ষাব্রতী পণ্ডিতগণের সকল কৃশকায় ও স্থূলকায় গ্রন্থরাজি—সেই উৎস হইতে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ কোন তথ্যই সংগ্রহ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের নিজের ভিতরেই

বিদ্যার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কারখানায় নিত্যধর্মঘটকারী একটি দুরন্ত ছাত্র ছিল, আর ছিল সেই দুরন্তের প্রতি অসীম কৃপাবান্—অতএব অসীম ক্ষমাবান্ এবং তদ্‌অতিরিক্ত স্নেহবান্ একটি শিক্ষক, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-সংক্রান্ত তথ্য এবং যুক্তি প্রায় সবই সংগৃহীত অন্তর্নিবাসী গুরুশিষ্যের সংবাদ হইতে।

রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জীবন ধরিয়া শুধু সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন,—নিরন্তর সৃষ্টি করিয়া চলাই ছিল তাঁহার জীবন-ধর্ম। আর এই সৃষ্টির স্বরূপ কি? উপনিষদে স্রষ্টা এবং সৃষ্টির ভিতরকার সম্বন্ধ বিষয়ে বলা হইয়াছে,—"সেই প্রজাপতি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া মনে ভাবিলেন,—আমিই সৃষ্টি, যেহেতু এই সকল আমিই সৃষ্টি করিয়াছি। এই জন্য তাঁহার সৃষ্টি নাম হইল। যে সৃষ্টি-তত্ত্বকে এইভাবে জানে সেও এই প্রজাপতির সৃষ্ট জগতে স্রষ্টৃত্ব লাভ করে।" * আদিকবি প্রজাপতি ব্রহ্মার এই সৃষ্টিতত্ত্বকে রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন,—তাই রবীন্দ্রনাথের যত কাব্যসৃষ্টি তাহাও রবীন্দ্রনাথই। এই স্রষ্টৃধর্মই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-ধর্ম, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-নিবন্ধগুলিও এই সাধারণ সাহিত্য-ধর্ম হইতে একেবারে বিচ্যুত হইতে পারে নাই, তাই এগুলির ভিতরেও রহিয়াছে নানাভাবে রবীন্দ্রনাথেরই প্রকাশ।

এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের নিবন্ধ-প্রবন্ধ জাতীয় লেখার সহিতও আমরা যত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হই, রবীন্দ্রনাথের সহিতও আমরা ততই ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হই। একদিকে জীবন হইতে সংগৃহীত নব নব তথ্য এবং ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের মৌলিকতায় নব নব আদর্শে প্রকাশিত সিদ্ধান্তগুলি নূতন নূতন স্পন্দনে আমাদের বুদ্ধিকে একটা অনুকূল দোলায় অথবা প্রতিকূল ধাক্কায় সর্বদা জাগ্রত রাখে—এই অনুকূলতার ভিতরেই হোক বা প্রতিকূলতার ভিতরেই হোক—বুদ্ধির জাগরণের ভিতরেই আমাদের একটা আনন্দ রহিয়াছে। অন্যদিকে লেখকের বৃহত্তর ব্যক্তিসত্তার সহিত ব্যাপক পরিচয়েও মন খুশীতে ভরিয়া ওঠে। আর এই দুই খুশীর সহিত মিশ্রিত থাকে একটা অভিনব প্রকাশ-কৌশলের আস্বাদন,—এই সবগুলি খুশী জড়িত হইয়া থাকে রবীন্দ্রনাথের নিবন্ধ-প্রবন্ধ পাঠে,—এই জন্যই এই খুশীর প্রকৃতিকে আমরা বিমিশ্র বলিয়াছিলাম।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে খুশীর এই বিমিশ্রতা খুবই সাধারণ, বিশেষ করিয়া রচনা-

---

* সোঽবেদহং বাব সৃষ্টিরস্ম্যহং হীদং সর্বমসৃক্ষীতি, ততঃ সৃষ্টিরভবৎ, সৃষ্ট্যাং হাস্যৈতস্যাং ভবতি য এবং বেদ।—বৃহদারণ্যক, ১।৪ ৫

সাহিত্যের ক্ষেত্রে। সাহিত্যরসের নিখাদ বিশুদ্ধি একটা কাল্পনিক আদর্শমাত্র, বাস্তব সত্য নহে। শুধু সাহিত্যরস নহে, আমাদের জীবনের কোন রসবোধ বা অন্যজাতীয় কোন বোধ কখনও তাহার বিশুদ্ধতম রূপের দাবী করিতে পারে না,—মানুষের মনোধর্মের দিক হইতেই এদাবী অগ্রাহ্য। শুধু আনুপাতিক তারতম্যই এক্ষেত্রে স্বরূপনির্ণয়ের একমাত্র মাপকাঠি। রচনা-সাহিত্যের বেলায় কোথায় বুদ্ধির সন্তোষ হৃদয়ানুভূতির সহিত কতটা মিশিয়া থাকে, সেই বসানুভূতির স্নিগ্ধতাই বা বুদ্ধির প্রসাদকে কতটা কমনীয় করিয়া তোলে, তাহার স্পষ্ট বিচার বা পরিমাণ করা সহজ নহে। আমরা আমাদের বুদ্ধি এবং হৃদয়কে যেরূপ পরস্পর বিচ্ছিন্ন একেবারে কাটাছাঁটা প্রান্তবাসী বলিয়া গ্রহণ করিতে চাই, উহাও অনেকখানিই কল্পনামাত্র; বাস্তবে তাহারা অনেক সময়েই সীমালঙ্ঘন করিয়া চলে। বিশেষ করিয়া রচনাসাহিত্যের ক্ষেত্রে বুদ্ধির উপাদান এবং হৃদয়ের উপাদান অনেকক্ষেত্রে পরস্পর প্রতিযোগী না হইয়া পরস্পর সহযোগী হইয়া ওঠে এবং এই সহযোগিত্বে তাহারা অনুপূরক।

রবীন্দ্রনাথের এই নিবন্ধ-প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তুর শুধু ভার নয়, একটা মহিমা রহিয়াছে। কিন্তু সেই বিষয়বস্তুর প্রকৃতি ও মহিমার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে গহনের ভিতরে পথহারা হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই নিবন্ধ-প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তু এমন ব্যাপক এবং বিচিত্র যে তাহার সুষ্ঠু পরিচয় জানিতে হইলে তাহা আমাদের বর্তমান আলোচনার সহিত সম্পূর্ণ 'অপৃথগ্-যত্ন-নির্বর্ত্য' হইবে না।

সাহিত্যের দিক হইতে বিষয়বস্তুর মহিমা অপেক্ষা প্রকাশ-ভঙ্গির মহিমা কিছু কম নয়,—বরঞ্চ এই দ্বিতীয়টাকেই অনেকে বড় বলিয়া মনে করেন। 'পঞ্চভূতে'র ভিতরে দেখিতে পাই—

"সাহিত্যে বহুকাল ধরিয়া একটা তর্ক চলিয়া আসিতেছে যে, বলিবার বিষয়টা বেশি, না, বলিবার ভঙ্গিটা বেশি। আমি এ কথাটা লইয়া অনেকবার ভাবিয়াছি, ভালো বুঝিতে পারি না। আমার মনে হয় তর্কের খেয়াল অনুসারে যখন যেটাকে প্রাধান্য দেওয়া যায় তখন সেইটাই প্রধান হইয়া উঠে।

"ব্যোম মাথাটা কড়িকাঠের দিকে তুলিয়া বলিতে লাগিল,—সাহিত্যে বিষয়টা শ্রেষ্ঠ, না, ভঙ্গিটা শ্রেষ্ঠ ইহার বিচার করিতে হইলে আমি দেখি কোন্‌টা অধিক রহস্যময়। বিষয়টা দেহ, ভঙ্গিটা জীবন। দেহটা বর্তমানেই

সমাপ্ত, জীবনটা একটা চঞ্চল অসমাপ্তি তাহার সঙ্গে লাগিয়া আছে, তাহাকে বৃহৎ ভবিষ্যতের দিকে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে, সে যতখানি দৃশ্যমান তাহা অতিক্রম করিয়াও তাহার সহিত অনেকখানি আশাপূর্ণ নব নব সম্ভাবনা জুড়িয়া রাখিয়াছে। যতটুকু বিষয় রূপে প্রকাশ করিলে ততটুকু জড় দেহ মাত্র, ততটুকু সীমাবদ্ধ, যতটুকু ভঙ্গির দ্বারা তাহার মধ্যে সঞ্চার করিয়া দিলে তাহাই জীবন, তাহাতেই তাহার বৃদ্ধিশক্তি তাহার চলৎশক্তি সূচনা করিয়া দেয়।

"সমীর কহিল—সাহিত্যের বিষয়মাত্রই অতি পুরাতন, আকার গ্রহণ করিয়া সে নূতন হইয়া উঠে।"

ইহার ভিতর দিয়া সাহিত্যের বিষয় ও ভঙ্গির মূল্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামতেরও খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। আমরা এখন রবীন্দ্রনাথের নিবন্ধ-প্রবন্ধের 'বিষয়' ছাড়িয়া 'ভঙ্গি' সম্বন্ধেই একটু আলোচনা করিব।

রবীন্দ্রনাথের এই নিবন্ধ-প্রবন্ধগুলির ভিতরেও দেখিতে পাই—লেখক কি বলিয়াছেন সেই চিন্তাতেই সর্বত্র আমাদের মন একান্ত আবিষ্ট হইয়া ওঠে না —কেমন করিয়া বলিয়াছেন তাহার কৌতূহল নেহাৎ কম নয়। অথচ এই কেমন করিয়া বলার যে দুর্লভ নৈপুণ্য তাহা একটা সক্ষম প্রতিভার স্বেচ্ছাকৃত বিলাসচাতুর্য মাত্র নহে,—সেখানে বক্তব্যের সুষ্ঠু প্রকাশ বক্রোক্তির বক্র-আবর্তে পদে পদে ব্যাহত হয় নাই,—সেখানে স্বচ্ছন্দ প্রকাশকেই বক্রোক্তির আঁকা-বাঁকা পথে বঙ্কিম করিয়া তোলা হইয়াছে। আমাদের আলঙ্কারিক কুন্তক এই বক্রোক্তিকেই কাব্যের 'জীবিত' বা প্রাণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। উক্তির এই বক্রতা অর্থ সহজ কথার উপরে গলদ্‌ঘর্ম কসরৎ করিয়া খামখা কয়েকটা প্যাঁচ কষা নহে, এ বক্রতা অর্থ বাচ্য-বাচকের সাহিত্য বা সুসঙ্গতির উপরে প্রতিষ্ঠিত প্রকাশভঙ্গির একটা অভিনব চারুত্ব। সর্বপ্রকার গদ্য রচনায় এই বক্রোক্তিতে রবীন্দ্রনাথ একেবারে সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের এইজাতীয় লেখায় আর একটি বিশেষ রচনাকৌশল লক্ষ্য করিতে পারি। ইহাকে ঠিক রচনাকৌশল বলিতে পারি না,—ইহা রচনা-ধর্ম। এ-ধর্মটি হইতেছে অমূর্ত (abstract) চিন্তাগুলিকে সর্বদাই মূর্ত (concrete) করিয়া তোলা। এই ধর্মটি রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেক রচনার ভিতরেই অনুস্যূত, এবং এই ধর্ম তাঁহার সাধারণ কবি-ধর্মের সহিতই যুক্ত। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি যেখানে শুধু কথা বলে, সাহিত্য সেখানে শুধু

কথা বলে না, যতটা সম্ভব চোখে দেখায়। এই জন্য সাধারণ সত্য বুঝাইতে সে সাধারণ লইয়াই কাজ-কারবার করে না, তাহার কাজ-কারবার সর্বদা বিশেষকে লইয়া। সাহিত্যের এ বিশেষ সব সময়ই প্রতীকধর্মী,—তাই সে একেবারে চাক্ষুষ হইয়াও বিশেষের ভিতরেই আমাদের মনকে বদ্ধ রাখিতে চায় না,—তাহার ইঙ্গিত সর্বদা সাধারণের দিকে।

প্রবন্ধ-নিবন্ধের বেলাতেও রবীন্দ্রনাথের চিন্তা সর্বদা বিশেষের ভিতরে মূর্ত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। 'লোক-সাহিত্যে'র ভিতরে পৃথিবীর শিশুমন যে কেমন করিয়া জগতের ছড়াগুলিকে সৃজন করিয়া লইয়াছে তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে খানিকটা মনোবিজ্ঞানের আলোচনা করিতে হইয়াছে। কিন্তু নিম্নোক্ত অংশটি পাঠ করিলেই আভাস পাওয়া যাইবে যে মনোবিজ্ঞানের অমূর্ত কথাগুলিকেও রবীন্দ্রনাথ কি করিয়া যথা-সম্ভব মূর্ত করিয়া তুলিয়া তাহাকে যতটা সম্ভব সাহিত্যের সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছেন।—

"স্বভাবত আমাদের মনের মধ্যে বিশ্বজগতের প্রতিবিম্ব এবং প্রতিধ্বনি ছিন্ন-বিচ্ছিন্নভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহারা বিচিত্ররূপ ধারণ করে এবং অকস্মাৎ প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে গিয়া উপনীত হয়। যেমন বাতাসের মধ্যে পথের ধূলি, পুষ্পের রেণু, অসংখ্য গন্ধ, বিচিত্র শব্দ, বিচ্ছিন্ন পল্লব, জলের শীকর, পৃথিবীর বাষ্প সর্বদাই নিরর্থকভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে আমাদের মনের মধ্যেও সেইরূপ! সেখানেও আমাদের নিত্যপ্রবাহিত চেতনার মধ্যে কত বর্ণ কত গন্ধ শব্দ, কত কল্পনার বাষ্প, কত চিন্তার আভাস, কত ভাষার ছিন্ন খণ্ড, আমাদের জগতের কত শত পরিত্যক্ত বিচ্যুত পদার্থ সকল অলক্ষিত অনাবশ্যক ভাবে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়ায়।

"যখন আমরা সচেতন ভাবে কোনও একটা বিশেষ দিকে লক্ষ্য করিয়া চিন্তা করি তখন এই সমস্ত ছায়াময়ী মরীচিকা মুহূর্তের মধ্যে অপসারিত হয়, আমাদের কল্পনা আমাদের বুদ্ধি একটা বিশেষ ঐক্য অবলম্বন করিয়া একাগ্র-ভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে। আমাদের মন নামক পদার্থটি এত অধিক প্রভুত্বশালী যে সে যখন সজাগ হইয়া বাহির হইয়া আসে, তখন তাহার প্রভাবে আমাদের অন্তর্জগতের এবং বহির্জগতের অধিকাংশই সমাচ্ছন্ন হইয়া যায়—তাহারই শাসনে, তাহারই বিধানে, তাহারই কথায়, তাহারই অনুচর পরিচ্ছদে নিখিল সংসার আকীর্ণ হইয়া থাকে। ভাবিয়া দেখ, আকাশে পাখীর

ডাক, পাতার মর্মর, জলের কল্লোল, লোকালয়ের মিশ্রিতধ্বনি, ছোট বড় কত সহস্র প্রকার কলশব্দ নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে, এবং আমাদের চতুর্দিকে কত কম্পন কত আন্দোলন কত গমন কত আগমন, ছায়া-লোকের কতই চঞ্চল লীলাপ্রবাহ প্রতিনিয়ত আবর্তিত হইতেছে,—অথচ তাহার মধ্যে কতই যৎসামান্য অংশ আমাদের গোচর হইয়া থাকে; তাহার প্রধান কারণ এই যে, ধীবরের ন্যায় আমাদের মন ঐক্যজাল ফেলিয়া একেবারে একক্ষেপে যতখানি ধরিতে পারে সেইটুকু গ্রহণ করে, বাকি সমস্ত তাহাকে এড়াইয়া যায়।”

রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক লেখা ‘বিশ্ব-পরিচয়ে’র ভিতরেও আমরা এই রচনাধর্মের পরিচয় পাই। ‘শান্তিনিকেতনে’র ভিতরে নিছক অমূর্ত তত্ত্বকেও তিনি এইরূপে মূর্ত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিযাছেন। আমাদের দেশকাল-জাত অহংটাই প্রবল হইয়া উঠিয়া কি করিয়া আমাদের আত্মার স্বচ্ছন্দ প্রকাশকে অবরুদ্ধ করিতে চায় তাহা বলিতে গিয়া লেখক বলিতেছেন,—

“নদীর ধারাটা চিরন্তন। সে পর্বতের গুহা থেকে নিঃসৃত হয়ে সমুদ্রের অঞ্চলের মধ্যে প্রবেশ করছে। সে যে ক্ষেত্রের উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে সেই ক্ষেত্র থেকে উপকরণ রাশি তার গতিবেগে আহরিত হয়ে চর বেঁধে উঠছে—কোথাও নুড়ি, কোথাও বালি, কোথাও মাটি জমছে, তার সঙ্গে নানা দেশের কত ধাতুকণা এবং জৈব পদার্থ এসে মিলছে। এই চর কত বার ভাঙছে, কতবার গড়ছে, কত স্থান ও আকার পরিবর্তন করছে। এর কোথাও বা গাছপালা উঠছে, কোথাও বা মরুভূমি। কোথাও জলাশয়ে পাখি চরছে কোথাও বা বালির উপর কুমিরের ছানা হাঁ করে পড়ে রোদ পোয়াচ্ছে।

“এই চিরপরিবর্তনশীল চরগুলিই যদি একান্ত প্রবল হয়ে ওঠে তা হ'লেই নদীর চিরন্তন ধারা বাধা পায়। ক্রমে ক্রমে নদী হয়ে পড়ে গৌণ, চরই হয়ে পড়ে মুখ্য। শেষকালে ফল্গুর মতো নদীটা একেবারেই আচ্ছন্ন হয়ে যেতে পারে।

“আত্মা সেই চিরস্রোত নদীর মতো। অনাদি তার উৎপত্তিশিখর অনন্ত তার সঞ্চার ক্ষেত্র। আনন্দই তাকে গতিবেগ দিয়েছে, সেই গতির বিরাম নেই।

“এই আত্মা যে-দেশ দিয়ে যে-কাল দিয়ে চলেছে তার গতিবেগে সেই দেশ

ও সেই কালের নানা উপকরণ সঞ্চিত হয়ে তার একটি সংস্কাররূপ তৈরী হতে থাকে। এই জিনিষটি কেবলই ভাঙছে, গড়ছে কেবলই আকার পরিবর্তন করছে।

"কিন্তু সৃষ্টি কোনো কোনো অবস্থায় সৃষ্টিকর্তাকে ছাপিয়ে উঠতে পারে। আত্মাকেও তার দেশকালজাত অহং প্রবল হয়ে উঠে অবরুদ্ধ করতে পারে। এমন হতে পারে অহংটাকেই তার স্তূপাকার উপকরণ সমেত দেখা যায়, আত্মাকে আর দেখা যায় না।"

['নদী ও কূল', শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড]

আধ্যাত্মিক 'ধ্রুবলোকে' আপনার সত্যপ্রতিষ্ঠা কি করিয়া করিতে হয় তাহা আলোচনা করিতে গিয়া কবি বলিতেছেন,—

"পৃথিবী একদিন বাষ্প ছিল, তখন তার পরমাণুগুলো আপনার তাপের বেগে বিশ্লিষ্ট হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। তখন পৃথিবী আপনার আকাব পায় নি, প্রাণ পায় নি, তখন পৃথিবী কিছুকেই জন্ম দিতে পারত না, কিছুকেই ধরে রাখতে পারত না—তখন তার সৌন্দর্য ছিল না, সার্থকতা ছিল না, কেবল ছিল তাপ আর বেগ। যখন সে সংহত হযে এক হল তখনই জগতের গ্রহ-নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে সেও একটি বিশেষ স্থান লাভ করে বিশ্বের মণিমালায় নূতন একটি মরকত মাণিক গেঁথে দিলে। আমাদের চিত্তও সেই রকম প্রবৃত্তির তাপে ও বেগে চারিদিকে কেবল যখন ছড়িয়ে পডে তখন যথার্থভাবে কিছুই পাইনে কিছুই দিইনে; যখনই সমস্তকে সংযত সংহত করে এক করে আত্মাকে পাই, যখনই আমি সত্য যে কী তা জানি, তখনই আমার সমস্ত বিচ্ছিন্ন জানা একটি প্রজ্ঞায় ঘনীভূত হয়, সমস্ত বিচ্ছিন্ন বাসনা একটি প্রেমে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে এবং জীবনের ছোটো বড়ো সমস্তই নিবিড় আনন্দে সুন্দর হয়ে প্রকাশ পায়।"

['আত্মবোধ' শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষোড়শ খণ্ড]

রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রকাবের রচনার ভিতরে অমূর্ত ভাব এবং চিন্তা উভয়কেই পাঠকের নিকটে মূর্ত করিয়া তুলিবার চেষ্টার পশ্চাতে রহিয়াছে প্রতীকধর্মী বিশেষের ভিতর দিয়া সাধারণকে ফুটাইয়া তুলিবার একটা চেষ্টা। এই প্রবণতার সহিত স্বাভাবিকভাবে যুক্ত হইয়া আছে প্রচুর উপমা এবং 'উপমানে'র (Analogy) প্রয়োগ। কথায় কথায় যে উপমা এবং 'উপমানে'র অজস্রতা রহিয়াছে, উহা রবীন্দ্রনাথের রচনায় কোন অলঙ্কার নহে, উহা

রচনার স্বধর্ম। আমাদের ভাষার ভিতর দিয়া যে পর্যন্ত আমাদের মনের ভিতরে ছবির পর ছবি ভাসিয়া উঠিতে না থাকে সে পর্যন্ত আমাদের অর্থবোধও সুস্পষ্ট নহে। একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই আমরা দেখিতে পাইব, বাহিরের কোন বস্তু বা ঘটনার প্রতিচ্ছবি ব্যতীত আমাদের কোন বোধই প্রত্যক্ষের সমকক্ষ হইয়া উঠিতে পারে না; আর প্রত্যক্ষবোধ ব্যতীত সৌন্দর্যানুভূতি বা রসানুভূতি সম্ভব নহে। এই জন্য আমাদের কথাকে যখনই আমরা ভালো করিয়া এবং সুন্দর করিয়া বলি তখনই আমরা জ্ঞাতে অজ্ঞাতে কেবল উপমা (উপমা শব্দটি আমি এখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিতেছি) গ্রহণ করিতে থাকি। প্রত্যক্ষ বস্তু বা ঘটনার প্রতিচ্ছবিতে বর্ণিত হইয়া অমূর্ত ভাব এবং চিন্তাগুলিও তখন অনেকখানি প্রত্যক্ষগুণসমন্বিত হইয়া ওঠে। রবীন্দ্রনাথের নিবন্ধ হোক, প্রবন্ধ হোক বা খাঁটি সাহিত্যিক রচনা হোক—কোথাও এই উপমাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় না, প্রকাশভঙ্গির সহজ ধর্মরূপে তাহা তাহার সমস্ত লেখায় অনন্ত প্রাচুর্যে ছড়াইয়া আছে। তৎকালীন 'স্বদেশী-সমাজে'র ('আত্মশক্তি') কথা বলিতে গিয়া লেখক বলিতেছেন।—

"কোন নদী যে-গ্রামের পার্শ্ব দিয়া বরাবর বহিয়া আসিয়াছে, সে যদি একদিন সে-গ্রামকে ছাড়িয়া অন্যত্র তাহার স্রোতের পথ লইয়া যায়, তবে সে-গ্রামের জল নষ্ট হয়, ফল নষ্ট হয়, স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, বাণিজ্য নষ্ট হয়, তাহার বাগান জঙ্গল হইয়া পড়ে, তাহার পূর্ব সমৃদ্ধির ভগ্নাবশেষ আপন দীর্ণ ভিত্তির ফাটলে ফাটলে বট-অশ্বত্থকে প্রশ্রয় দিয়া পেচক-বাদুড়ের বিহারস্থল হইয়া উঠে।

"মানুষের চিত্তস্রোত নদীর চেয়ে সামান্য জিনিস নহে। সেই চিত্তপ্রবাহ চিরকাল বাংলার ছায়া-শীতল গ্রামগুলিকে অনাময় ও আনন্দিত করিয়া রাখিয়াছিল—এখন বাংলার সেই পল্লী-ক্রোড় হইতে বাঙালির চিত্তধারা বিক্ষিপ্ত হইয়া গেছে। তাই তাহার দেবালয় জীর্ণ প্রায়—সংস্কার করিয়া দিবার কেহ নাই, তাহার জলাশয়গুলি দূষিত—পঙ্কোদ্ধার করিবার কেহ নাই, সমৃদ্ধ ঘরের অট্টালিকাগুলি পরিত্যক্ত—সেখানে উৎসবের আনন্দধ্বনি উঠে না।"

এই জাতীয় একটি উপমা ব্যতীত এত সংক্ষেপে অথচ এত সম্পূর্ণ এবং সুন্দর করিয়া 'স্বদেশী-সমাজে'র একটি বাস্তব চিত্র অঙ্কন করা সহজ হইত না।

বাঙলার জনসাধারণের সহিত হৃদয় বা মস্তিষ্ক কোনটারই যোগ না থাকায় ইংরেজি-বিদ্যায় কৃতবিদ্য বাঙালীগণ কিরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, সে সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছেন,—

"হিমালয়ের মাথার উপরে যদি উত্তরোত্তর কেবলি বরফ জমিতে থাকিত তবে ক্রমে তাহা ন দেবায় ন ধর্মায় হইত—কিন্তু সেই বরফ নির্ঝররূপে গলিয়া প্রবাহিত হইলে হিমালয়েরও অনাবশ্যক ভার লাঘব হয় এবং সেই সজীব ধারায় সুদূরপ্রসারিত তৃষাতুর ভূমি সরস শস্যশালী হইয়া উঠে। ইংরাজি বিদ্যা যতক্ষণ বদ্ধ থাকে ততক্ষণ তাহা সেই জড় নিশ্চল বরফ ভারের মত—দেশীয় সাহিত্য যোগে তাহা বিগলিত প্রবাহিত হইলে তবে সেই বিদ্যারও সার্থকতা হয়, বাঙালির ছেলের মাথাও ঠিক থাকে, এবং স্বদেশের তৃষ্ণাও নিবারিত হয়।"

['বাংলা জাতীয় সাহিত্য', সাহিত্য]

উপমাটি একদিকে যেমন অর্থঘন, তেমনই একটি প্রচ্ছন্ন পরিহাসের ব্যঞ্জনাযুক্ত। নীরস কর্তব্য যে মানুষের জীবনে পদে পদে কিরূপ বন্ধন হইয়া ওঠে 'রসের ধর্ম' লেখাটির একটি উপমায় তাহার বর্ণনা সার্থক এবং সরস হইয়া উঠিয়াছে।—

'একটা বরফের পিণ্ড এবং ঝরণার মধ্যে তফাত কোন্‌খানে। না, বরফের পিণ্ডের নিজের মধ্যে গতিতত্ত্ব নেই। তাকে বেঁধে টেনে নিয়ে গেলে তবেই সে চলে। সুতরাং চলাটাই তার বন্ধনের পরিচয়। এই জন্যে বাইরে থেকে তাকে ঠেলা দিয়ে চালনা করে নিয়ে গেলে প্রত্যেক আঘাতেই সে ভেঙে যায়, তার ক্ষয় হতে থাকে—এইজন্য চলা ও আঘাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে স্থির নিশ্চল হয়ে থাকাই তার পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থা।

"কিন্তু ঝরণার যে গতি সে তার নিজেরি গতি,—সেইজন্যে এই গতিতেই তার ব্যাপ্তি, মুক্তি, তার সৌন্দর্য। এইজন্য গতিপথে সে যত আঘাত পায় ততই তাকে বৈচিত্র্য দান করে। বাধায় তার ক্ষতি নেই, চলায় তার শ্রান্তি নেই।'

মানুষের মধ্যেও যখন রসের আবির্ভাব না থাকে, তখনি সে জড়পিণ্ড। তখন ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয় ভাবনাই তাকে ঠেলে ঠেলে কাজ করায়, সে কাজে পদে পদেই তার ক্লান্তি। সে নীরস অবস্থাতেই মানুষ অন্তরের নিশ্চলতা থেকে বাহিরেও কেবলি নিশ্চলতা বিস্তার করতে থাকে। তখনি তার যত খুঁটিনাটি,

যত আচার বিচার, যত শাস্ত্র শাসন। তখনি মানুষের মন গতিহীন বলেই বাহিরেও সে আষ্টে পৃষ্ঠে বদ্ধ।"

[শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চদশ খণ্ড।]

রবীন্দ্রনাথের এমন দু'একটি রচনা রহিয়াছে যেখানে শুধু উপমার প্রয়োগে অনেকখানি বক্তব্যকে একটি কঠিন বন্ধনে ঘনীভূত করিয়া তোলা হইয়াছে। এখানে কল্পনার তৎপরতা এবং স্থিতিস্থাপকতা যেমন তাহার অনন্য-সাধারণতার জন্য একটা বিস্ময় সৃষ্টি করে, তেমনি তাহার সাহায্যে বক্তব্যের ভিতরে প্রতিপদে যে ইঙ্গিত আসিয়া অর্থকে গভীর হইতে গভীর—ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর করিয়া তোলে তাহার মহিমাও কম নয়। 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র 'লাইব্রেরী' রচনাটির প্রথমাংশের ভিতরে আমরা রবীন্দ্রনাথের এই লিখন-ভঙ্গিটি দেখিতে পাই।

"মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটীর মত চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ইহারা সহসা যদি বিদ্রোহী হইয়া উঠে, নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া ফেলে, অক্ষরের বেড়া দগ্ধ করিয়া একেবারে বাহির হইয়া আসে। হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত কত বন্যা কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে!"

এমনি করিয়া শুধু উপমার পর উপমা দিয়াই লেখক তাহার বক্তব্যকে সুষ্ঠুরূপে প্রকাশ করিয়াছেন!"

রবীন্দ্রনাথের গদ্য-রচনা উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে আরেকটি গুণে, উহা তাঁহার সূক্ষ্ম 'রসিকতা'। রবীন্দ্রনাথের রসিকতার বৈশিষ্ট্য এই যে, সে রচনার ভিতরে যেখানে আসে সেখানে সাড়ম্বরে আগেপিছে তোলপাড় করিয়া আসে না,—অনাড়ম্বর নিঃশব্দে আসিয়া ক্ষণ-ঝলকে রচনাটিকে স্নিগ্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের হাস্যরসের সূক্ষ্মত্ব এইখানে যে, পাঠকমনের সচেতনতায় সর্বদা তাহার আস্বাদন নহে, অচেতনে তাহার আস্বাদন রচনার অর্থবোধের ভিতরে আনন্দ ও ঔজ্জ্বল্যের মহিমা আনিয়া দেয়। রবীন্দ্রনাথের হাস্যরসের আরও বৈশিষ্ট্য এই, বুদ্ধির সম্বরায় ইহাকে অনেক সময়ে বেশ কড়াপাক দিয়া স্বাদবৈচিত্র্য ঘটান হইয়াছে। ফলে আস্বাদনের বেলায় অপটু

জিহ্বার শিথিল লেহনেই ইহার সবটুকু গ্রহণ করা যায় না,—ইহাকে গ্রহণ করিবার জন্য রুচির একটা অনুশীলনজনিত বৈদগ্ধ্যের প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথের রচনায় ইউরোপীয় বিদ্রূপাত্মক হাস্যরস বা 'স্যাটায়ার' কম; তাহার কারণ ইউরোপীয় অর্থে 'স্যাটায়ারিষ্ট' হইতে হইলে জীবনের পারিপার্শ্বিকতা সম্বন্ধে যতখানি নৈরাশ্যবাদী হওয়া দরকার রবীন্দ্রনাথ ততখানি নৈরাশ্যবাদী কখনও হইয়া ওঠেন নাই। মূলতঃ রবীন্দ্রনাথ ঘোর আশাবাদী,—সুতরাং বর্তমানের নৈরাশ্য অনভ্যুত্থিত মেঘের মত তাঁহার চিত্তে ফেলিতে না ফেলিতেই আবার উড়িয়া চলিয়া গিয়াছে,—অথবা সে মেঘ যেখানে একটু দীর্ঘস্থায়ী হইতে চাহিয়াছে ভবিষ্যতের মঙ্গল আলোকের রশ্মি তাহার উপরে প্রতিফলিত করিয়া কবি সেই মেঘের উপরেই ইন্দ্রধনুর বর্ণচ্ছটা উদ্ভাসিত করিয়াছেন। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ খুব বড়দরের 'স্যাটায়ারিষ্ট' নহেন। তাঁহার পারিপার্শিকতার ভিতরে দুইটি জিনিশ দুই দিক হইতে আসিয়া একটা বেসুরের বেদনায় তাঁহাকে পীড়িত করিতেছিল; এই দুই দিকেই তাঁহার বিদ্রূপের খোঁচা যা কিছু বর্ষিত হইয়াছে। দুইটি জিনিসের একটি হইল আমাদের প্রাচীন ধর্ম, সমাজ, সভ্যতা ও শিক্ষার সেই অংশটা যেটা বহুকাল একটা বাঁধা পথে আবর্তিত হইয়া তাহার প্রাণবস্তুকে একেবারেই হারাইয়া ফেলিয়াছিল, গতিশীল সহজ জীবনের সহিত যুক্ত না হইয়া প্রতিপদে বন্ধনের সৃষ্টি করিতেছিল; অপরটি হইল পাশ্চাত্ত্য হইতে আমদানী নূতন ধর্ম, সমাজ, সভ্যতা ও শিক্ষার আদর্শ ও পদ্ধতি যাহা এদেশের মাটি এবং জল-বায়ু, আকাশ-আলোর সহিত নিবিড়ভাবে যুক্ত হইতে না পারায় এক দিকে একটা কাজে-না-লাগা দুর্বহ এবং দুর্দান্ত ভার হইয়া উঠিতেছিল,—অন্যদিকে কতগুলি শিকড়হীন পরগাছা জঞ্জাল সৃষ্টি করিতেছিল। কিন্তু আমাদের সেই প্রাচীন ধর্ম, সমাজ, সভ্যতা, শিক্ষা, এবং নবাগত পাশ্চাত্ত্য ধর্ম, সমাজ, সভ্যতা, শিক্ষা—এই দুইয়ের ভিতরেই রবীন্দ্রনাথ নৈরাশ্যের মেঘ অপেক্ষা আশার আলো দেখিতে পাইয়াছিলেন বেশী। উভয়ের ভিতরকার মঙ্গলময় অংশটা তাঁহার অন্তর্দৃষ্টিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবার জন্য অমঙ্গলের অংশটার উপর তাঁহার কশাঘাত কোথাও অতি তীব্র নহে। তাই তাঁহার ধর্ম, সমাজ ও শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধগুলির ভিতরে স্থানে স্থানে যে বিদ্রূপ এবং পরিহাস রহিয়াছে তাহাও কোথাও তীব্রহুলযুক্ত নহে,—মৃদু এবং স্নিগ্ধ। স্মৃতি-নিয়ন্ত্রিত হিন্দুধর্মে পাপ-প্রকরণও যেমন অসংখ্য, তাহাকে দূরে ঠেকাইয়া

রাখিবার প্রায়শ্চিত্তবিধিও প্রচুর; আবার এই প্রায়শ্চিত্তের প্রাচুর্যকে সংক্ষিপ্ত করিয়া পাইকারী পাপস্খালনের বিধানেরও কিছু অপ্রতুলতা নাই। এই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন,—

"...অত্যন্ত বৃহৎ ভিড়ের ভিতর শ্রেণীবিচার দুরূহ হইয়া উঠে। অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করা, এবং সমুদ্রযাত্রা হইতে নরহত্যা পর্যন্ত সকল পাপই আমাদের দেশে গোলে হরিবোল দিয়া মিশিয়া পড়ে!

"পাপখণ্ডনেরও তেমনই শত শত সহজ পথ আছে। আমাদের পাপের যেমন দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া উঠে, তেমনই যেখানে সেখানে তাহা ফেলিয়া দিবারও স্থান আছে। গঙ্গায় স্নান করিয়া আসিলাম, অমনি গাত্রের ধূলা এবং ছোটো বড়ো সমস্ত পাপ ধৌত হইয়া গেল। যেমন রাজ্যে বৃহৎ মড়ক হইলে প্রত্যেক মৃতদেহের জন্য ভিন্ন ভিন্ন গোর দেওয়া অসাধ্য হয়, এবং আমির হইতে ফকির পর্যন্ত সকলকে রাশীকৃত করিয়া এক বৃহৎ গর্তের মধ্যে ফেলিয়া সংক্ষেপে অন্ত্যেষ্টি-সৎকার সারিতে হয়, আমাদের দেশে তেমনই খাইতে শুইতে উঠিতে বসিতে এত পাপ যে প্রত্যেক পাপের স্বতন্ত্র খণ্ডন করিতে গেলে সময়ে কুলায় না; তাই মাঝে মাঝে একেবারে ছোটো বড়ো সকলগুলোকে কুড়াইয়া অতি সংক্ষেপে এক সমাধির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া আসিতে হয়।"

['আচারের অত্যাচার', সমাজ]

ইহা শুধু ঘটনার যথাযথ বিবরণ নহে—একটা বিদ্রূপ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, কিন্তু তাহাতে তীব্রতা নাই, এ বিদ্রূপ স্মিতপরিহাসে রচনাকে সরস করিয়া তুলিয়াছে মাত্র। রবীন্দ্রনাথের পরিহাস প্রায় সর্বত্রই এইরূপ অনেকখানি স্মিতহাস্যেরই প্রকারান্তর হইয়া উঠিয়াছে—স্থানে স্থানে একটু মসলার ঝাঁজ মিশান মাত্র। বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির সমালোচনায় কবি বলিয়াছেন,—

"কাজেই বিধির বিপাকে বাঙালীর ছেলের ভাগ্যে ব্যাকরণ অভিধান এবং ভূগোল বিবরণ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। বাঙালীর ছেলের মতো এমন হতভাগ্য আর কেহ নাই। অন্য দেশের ছেলেরা যে-বয়সে নবোদ্গত দন্তে আনন্দ মনে ইক্ষু চর্বন করিতেছে, বাঙালীর ছেলে তখন ইস্কুলের বেঞ্চির উপর কোঁচা সমেত দুইখানি শীর্ণ খর্ব চরণ দোদুল্যমান করিয়া শুদ্ধমাত্র বেত হজম করিতেছে, মাষ্টারের কটু গালি ছাড়া তাহাতে আর কোনোরূপ মসলা মিশান নাই।"

['শিক্ষার হেরফের', শিক্ষা]

ইহা ঠিক 'স্যাটায়ার' নহে—একটি সরস জীবন্ত চিত্রের ভিতরে যে পরিহাসের ব্যঞ্জনা রহিয়াছে তাহার ভিতরে গঞ্জনার তীব্রতা নাই।

রবীন্দ্রনাথের রচনায় হাস্যরসের ভিতর সর্বত্রই যে বুদ্ধির কড়াপাক রহিয়াছে তাহা নহে; কথা বলিতে বলিতে খোলা মনের মৃদুপ্রশান্ত হাসিতে কথাগুলিকে মনোরম করিয়া দিবার দৃষ্টান্তও একান্ত দুর্লভ নহে। 'যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে' প্রভৃতি ছেলে-ভুলানো ছড়ার আলোচনা প্রসঙ্গে কবি বলিতেছেন,—

"যমুনাবতী সরস্বতী যিনিই হউন আগামীকল্য যে তাঁহার শুভবিবাহ সে কথার স্পষ্টই উল্লেখ দেখা যাইতেছে। অবশ্য বিবাহের পর যথাকালে কাজি-তলা দিয়া যে তাঁহাকে শ্বশুরবাড়ী যাইতে হইবে সে কথা আপাতত উত্থাপন না করিলেও চলিত; যাহা হউক তথাপি কথাটা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক হয় নাই। কিন্তু বিবাহের জন্য কোনো প্রকার উদ্‌যোগ অথবা সে জন্য কাহারও তিলমাত্র ঔৎসুক্য আছে এমন কিছুই পরিচয় পাওয়া যায় না। ছড়ার রাজ্য তেমন রাজ্যই নহে। সেখানে সকল ব্যাপারই এমন অনায়াসে ঘটিতে পারে এবং এমন অনায়াসে না ঘটিতেও পারে যে, কাহাকেও কোনো কিছুর জন্যই কিছুমাত্র দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বা ব্যস্ত হইতে হয় না। অতএব আগামী কল্য শ্রীমতী যমুনাবতীর বিবাহের দিন স্থির হইলেও সে ঘটনাকে কিছুমাত্র প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। তবে সে-কথাটা আদৌ কেন উত্থাপিত হইল তাহার জবাবদিহির জন্যও কেহ ব্যস্ত নহে। কাজি-ফুল যে কী ফুল আমি নগরবাসী তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না কিন্তু ইহা স্পষ্ট অনুমান করিতেছি যে যমুনাবতী নামক কন্যাটির আসন্ন বিবাহের সহিত উক্ত পুষ্পসংগ্রহের কোনো যোগ নাই। এবং হঠাৎ মাঝখান হইতে সীতারাম কেন যে হাতের বলয় এবং পায়ের নূপুর ঝুমুঝুম করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল আমরা তাহার বিন্দু-বিসর্গ কারণ দেখাইতে পারিব না। আলোচালের প্রলোভন একটা মস্ত কারণ হইতে পারে, কিন্তু সেই কারণ আমাদিগকে সীতারামের আকস্মিক নৃত্য হইতে ভুলাইয়া হঠাৎ ত্রিপূর্ণির ঘাটে আনিয়া উপস্থিত করিল। সেই ঘাটে দুটি মৎস্য ভাসিয়া উঠা কিছু আশ্চর্য নহে বটে, কিন্তু বিশেষ আশ্চর্যের বিষয় এই যে দুটি মৎস্যের মধ্যে একটি মৎস্য যে-লোক লইয়া গেছে তাহার কোনরূপ উদ্দেশ্য না পাওয়া সত্ত্বেও আমাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রচয়িতা কী কারণে তাহারই ভগিনীকে বিবাহ করিবার জন্য হঠাৎ স্থির-সংকল্প হইয়া বসিলেন, অথচ

প্রচলিত বিবাহের প্রথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া একমাত্র ওড়ফুল সংগ্রহ দ্বারাই শুভকর্মের আয়োজন যথেষ্ট বিবেচনা করিলেন এবং যে লগ্নটি স্থির করিলেন তাহাও নূতন অথবা পুরাতন কোনো পঞ্জিকাকারের মতেই প্রশস্ত নহে।"

['ছেলে ভুলানো ছড়া,' লোক সাহিত্য]

শিশুর সমস্ত খামখেয়ালী আচরণের ভিতরে যেমন একটা নির্মল কৌতুক রহিয়াছে এই ছেলেভুলানো ছড়াগুলির ভিতরেও সেই জাতীয় একটা অসংলগ্নতার কৌতুক রহিয়াছে; কবি তাঁহার আলোচনায় ছড়াটি হইতে সেই নির্মল কৌতুকটুকুই নিপুন দোগ্ধার ন্যায় দোহন করিয়া আনিয়া আমাদিগকে পরিবেশন করিয়াছেন।

উপরে রবীন্দ্রনাথের নিবন্ধ-প্রবন্ধ জাতীয় লেখা সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইয়াছে উহা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সমালোচনা জাতীয় লেখা সম্বন্ধেও প্রযোজ্য; কিন্তু এই জাতীয় লেখার ভিতরে আর একটি বিশেষ লক্ষণীয় উপাদান রহিয়াছে। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, সাহিত্যিক রচনার ভিতরে সর্বদাই একটা 'রচন' বা সৃষ্টি-কার্য রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ আজন্ম স্রষ্টা—এই সাহিত্য-সমালোচনার ভিতরেও তাঁহার একটা স্রষ্টা রূপ রহিয়াছে; তাঁহার লোক-সাহিত্যের সমালোচনায় এবং প্রাচীন সাহিত্যের সমালোচনায় তাঁহার সমালোচক রূপ হইতে স্রষ্টা রূপই স্থানে স্থানে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। লোক-সাহিত্যের আলোচনার কথাই ধরা যাক্। রবীন্দ্রনাথ কী এখানে শুধু বৈজ্ঞানিকসুলভ বিশ্লেষণের দ্বারাই লোকসাহিত্যের সৌন্দর্য-মাধুর্য বুঝাইতে চাহিয়াছেন? একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, সকল বিশ্লেষণের পশ্চাতে রবীন্দ্রনাথের একটা সাঙ্ঘটিক বা সামগ্রিক রসদৃষ্টি রহিয়াছে; লোক-সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের মনের ভিতরে আসিয়া তাঁহার হৃদয়বৃত্তির জারক-রসে জারিত হইয়া একটি রসঘন নূতন রূপ গ্রহণ করিয়াছিল; সেই অখণ্ড রসঘন রূপটিকে পটভূমিকায় রাখিয়া বিশ্লেষণের অছিলায় কবি সেই লোক-সাহিত্যকে অনেকখানি নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণে লোক-সাহিত্যের যে সৌন্দর্য মাধুর্য প্রস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে তাহার সবটুকু যে তাঁহার সংগৃহীত এবং আলোচিত লোক-সাহিতের টুকরাগুলির ভিতরে নিহিত ছিল একথা বলিতে পারি না—ইহার ভিতরে রবীন্দ্রনাথের নিজের দানও রহিয়াছে অনেক।

'প্রাচীন সাহিত্যে' 'মেঘদূত' বিষয়ে যে লেখাটি রহিয়াছে আমরা তাহাকে

সম্পূর্ণটাই রচনা বলিব। আষাঢ়ে প্রথম দিবসের মেঘগুলি কালিদাসের মনের ভিতরে গিয়া 'মেঘদূত' কাব্যে নূতনরূপে সৃষ্টিলাভ করিয়াছিল; 'মেঘদূত' কাব্যখানি ঠিক সেইরূপ রবীন্দ্রনাথের মনের ভিতরে প্রবেশ করিয়া আর একটি নূতন কাব্যরূপ গ্রহণ করিয়াছিল—সেই 'নবমেঘদূতে'রই প্রকাশ গদ্যে 'মেঘদূত' রচনায়, পদ্যে 'মেঘদূত' কবিতায় ('মানসী')। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'মেঘদূত' রচনায় বলিয়াছেন,—

"……আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাই, সে আপনার মানস সরোবরের অগম তীরে বাস করিতেছে, সেখানে কেবল কল্পনাকে পাঠানো যায়, সেখানে সশরীরে উপনীত হইবার কোন পথ নাই। ·····"

"হে নির্জন গিরিশিখরের বিরহী, স্বপ্নে যাহাকে আলিঙ্গন করিতেছ, মেঘের মুখে যাহাকে সংবাদ পাঠাইতেছ, কে তোমাকে আশ্বাস দিল যে, এক অপূর্ব সৌন্দর্যলোকে শরৎপূর্ণিমারাত্রে তাহার সহিত চিরমিলন হইবে।……"

আমাদের মন লইয়া কালিদাসের 'মেঘদূত' পড়িতে বসিয়া আমরা কোথায়ও এ-কথার কোন আভাস পাই নাই। কালিদাসের 'মেঘদূতে' কোথাও 'অতল-স্পর্শ বিরহ' রহিয়াছে বলিয়াই মনে হয় না; আমাদের মতে কালিদাসের 'মেঘদূত' বিরহের কাব্য নহে, সম্ভোগের কাব্য। বিরহ ওখানে অনেকখানি বিলাস, বিরহকে উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া কবির লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছে একটা বিরাট সম্ভোগের রস—সে রসের ব্যাপ্তি শুধু মানুষের ভিতর নয়, চেতন-অচেতন পরিপূর্ণ বিশ্বপ্রকৃতির প্রত্যেক লীলায় যেন সে সম্ভোগ অতি সুকুমার রূপে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই 'মেঘদূত'কে লইয়া চলিয়া গিয়াছেন তাঁহার আপন কল্পরাজ্যে; সেখানে তাঁহার 'মানস-সরোবরের অগম তীরে' রহিয়াছে পরম দয়িত এবং আপনার ভিতরে রহিয়াছে অতলস্পর্শ বিরহ—সেই গভীর বিরহের ভিতরে তিনি ক্ষণে ক্ষণে অনুভব করিয়াছেন এই আশ্বাস যে, 'এক অপূর্ব সৌন্দর্যলোকে শরৎপূর্ণিমা রাত্রে তাঁহার সহিত চির-মিলন হইবে'—এই সকল দিয়াই তিনি এক নূতন 'মেঘদূত' সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন।

'কাব্যের উপেক্ষিতা' কি সাহিত্য-সমালোচনা না সাহিত্য-সৃষ্টি? উর্মিলা, অনসূয়া-প্রিয়ম্বদা এবং পত্রলেখাকে রামায়ণ, অভিজ্ঞান-শকুন্তল এবং কাদম্বরী কাব্যে যথেষ্ট এবং যথোপযুক্ত স্থান না দিয়া বাল্মীকি, কালিদাস এবং বাণভট্ট উঁহাদের প্রতি যে উপেক্ষা দেখাইয়াছেন তাহাতে কাব্যের দিক হইতে ঐ

সকল কাব্যের যে কি মহৎ দোষ ঘটিয়াছে রবীন্দ্রনাথ সে সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা বলেন নাই,—তিনি শুধু এই সকল কাব্যের উপেক্ষিতা কয়েকটি নারীকে প্রাচীন কাব্যের যজ্ঞভূমি হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহার হৃদয়ভূমিতে স্থাপন করিয়া তাহাদের সম্ভাব্য নারীরূপকে রক্তমাংসে বাস্তব করিয়া তুলিয়াছেন। ঊর্মিলা যে কাব্যের উপেক্ষিতা একথা বাল্মীকির রামায়ণ পাঠ করিবার কালে এখনও তেমন মনে হয় না, তাহার উপেক্ষিতা সকরুণ মূর্তি প্রত্যক্ষ হইয়া ওঠে শুধু রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়িয়া; তাই আমরা বলিব, রবীন্দ্রনাথ এই সকল নারীমূর্তিকে তাঁহার 'রচনা'য় নূতন করিয়া 'রচনা' করিয়া লইয়াছেন।

এইরূপে 'প্রাচীন-সাহিত্য', 'কুমার-সম্ভব', 'শকুন্তলা', 'কাদম্বরী' প্রভৃতি সম্বন্ধও যে আলোচনা রহিয়াছে তাহার ভিতরে সবটাই সাহিত্যিক আলোচনা-মাত্র নহে, ইহার ভিতরে রবীন্দ্রনাথের নিজেরও বহু সৃষ্টি রহিয়াছে।

প্রাচীন সাহিত্যের সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ কেবলই যে প্রাচীন সাহিত্যকে নূতন নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন তাহার একটা প্রধান কারণ এই যে, রবীন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ রোম্যান্টিক কবি। রোম্যান্টিক মনের কাছে দূরত্বের অস্পষ্ট আবরণে রহস্যময় অতীত সর্বদাই মহিমান্বিত। অতীতের এই মহিমা থাকে হয়ত বস্তুর ভিতরে, কিছুটা সৃষ্টি করিয়া লয় বর্তমানবিমুখ কবির ভাবুক চিত্ত। প্রাচীনের সম্বন্ধে যখনই তাই রবীন্দ্রনাথ কথা বলিয়াছেন, মনের জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে প্রাচীনকে তিনি নিজের মনের মধ্যে অনেকখানি নূতন করিয়া লইয়াছেন। প্রাচীন তপোবন সম্বন্ধে কবি যেখানে আলোচনা করিয়াছেন (দ্র° 'আশ্রম', শান্তিনিকেতন, ৯) সেখানে প্রাচীন তপোবনের মহিমার ভিতরে কবি আরও অনেক মহিমা সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন। অনেক সময় এই জাতীয় লেখার ভিতরে বিষয়বস্তু অপেক্ষা কবি-মানসটিই আমাদের কাছে বড় হইয়া ওঠে—যেমন 'ভারতবর্ষ', প্রবন্ধ-গ্রন্থের অন্তর্গত 'মন্দির' রচনাটি। উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের মন্দির অবলম্বন করিয়া রচিত হইলেও ভুবনেশ্বরের মন্দিরের বাহ্য পরিচয় ইহার ভিতরে প্রায় নাই বলিলেই হয়,—কবি এই নীরব মন্দিরের ভিতরে একটি বহু শতাব্দীর স্তম্ভিত ভাষা আবিষ্কার করিয়াছিলেন,—কবিমনের সেই আবিষ্কারের পরিচয়ই এখানে প্রধান।*

রবীন্দ্রনাথের আত্ম-বিষয়ক লেখার ভিতরে 'জীবন-স্মৃতি'ও সাহিত্যিক রচনা। রবীন্দ্রনাথ ইহার ভিতরে তাঁহার ভিতরকার ঐতিহাসিক পুরুষটির

* এই রচনাটির সহিত বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কোণারক মন্দির' রচনাটি বিশেষভাবে তুলনীয়

উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে নির্ভুল তথ্যাদির সমাবেশ করিয়া একটি দলিল-মাফিক জীবনী প্রস্তুত করিতে কোথায়ও ব্যস্ত নহেন, জীবনের টুকরা টুকরা স্মৃতিগুলি মনের পটে ভিড় করিয়া রঙেরসে একটি রহস্যময় জীবন-চিত্র গড়িয়া তুলিয়াছে। নিপুণ সাহিত্যিক কলা-কৌশলের ভিতর দিয়া কবি সেই রহস্যময় জীবনের চিত্রটি আঁকিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 'জীবন-স্মৃতি'র রবীন্দ্রনাথ সবটা ঐতিহাসিক রবীন্দ্রনাথ নহেন,—সে 'রবীন্দ্রনাথ' কবি রবীন্দ্রনাথের মনোভূমিতে জন্মগ্রহণ করা এক 'রবীন্দ্রনাথ', উভয়ের ভিতরে ঘনিষ্ঠযোগ যতই থাক, উভয়ে অভিন্ন নহেন।

স্মৃতির ভিতর দিয়া পরিণত বয়সে আমরা যখন আমাদের জীবনকে আস্বাদন করি তখন অতীত জীবনের সহিত আমরাই আমাদিগকে একেবারে মিলাইয়া লই না—পরিণত জীবনের সকল ভালোলাগা মন্দলাগা লইয়া আমরা তখন দ্রষ্টা—আর অতীত জীবনটা সেখানে বিশ্বসৃষ্টির হাজারো রকমের রহস্যময় দৃশ্যের সহিত তুল্যযোগে একটা দৃশ্য হইয়া ওঠে। এইজন্য আমরা বর্তমানের আমি হইতে যত অতীতের দূরে চলিয়া যাই, দূরের মায়ায় অতীত জীবন ততই রহস্যে ভরপুর হইয়া ওঠে,—আলো-আঁধারের মাঝখানে ঈষৎ উদ্ভিন্ন শৈশবের আমিকে যেন আর চেনাই যায় না—'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব' সে শুধু মনের পটে ঘুরিয়া বেড়ায়। কোন বড় কবির পক্ষে জীবন-স্মৃতি তাই কখনও জীবন হইতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই 'জীবন-স্মৃতি'র প্রারম্ভে বলিয়াছেন,—

"স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু যেই আঁকুক সে ছবিই আঁকে। অর্থাৎ যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহার অবিকল নকল রাখিবার জন্য সে তুলি হাতে বসিয়া নাই।......

"এইরূপে জীবনের বাহিরের দিকে ঘটনার ধারা চলিয়াছে, আর ভিতরের দিকে সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকা চলিতেছে। দুয়ের মধ্যে যোগ আছে অথচ দুই ঠিক এক নহে।

"......মনে করিয়াছিলাম, জীবন-বৃত্তান্তের দুই চারিটা মোটামুটি উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ক্ষান্ত হইব। কিন্তু দ্বার খুলিয়া দেখিতে পাইলাম, জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে—তাহা কোন এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা। তাহাতে নানা জায়গায় যে নানা রঙ পড়িয়াছে তাহা বাহিরের প্রতিবিম্ব নহে, সে রঙ তাহার নিজের ভাণ্ডারের; সে রঙ তাহাকে নিজের

রসে গুলিয়া লইতে হইয়াছে—সুতরাং পটের উপর যে ছাপ পড়িয়াছে তাহা আদালতের সাক্ষ্য দিবার কাজে লাগিবে না।

"……জীবনের প্রভাতে যে সকল শহর এবং মাঠ, নদী এবং পাহাড়ের ভিতর দিয়া চলিতে হইয়াছে, অপরাহ্নে বিশ্রামশালায় প্রবেশের পূর্বে যখন তাহার দিকে ফিরিয়া তাকানো যায় তখন আসন্ন দিবাবসানের আলোকে সমস্তটা ছবি হইয়া চোখে পড়ে। পিছন ফিরিয়া সেই ছবি দেখার যখন অবসান ঘটিল, সে দিকে একবার যখন তাকাইলাম, তখন তাহাতেই মন নিবিষ্ট হইয়া গেল।

… .. …

"এই স্মৃতির মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার যোগ্য; কিন্তু বিষয়ের মর্যাদার উপরই যে সাহিত্যের নির্ভর তাহা নহে; যাহা ভালো করিয়া অনুভব করিয়াছি তাহাকে অনুভবগম্য করিয়া তুলিতে পারিলেই মানুষের কাছে তাহার আদর আছে। নিজের স্মৃতির মধ্যে যাহা চিত্ররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাকে কথার মধ্যে ফুটাইতে পারিলেই তাহা সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য।"

এই হিসাবেই 'জীবন-স্মৃতি' যথার্থ সাহিত্যিক রচনারূপে স্থান পাইবার যোগ্য। লেখক এখানে ছবি আঁকিয়াছেন বেশী—কথা বলিয়াছেন কম। অন্ততঃ শৈশব এবং বাল্যস্মৃতিগুলি শুধু চিত্রের পর চিত্রে ফুটিয়াছে। এই চিত্রগুলিও যে সর্বদা পরস্পরের সহিত আঙ্গাঙ্গিভাবে অন্বিত তাহা বলা যায় না, কতগুলি ছবি আত্ম-সম্পূর্ণ—তাহাদিগকে পৃথক করিয়া ফ্রেম আঁটিয়া রাখা যায়। ইহার ভিতরে আত্ম-সৃষ্টি আছে—আত্ম-প্রকাশ আছে, আর আছে একটা সহজ কৌতুক-প্রিয়তা যাহা রবীন্দ্রনাথের সাধারণ বাগ্‌-বৈশিষ্ট্য; তাই 'জীবন-স্মৃতি' পড়িতে পড়িতে মনের অজ্ঞাতে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য ক্ষণে ক্ষণে অনুভব করা যায়।

'শান্তি-নিকেতনে'র লেখাগুলি অধিকাংশই ধর্মোপলব্ধি ও ধর্মব্যাখ্যামূলক হইলেও অন্যান্য বিবিধ বিষয়ক লেখাও ইহার ভিতরে রহিয়াছে। ইহার অধিকাংশই আচার্যরূপে রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ। 'শান্তি-নিকেতনে'র লেখাগুলির সব না হইলেও অনেকগুলি যে সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে তাহার মূল কারণ, কবি রবীন্দ্রনাথ এবং আচার্য রবীন্দ্রনাথের ভিতরে কোথাও কোনো দ্বৈতত্বের লেশ মাত্র নাই। সমগ্র জীবন রবীন্দ্রনাথ যেভাবে কাব্যানুপ্রেরণা

লাভ করিয়াছিলেন ঠিক সেই ভাবেই ধর্মানুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন; তাঁহার কাব্যানুপ্রেরণা এবং ধর্মানুপ্রেরণার ভিতরে সজাতীয় ভেদ থাকিতে পারে, কোন বিজাতীয় ভেদ নাই। আর রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জীবন ধরিয়া কেবল সাহিত্যের পুথি-পত্র পড়িয়াই বড় কবি হন নাই—সাহিত্যের সকল প্রেরণা এবং উপাদান তিনি লাভ করিয়াছেন বিশ্ব-সৃষ্টি—বিশ্ব-জীবনের ভিতর হইতে; বিশ্ব-জীবন হইতে তিনি যে কাব্য-সত্য লাভ করিয়াছিলেন দেশ-বিদেশের সকল কাব্য ও কাব্যশাস্ত্রের ভিতরে তাহার সায় মিলিয়াছিল বলিয়া এই উভয়েই পরস্পরের অনুপূরক হইয়া উঠিয়াছিল। ধর্মের বেলাও ঘটিয়াছে ঠিক তাহাই। কোনও শাস্ত্র পড়িয়া রবীন্দ্রনাথের ধর্ম-জীবন গড়িয়া ওঠে নাই, তাঁহার ধর্মজীবনের সত্য অধিকাংশ সংগৃহীত বিশ্ব-জীবন হইতে। জীবনের সেই সত্যানুভূতির সহিত প্রাচীন সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণের অনুভূতির যেখানে সায় মিলিয়াছে, সেইখানেই শাস্ত্র রবীন্দ্রনাথের কাছে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। বাল্যে রবীন্দ্রনাথ প্রথম যেদিন 'জল পড়ে, পাতা নড়ে' এই ছন্দোযুক্ত চিত্রটির ভিতর দিয়া একটি নূতন জগতের মধ্যে একটি নূতন সত্য অনুভব করিয়াছিলেন, সে সত্যানুভূতিকে আমরা কাব্যানুভূতি বলিব না ধর্মানুভূতি বলিব? 'গীতাঞ্জলি' সু-কাব্য না সু-ধর্ম? ওটা দুই-ই। আমাদের অন্তরের কোন গভীর অনুভূতিই কখনও গায়ে স্পষ্ট কোন রঙ মাখিয়া আসে না—তাহার ভিতরে একটা নির্বিকল্পত্ব থাকে,—অত স্পষ্ট রূপ এবং রঙ দুইটাই আমরা নিজেরা দিয়া লই। এইজন্যই উপনিষদে ব্রহ্মাস্বাদের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে প্রিয়া-মিলনের দৃষ্টান্ত।

রবীন্দ্রনাথের 'শান্তি-নিকেতনে'র ব্যাখ্যানমূলক লেখাগুলি মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথের ব্যাখ্যানমূলক লেখার সহধর্মী,—ভাবের দিক হইতেও বটে, লেখার ধরণের দিক হইতেও বটে; এক্ষেত্রে পুত্রের উপর পিতার প্রভাব থাকাই স্বাভাবিক। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের লেখার আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়াছি, নিজের ধর্মমতের ব্যাখ্যায় উপনিষদই ছিল তাঁহার অবলম্বন। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তাহাই। উপনিষদগুলির একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, পরবর্তী কালের হিন্দু-দার্শনিক মতবাদগুলি মুখ্যতঃ এই উপনিষদকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিলেও কোন একটি বিশেষ মতবাদই উপনিষদের শ্লোকগুলিকে একটা বিশেষ বেড়াজালে বাঁধিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহার কারণ, এই উপনিষদের ধর্ম মানুষের বুদ্ধির খাঁচায় ধৃত নহে,—অসীম বিশ্ব-নিখিলে ভ্রাম্যমান তাহার চির-

স্বাধীন রূপ,—মানুষের নির্মল হৃদয়ে শুধু ক্ষণে ক্ষণে তাহারই অনুভূতির ছোঁওয়া লাগিয়াছে। এইখানেই উপনিষদের সহিত রবীন্দ্রনাথের মনের গভীর মিল। রবীন্দ্রনাথও সত্য বা ধর্মকে কোন মতবাদের খাঁচায় পুরিয়া বিচার-তর্কের দ্বারা একেবারে মাপিয়া-জুপিয়া তুলিতে চাহেন নাই; জীবনের সত্য—জীবনের ধর্ম জীবনের অখণ্ড ইতিহাসের ভিতর আপনাকে ছড়াইয়া রাখিয়া কেবলই 'হইয়া' উঠিতেছে;—বিশ্বজীবনের সেই অখণ্ডতার সহিত নিবিড়ভাবে যুক্ত হইয়া লাভ করিতে হয় সত্যকে। নিখিল গগন জুড়িয়া দেশে দেশে কালে কালে সত্য আপনাকে প্রকাশ করিতেছে এক বিরাট রাগিণীর সুরে, বিশ্ব-জোড়া সেই রাগিণীর সহিত হৃদয়-বীণার রাগিণীকে যুক্ত করিতে হইবে, তবেই-ত মিলিবে সত্যের সন্ধান।

"বাজে বাজে জীবন বীণা বাজে! কেবল আমার একলার বীণা নয়, লোকে লোকে জীবনবীণা বাজে। কত জীব, তার কত রূপ, তার কত ভাষা তার কত সুর, রূপ-রস-শব্দ-গন্ধের নিরন্তর আন্দোলনে সুখদুঃখের জন্মমৃত্যুর আলোক-অন্ধকারের নিরবচ্ছিন্ন আঘাত-অভিঘাতে বাজে বাজে জীবনবীণা বাজে। ধন্য আমার প্রাণ যে, সেই আনন্দসংগীতের মধ্যে আমারো সুরটুকু জড়িত হয়ে আছে, এই আমিটুকুপ তান সকল আমির গানে সুরের পর সুর জুগিয়ে মিড়ের পর মিড় টেনে চলেছে! এই আমিটুকুর তান কত সূর্যের আলোয় বাজছে, কত লোকে লোকে জন্মমরণের পর্যায়ের মধ্য দিয়ে বিস্তীর্ণ হচ্ছে, কত নব নব নিবিড় বেদনার মধ্য দিয়ে অভাবনীয়রূপে বিচিত্র হয়ে উঠেছে; সকল আমির বিশ্ব-ব্যাপী বিরাট বীণায় এই আমি এবং আমার মতো এমন কত আমির তার আকাশে আকাশে ঝংকৃত হয়ে উঠেছে। কী সুন্দর আমি! কী মহৎ আমি! কী সার্থক আমি।"

['জাগরণ', শান্তিনিকেতন, ১২]

সত্যের সন্ধানে বিশ্ব-জীবনের সহিত এই গভীর যোগই রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবন এবং ধর্মজীবনের সেতু; তাই এই ভাষণ এবং ব্যাখ্যাগুলি পড়িতে পড়িতে বহুস্থানেই রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতার কথা মনে পড়িয়া যায়, যেন একই জিনিসের দুই রূপ; ধর্মের ভাষণও তাই বহুস্থানে কাব্যধর্মী।

রবীন্দ্রনাথের উপনিষদের ব্যাখ্যা কোথাও প্রচলিত শাস্ত্রব্যাখ্যা নহে,—তর্কবুদ্ধি লইয়া পড়িতে গেলে ব্যাখ্যায় স্খলনত্রুটি ধরিবার হয়ত অবকাশ রহিয়াছে; রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা হয় উপনিষদের ঋষিকবিগণের অনুভূতির

সহিত নিজের অনুভূতিকে মিলাইয়া লওয়া, অথবা নিজের অনুভূতির সহিত ঋষিকবিগণের অনুভূতিগুলিকে মিলাইয়া লইবার চেষ্টা। তাই শাস্ত্রব্যাখ্যায় কবি বলিয়াছেন,—

"বহু যুগ পূর্বে এই প্রভাত-উৎসবের পবিত্র গম্ভীর মন্ত্র এই ভারতবর্ষের তপোবনে ধ্বনিত হয়েছিল—একমেবাদ্বিতীয়ম্। অদ্বিতীয় এক। পৃথিবীর এই পূর্বদিগন্তে আবার কোন্ জাগ্রত মহাপুরুষ অন্ধকার রাত্রির পরপার হতে সেই মন্ত্র বহন করে এনে স্তব্ধ আকাশের মধ্যে স্পন্দন সঞ্চার করে দিলেন। একমেবাদ্বিতীয়ম্। অদ্বিতীয় এক।

"এই যে প্রভাতের মন্ত্র উদয়শিখরের উপরে দাঁড়িয়ে জানিয়ে দিলে যে, এক সূর্য উদয় হচ্ছেন, এবার ছোটো ছোটো অসংখ্য প্রদীপ নেবাও। এই মন্ত্র কোনো এক ঘরের মন্ত্র নয়, এই প্রভাত কোনো একটি দেশের প্রভাত নয়, হে পশ্চিম, তুমিও শোনো তুমিও জাগ্রত হও। শৃণ্বন্তু বিশ্বে। হে বিশ্ববাসী, সকলে শোনো। পূর্ব গগনের প্রান্তে একটি বাণী জেগে উঠেছে—বেদাহমেতং আমি জানতে পারছি। তমসঃ পরস্তাৎ, অন্ধকারের পরপার থেকে আমি জানতে পারছি। নিশাবসানের আকাশ উদয়োন্মুখ আদিত্যের আসন্ন আবির্ভাবকে যেমন করে জানতে পারে তেমনি করে—বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।"—['নবযুগের উৎসব,' শান্তিনিকেতন, ৫]

রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় কতকগুলি লেখার ভিতরে প্রকাশ-ভঙ্গির দিক হইতেও একটা কাব্যধর্ম লক্ষণীয়। 'বলাকা' প্রভৃতির অনেক কবিতা আছে যেখানে কবিতার বিষয়বস্তুর ভিতরে একটা গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে; কিন্তু এই তত্ত্বগর্ভ কবিতাগুলিও দর্শনশাস্ত্র না হইয়া কবিতা হইয়া উঠিয়াছে। কবি এই তত্ত্বগুলিকেও কবিতা করিয়া তুলিয়াছেন কি করিয়া? সেখানকার মূল কৌশলটি এই, তত্ত্বকে কবি তত্ত্ব-কথা রূপে প্রকাশ করেন নাই—দৃশ্যের পর দৃশ্য অঙ্কিত করিয়া বিশ্ব-জীবনের ভিতর দিয়া সেই তত্ত্বকে রসমূর্তিতে প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের ধর্মতত্ত্ব প্রকাশের ভিতরেও অনেক স্থানে রহিয়াছে সেই একই কৌশল,—তত্ত্ব সেখানে অমূর্তবাণী নহে,—সে দৃশ্যে, বর্ণে গন্ধে, গানে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। যেমন "প্রাচীন ভারতের 'একঃ'" ('ধর্ম')* লেখাটি—

* 'ধর্মে'র ভিতরে প্রকাশিত লেখাগুলি 'শান্তিনিকেতনে'র লেখার সমজাতীয় বলিয়া 'শান্তিনিকেতনে'র সঙ্গেই আলোচিত হইল।

"নদী যেমন নানা বক্রপথে সরল পথে, নানা শাখা-উপশাখা বহন করিয়া, নানা নির্ঝরধারায় পরিপুষ্ট হইয়া, নানা বাধাবিপত্তি ভেদ করিয়া এক মহাসমুদ্রের দিকে ধাবমান হয়—মনুষ্যের চিত্ত সেইরূপ গম্যস্থান না জানিয়াও অসীম বিশ্ববৈচিত্র্যে কেবলই এক হইতে আর একের দিকে কোথায় চলিয়াছিল? কুতূহলী বিজ্ঞান খণ্ড খণ্ড পদার্থের দ্বারে দ্বারে অণুপরমাণুর মধ্যে কাহার সন্ধান করিতেছিল? স্নেহ-প্রীতি পদে পদে বিরহ-বিস্মৃতি-মৃত্যু-বিচ্ছেদের দ্বারা পীড়িত হইয়া, অন্তহীন তৃষ্ণার দ্বারা তাড়িত হইয়া, পথে পথে কাহাকে প্রার্থনা করিতেছিল? ভয়াতুরা ভক্তি তাহার পূজার অর্ঘ্য মস্তকে লইয়া অগ্নি-সূর্য-বায়ু-বজ্র মেঘের মধ্যে কোথায় উদ্‌ভ্রান্ত হইতেছিল?

"এমন সময়ে সেই অন্তবিহীন পথপরম্পরায় ভ্রাম্যমান দিশাহারা পথিক শুনিতে পাইল—পথের প্রান্তে ছায়া-নিবিড় তপোবনে গম্ভীর মন্ত্রে বার্তা উদ্‌গীত হইতেছে,—

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্। বৃক্ষের ন্যায় আকাশে স্তব্ধ হইয়া আছেন সেই এক। সেই পুরুষের সেই পরিপূর্ণে এ সমস্তই পূর্ণ।

... ...

"গভীর রাত্রে অনাবৃত আকাশতলে চারিদিকে কী নিভৃত এবং নিজেকে কী একাকী বলিয়া মনে হয়। অথচ তখন আলোকের যবনিকা অপসারিত হইয়া গিয়া হঠাৎ আমরা জানিতে পাই যে, অন্ধকার সভাতলে জ্যোতিষ্ক-লোকের অখণ্ড জনতার মধ্যে আমরা দণ্ডায়মান। এ কী অপরূপ আশ্চর্য, অনন্ত জগতের নিভৃত নির্জনতা। কত জ্যোতির্ময় এবং কত জ্যোতিহীন মহাসূর্যমণ্ডল, কত অগণ্য যোজনব্যাপী চক্রপথে ঘূর্ণনৃত্য, কত উদ্দাম বাষ্পসংঘাত কত ভীষণ অগ্নিউচ্ছ্বাস—তাহারই মধ্যস্থলে আমি সম্পূর্ণ নিভৃতে একান্ত নির্জনে রহিয়াছি—শান্তি এবং বিরামের সীমা নাই। এমন সম্ভব হইল কি করিয়া? ইহার কারণ—

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।"

... ...

এমনি করিয়া গভীর প্রেরণায় অনুপ্রাণিত বর্ণনার পর বর্ণনার ভিতরে প্রাচীন ভারতের 'এক'কে একেবারে প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে,—

সমস্ত তত্ত্ববহুলতা সত্ত্বেও তাই লেখাটির ভিতরে একটা সাহিত্যের রূপ জাগিয়াছে।

'শান্তিনিকেতনে'র ভিতরে কতগুলি লেখা রহিয়াছে যাহা একান্তই আত্মনিষ্ঠ। যেমন 'বৈশাখী ঝড়ের সন্ধ্যা' (শান্তিনিকেতন, ১৪)। "গ্রীষ্মসন্ধ্যার এই অপর্যাপ্ত বর্ষণ এই নিবিড় সুন্দর স্নিগ্ধতা আমারও মন থেকে সমস্ত ভাবনাকে একেবারে বিলুপ্ত করে দিয়েছে।"—ইহার ভিতরে বৈশাখী ঝড়ের যে রূপটি ফুটিয়াছে, সে একান্তই কবির অন্তরের যোগে। 'দিন ও রাত্রি' ('ধর্ম') লেখাটিও এই জাতীয়।

"সূর্য অস্ত গিয়াছে। অন্ধকার অবগুণ্ঠনের অন্তরালে সন্ধ্যার সীমন্তের শেষ স্বর্ণলেখাটুকু অন্তর্হিত হইয়াছে। রাত্রিকাল আসন্ন।

"এই যে, দিন এবং রাত্রি প্রত্যহই আমাদের জীবনকে একবার আলোকে একবার অন্ধকারে তালে তালে আঘাত করিয়া যাইতেছে, ইহারা আমাদের চিত্তবীণায় কি রাগিণী ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে?—"এই প্রশ্নের জবাবই রহিয়াছে সমস্ত রচনাটি জুড়িয়া। এই জাতীয় লেখার ভিতরে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রচনা 'শ্রাবণ সন্ধ্যা' (শান্তিনিকেতন ১১), ইহার সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব।

'পঞ্চভূত' একটি অভিনব কলাকৌশলে প্রকাশিত রচনা। প্রতিভা নিত্য নূতন প্রকাশভঙ্গি গড়িয়া লইতে চায়, তাহার ভিতরে রহিয়াছে যে নব নব উন্মেষণী শক্তি। 'পঞ্চভূতে'র যাহা আলোচ্য বিষয় রবীন্দ্রনাথ তাহার সব না হইলেও অনেক কথা প্রবন্ধাকারে বা অন্যরূপে অন্যত্র বলিয়াছেন; কিন্তু আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, এই 'পঞ্চভূতে'র জবানেই কবি বলিয়াছেন, সাহিত্যের বিষয়টাই সব চেয়ে বড় নয়, ভঙ্গিটাই নিত্যনূতন রহস্যের স্রষ্টা। তাই 'বহু পুরাতন কথা'ও নূতন ভঙ্গিতে 'নব আবিষ্কারে'র ভিতর দিয়া নূতন সাহিত্যিক মর্যাদা লাভ করে।

'পঞ্চভূত' পঞ্চ ভূতের খেয়াল খুশীতে ঘরোয়া আলাপ-আলোচনা; বিষয়ের কোন কিছু সুনির্দিষ্টতা নাই,—সাহিত্য, সৌন্দর্য, মনুষ্য-প্রকৃতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি গুরু-লঘু বহু বিষয়ে আলাপ-আলোচনা রহিয়াছে। পঞ্চভূত—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোমই এখানে পাঁচটি চরিত্র,—ইহাদের ভিতরেই সব কথোপকথন। ইহাদের ভিতরে শ্রীযুক্ত ক্ষিতি, শ্রীযুক্ত বায়ু (পরিচিত নাম সমীর) এবং শ্রীযুক্ত ব্যোম পুরুষ চরিত্র এবং শ্রীমতী অপ্ (পরিচিত নাম

স্রোতস্বিনী) ও শ্রীমতী তেজ (দীপ্তি নামে পরিচিত) স্ত্রী চরিত্র। বলা বাহুল্য শ্রীযুত ক্ষিতির প্রকৃতিতে ক্ষিতিভূতের গুণাধিক্য,—ইনি সকলের মধ্যে গুরুভার ধীর স্থির ব্যক্তি—অন্ততঃ সর্বদা চালচলনটা সেইরূপ। প্রকৃতিতেই তিনি সর্বক্ষেত্রে অনাবশ্যকের পরিপন্থী। শ্রীমতী স্রোতস্বিনী "কেবল মধুর কাকলি ও সুন্দর ভঙ্গিতে ঘুরিয়া ফিরিয়া বলিতে থাকেন,—...। কেবল বার বার 'না না, নহে নহে'। তাহার সহিত আর কোনো যুক্তি নাই, কেবল একটি তরল সঙ্গীতের ধ্বনি, একটি অনুনয়স্বর, একটি তরঙ্গনিন্দিত গ্রীবার আন্দোলন,—......শ্রীমতী স্রোতস্বিনীর এই অনুনয় প্রবাহে শ্রীযুক্ত ক্ষিতি প্রায় গলিয়া যান, কিন্তু কোন যুক্তি দ্বারা তাঁহাকে পরাস্ত করিবার সাধ্য কী।"

শ্রীমতী দীপ্তি 'একেবারে নিষ্কোষিত অসিলতার মতো ঝিকমিক করিয়া উঠেন এবং শাণিত সুন্দর স্বরে কথা বলেন। শ্রীমান্ সমীর সর্বদাই চঞ্চল,—'প্রথমটা একবার হাসিয়া সমস্ত উড়াইয়া' দেয়। আর শ্রীযুক্ত ব্যোম 'কিয়ৎকাল চক্ষু মুদিয়া' কথা বলেন,—কিন্তু 'ব্যোম' যাহা বলে তাহা কেহ মনোযোগ দিয়া শোনে না।

এই পাঁচটি কল্পিত চরিত্রকে লেখক যথাসম্ভব ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র এবং আচার-ব্যবহারে, আলাপ-আলোচনায় জীবন্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গল্প-উপন্যাসের ন্যায় দেশ-কাল-পাত্রের বিশদ বর্ণনায়—সমস্ত খুঁটি-নাটিতে রচনার প্রবন্ধ-গন্ধ ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। লেখক এই কৌশলে যে সর্বত্রই সফলতা লাভ করিয়াছেন একথা বলা যায় না,—নেপথ্যের যবনিকা অনেকস্থানে পাতলা হইয়া গিয়াছে, অনেকস্থানে খসিয়া পড়িয়াছে। রস-প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়া পঞ্চভূতের যেখানে আত্ম-প্রতিষ্ঠা ঘটে নাই সেখানে তাহাদের আগমন কৃত্রিম এবং অবাঞ্ছিত বলিয়া মনে হইয়াছে। এই সব স্থলে মনে হইয়াছে, পঞ্চভূতের এই পাতলা যবনিকার অন্তরাল হইতে কথা না বলিয়া রবীন্দ্রনাথ অকৃত্রিমভাবে আত্ম-প্রকাশ করিলে বোধহয় আরও ভাল হইত। কতগুলি লেখা এইরূপ পঞ্চভূতের দুর্বল কোলাহল বর্জিত; যেমন 'পল্লীগ্রাম', 'মন' প্রভৃতি; এখানে লেখাগুলি আত্মনিষ্ঠ সরস রচনারূপে জমিয়াছে ভাল।

আমরা উপরে রবীন্দ্রনাথের যে যে জাতীয় গদ্যলেখার আলোচনা করিলাম, একটা ব্যাপক অর্থে তাহারা সকলেই রচনা-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইলেও তাহারা বিশুদ্ধ সাহিত্যিক রচনা নহে,—একথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি।

ইহার অনেক ক্ষেত্রেই সাহিত্যের উদ্দেশ্য এবং উপাদান অন্যান্য বিবিধ উদ্দেশ্য এবং উপাদানের সহিত জড়িত হইয়া আছে। ইহার ভিতরে বচনভঙ্গির মহিমাকে কোথাও উপেক্ষা করিতে না পারিলেও বক্তব্যের মহিমাই অনেক স্থানে মুখ্য,—প্রকাশভঙ্গি তাহার অনুপূরক হইয়া উঠিয়াছে। অন্ততঃ একথা বলা চলে যে, তাহাদের সাহিত্যিক মূল্য বিষয়ের 'নিরেট' মূল্যকে সর্বদা অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কতগুলি গদ্যলেখা আছে যেগুলি বিশুদ্ধ সাহিত্যিক রচনা, অর্থাৎ মুখ্যতঃ সাহিত্য-সৃষ্টির জন্যই তাহাদের রচনা; এই জন্য 'নিরেট' বিষয়গৌরব তাহাদের কম। 'বিচিত্র প্রবন্ধে' প্রকাশিত লেখাগুলি এই জাতীয় লেখার সার্থক নিদর্শন হইলেও অন্য লেখার ভিতরেও এই জাতীয় খাঁটি রচনা বিরল নহে,—'শান্তিনিকেতন,' 'ধর্ম' প্রভৃতির ভিতরে প্রকাশিত কতগুলি লেখাও এই জাতীয় বিশুদ্ধ রচনা হইয়া উঠিয়াছে।

এই জাতীয় রচনাগুলির যথাযথ পরিচয় রবীন্দ্রনাথ নিজেই 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র 'বাজে কথা' নামক লেখার ভিতরে দিয়াছেন। এই লেখাটির ভিতরে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই জাতীয় লেখার যে পরিচয় দিয়াছেন আমরা আমাদের গ্রন্থারম্ভে সেই পরিচয়কেই যথার্থ সাহিত্যিক রচনার সুষ্ঠুতম পরিচয় বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিয়াছি। লেখক এই জাতীয় লেখাগুলির নাম দিয়াছেন 'বাজে কথা'।

"অন্য খরচের চেয়ে বাজে খরচেই মানুষকে যথার্থ চেনা যায়, কারণ, মানুষ ব্যয় করে বাঁধা নিয়ম অনুসারে, অপব্যয় করে নিজের খেয়ালে।

"যেমনি বাজে খরচ, তেমনি বাজে কথা। বাজে কথাতেই মানুষ আপনাকে ধরা দেয়। উপদেশের কথা যে-রাস্তা দিয়া চলে, মনুর আমল হইতে তাহা বাঁধা, কাজের কথা যে-পথে আপনার গোযান টানিয়া আনে, সে-পথ কেজো সম্প্রদায়ের পায়ে পায়ে তৃণপুষ্পশূন্য চিহ্নিত হইয়া গেছে। বাজে কথা নিজের মতো করিয়াই বলিতে হয়।

"……আমাদের বিবেচনায় চাণক্যকথিত উক্ত ভদ্রলোক তাবচ্চ শোভতে যাবৎ তিনি উচ্চ অঙ্গের কথা বলেন, যাবৎ তিনি আবহমান কালের পরীক্ষিত সর্বজন বিদিত সত্য ঘোষণায় প্রবৃত্ত থাকেন—কিন্তু তখনি তাঁহার বিপদ, যখনি তিনি সহজ কথা নিজের ভাষায় বলিবার চেষ্টা করেন।

"যে-লোক একটা বলিবার বিশেষ কথা না থাকিলে কোনো কথাই বলিতে

পারে না; হয় বেদবাক্য বলে, নয় চুপ করিয়া থাকে; হে চতুরানন, তাহার কুটুম্বিতা, তাহার সাহচর্য, তাহার প্রতিবেশ—

শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ।

. ...

"এক-একটি দুর্লভ মানুষ এইরূপ স্ফটিকের মতো অকারণ ঝলমল করিতে পারে। সে সহজেই আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাকে তাহার কোনো বিশেষ উপলক্ষ্যের আবশ্যক হয় না। তাহার নিকট হইতে কোনো বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া লইবার গরজ কাহারও থাকে না—সে অনায়াসে আপনাকে আপনি দেদীপ্যমান করে, ইহা দেখিয়াই আনন্দ।......

... ...

"সাহিত্যের যথার্থ বাজে রচনাগুলি কোনো বিশেষ কথা বলিবার স্পর্ধা রাখে না। সংস্কৃত সাহিত্যে মেঘদূত তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাহা ধর্মের কথা নহে, কর্মের কথা নহে, পুরাণ নহে, ইতিহাস নহে। যে অবস্থায় মানুষের চেতন-অচেতনের বিচার লোপ পাইয়া যায়, ইহা সেই অবস্থার প্রলাপ। ইহাকে যদি কেহ বদরীফল মনে করিয়া পেট ভরাইবার আশ্বাসে তুলিয়া লন, তবে তখনি ফেলিয়া দিবেন। ইহা নিটোল মুক্তা, এবং ইহাতে বিরহীর বিদীর্ণ হৃদয়ের রক্তচিহ্ন কিছু লাগিয়াছে, কিন্তু সেটুকু মুছিয়া ফেলিলেও ইহার মূল্য কমিবে না।"

রবীন্দ্রনাথের 'পাগল,' 'কেকাধ্বনি,' 'নববর্ষা,' 'পরনিন্দা,' 'বসন্তযাপন,' 'রুদ্ধগৃহ,' 'পথপ্রান্তে,' 'শ্রাবণসন্ধ্যা' প্রভৃতি লেখা সংসারের কাজের মানুষের পক্ষে প্রায় সর্বাংশেই বাজে কথা; কারণ, আমাদের প্রচলিত দৈনন্দিন জীবনের চিরাচরিত কার্যতালিকায় ইহাদের কোনও কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা নাই; কিন্তু সাহিত্যের জগতে ইহারাই 'নিটোল মুক্তা'।

'বাজে কথা', 'পনেরো-আনা', 'পরনিন্দা' প্রভৃতি রচনাগুলির বৈশিষ্ট্য এই, —ইহার ভিতরে লেখক একদিকে যেমন কোথাও তেমন একটা অতিমাত্র 'সিরিয়াস্' নন—অন্যদিকে গভীররূপে ভাবস্থও নন,—খানিকটা লঘুচালে সহজ ভাবে কথা বলিয়া গিয়াছেন। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, এই ধরণের লেখাই পাশ্চাত্ত্য আদর্শে ঠিক 'জাতে'র রচনা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লেখার ভিতরে এই জাতীয় রচনা কম। রবীন্দ্রনাথ যেখানে ভারিক্কী না হইয়া উঠিয়াছেন সেখানে ভাবস্থ হইয়াছেন; ভাবস্থ রচনাই রবীন্দ্রনাথের বেশী।

এই ভাবস্থ রচনার পশ্চাতে থাকে লেখকের একটা বিশেষ মানসিক অবস্থান এবং তাহার ভিতর দিয়াই জাগে একটা বিশেষ ভাবদৃষ্টি। মজা এই, এই বিশেষ ভাবদৃষ্টির ভিতর দিয়া বাহিরে প্রকাশ লাভ করে লেখকের ভিতরকার সহজ মানুষটি। এই ভাবদৃষ্টি আপনার ভিতরে আপনি যখন একান্ত অনির্বচনীয় হইয়া ওঠে তখন প্রকাশের জন্য সে সঙ্গীতের আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়, তখনই সে রূপ গ্রহণ করে লিরিক কবিতার; আর ভাবনার দোলায় দোলায় স্থিরবদ্ধ ভাবটি যখন নিজেকে একটু একটু করিয়া চারিদিকে বিকীর্ণ করিতে থাকে তখনই সৃষ্টি হয় এই জাতীয় রচনার। লিরিক কবিতার সহিত এই জাতীয় রচনার আকৃতিগত ভেদ যতই থাকুক, প্রকৃতিগত ভেদ বিলক্ষণ নহে।

রবীন্দ্রনাথের বহু রচনাই এই ভাবের সহিত ভাবনার মিশ্রণে জাত। কোথাও হয়ত ভাবই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, কোথাও ভাবনা। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথের এই রচনাগুলি স্থানে স্থানে তাঁহার লিরিক্ কবিতার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। 'নববর্ষ' বহুস্থানে 'মেঘদূত' কবিতাটিকে স্মরণ করাইয়া দিবে, 'বসন্তযাপন' 'বসুন্ধরা' কবিতাকে স্মরণ করাইয়া দিবে। কিন্তু এই 'নববর্ষা' রচনা ও 'মেঘদূত' কবিতার ভিতরে প্রধান পার্থক্য কি? সে পার্থক্য এই, আষাঢ়ের প্রথম দিবসের নবমেঘ যখন রবীন্দ্রনাথের ভাবলোকে একটা রসানুভূতির ভিতরে অনির্বচনীয়রূপে নিবিড় হইয়া উঠিয়াছিল তখন তিনি সঙ্গীতের আশ্রয় ব্যতীত তাহাকে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। কিন্তু 'নববর্ষা'র ভিতরে নববর্ষাকে অবলম্বন করিয়া এপাশ সেপাশ হইতে বহু ভাবানুসঙ্গী ভাবনা আসিয়া কবির মনকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে,—ভাবনার মেঘগুলি ভাবের বর্ষণকে ইতস্ততঃ ছড়াইয়া দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। ফলে এই রচনাগুলির ভিতরে খানিকটা আসিয়া পড়ে ভাবের বিশ্লেষণ—তাহার ভিতরে আসে চিন্তা, আসে যুক্তি, আসে 'বিশেষ'কে সাধারণীকরণের চেষ্টা।

এই সকল ভাবস্থ রচনার ভিতরে 'শ্রাবণ-সন্ধ্যা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বহিঃপ্রকৃতি এবং অন্তঃপ্রকৃতি এখানে পরস্পরের সহিত নিবিড়ভাবে যুক্ত হইয়া একেবারে এক হইয়া উঠিয়াছে। বাহিরে যেমন দেখিতে পাই,—

"আজ শ্রাবণের অশ্রান্ত ধারাবর্ষণে জগতে আর যত কিছু কথা আছে, সমস্তকেই ডুবিয়ে ভাসিয়ে দিয়েছে। মাঠের মধ্যে অন্ধকার আজ নিবিড়—

এবং কখনও একটি কথা কইতে জানে না, সেই মূক আজ কথায় ভরে উঠেছে।

"অন্ধকারে ঠিক মতো তার উপযুক্ত ভাষায় যদি কেউ কথা কওয়াতে পারে তবে সে এই শ্রাবণের ধারাপতনধ্বনি। অন্ধকারের নিঃশব্দতার উপরে এই ঝর্‌ঝর্‌ কলশব্দ যেন পর্দার উপরে পর্দা টেনে দেয়, তাকে আরো গভীর করে ঘনিয়ে তোলে, বিশ্বজগতের নিদ্রাকে নিবিড় করে আনে। বৃষ্টিপতনের এই অবিরাম শব্দ, এ যেন শব্দের অন্ধকার।

"আজ এই কর্মহীন সন্ধ্যাবেলাকার অন্ধকার তার সেই জপের মন্ত্রটিকে খুঁজে পেয়েছে। বরাবর তাকে ধ্বনিত করে তুলছে—কিন্তু তার নূতন শেখা কথাটিকে নিয়ে যেমন অকারণে অপ্রয়োজনে ফিরে ফিরে উচ্চারণ করতে থাকে সেই রকম—তার শ্রান্তি নেই, শেষ নেই, তার আর বৈচিত্র্য নেই।"

অন্যদিকে তেমনই ইহার সহিত আমাদের অন্তঃপ্রকৃতিরও গভীর মিল রহিয়াছে। তাই,—

"আজ এই বোবা সন্ধ্যা প্রকৃতির এই যে হঠাৎ কণ্ঠ খুলে গিয়েছে এবং আশ্চর্য হয়ে স্তব্ধ হয়ে সে যেন ক্রমাগত নিজের কথা নিজের কানেই শুনছে, আমাদের মনেও এর একটা সাড়া জেগে উঠেছে—সেও কিছু একটা বলতে চাচ্ছে।—ওই-রকম খুব বড় করেই বলতে চায়, ওই-রকম জল স্থল আকাশ একেবারে ভরে দিয়েই বলতে চায়,—কিন্তু সে তো কথা দিয়ে হবার জো নেই, তাই সে একটা সুরকে খুঁজছে। জলের কল্লোলে, বনের মর্মরে, বসন্তের উচ্ছ্বাসে, শরতের আলোকে, বিশাল প্রকৃতির যা কিছু কথা সেতো স্পষ্ট কথায় নয়—সে কেবল আভাসে ইঙ্গিতে, কেবল ছবিতে গানে। এইজন্য প্রকৃতি যখন আলাপ করতে থাকে, তখন সে আমাদের মুখের কথাকে নিরস্ত করে দেয়, আমাদের প্রাণের ভিতরে অনির্বচনীয়ের আভাসে ভরা গানকেই জাগিয়ে তোলে।"

রবীন্দ্রনাথ এখানে এই মূক প্রকৃতির শব্দের অন্ধকারের ভিতরে যদি নিজেকে একেবারে নিমগ্ন করিয়া দিতেন তবে 'অনির্বচনীয়ের আভাস ভরা গান'কে সৃষ্টি করিতেন; রবীন্দ্রনাথ এখানে ভাবস্থ, কিন্তু একেবারে বিলীন নহেন; তাই ঘুরিয়া ফিরিয়া মনে জাগিয়াছে ভাবনা—মানুষের ভাষা আর প্রকৃতির ভাষা সম্বন্ধে, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অন্তরের যোগ সম্বন্ধে, বিশ্বপ্রকৃতি তাহার সকল সৌন্দর্য দূতের মুখে কোন্ প্রিয়তমের বার্তা কেমন করিয়া

পাঠাইতেছে, আর প্রকৃতি এই শ্রাবণের অবিরল বর্ষণধ্বনির ভিতর দিয়াই বা কোন্ অনাদি বিরহের বার্তা পাঠাইয়াছে তাহার সম্বন্ধে। এই যে একটির পর একটি করিয়া ভাবনা আসিতেছে তাহারা বিশেষ কোন বুদ্ধিগ্রাহ্য নৈয়ায়িক পারম্পর্যে অন্বিত নহে, একটি ভাবাবেশের দ্বারাই অন্বিত। লেখক শেষে যে কোন্ কথাটি বলিবেন তাহা পূর্বে বুঝিয়া লইবার উপায় নাই, কিন্তু যে কথাটি বলিলেন তাহা আকস্মিকও নহে, অসংলগ্নও নহে—সমস্ত মন তাহাকে অনায়াসে একটা সহানুভূতির সহিত গ্রহণ করে।

'পাগল' রচনাটির ভিতরেও দেখিতে পাই, বহিঃপ্রকৃতির একটা বিশেষ অবস্থান অন্তঃপ্রকৃতির ভিতরে একটা বিশেষ অবস্থানের সৃষ্টি করিয়াছে; ইহাতে বিশ্বজীবন সম্বন্ধে লেখকের মনে একটি বিশেষ ভাবদৃষ্টি গড়িয়া উঠিয়াছে,—তাহা লইয়াই সমস্ত রচনাটি। বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনায় দেখিতে পাই,—

"পশ্চিমের একটি ছোট শহর। সম্মুখে বড়ো রাস্তার পরপ্রান্তে খ'ড়ো চালাগুলার উপর পাঁচ-ছয়টা তালগাছ বোবার ইঙ্গিতের মতো আকাশে উঠিয়াছে, এবং প'ড়ো বাড়ির ধারে প্রাচীন তেঁতুল গাছ তাহার লঘু চিক্কণ ঘন পল্লবভার সবুজ মেঘের মতো স্তূপে স্তূপে স্ফীত করিয়া রহিয়াছে। চালশূন্য ভাঙা ভিটার উপর ছাগছানা চরিতেছে। পশ্চাতে মধ্যাহ্ন আকাশের দিগন্ত রেখা পর্যন্ত বনশ্রেণীর শ্যামলতা।

"আজ এই শহরটির মাথার উপর হইতে বর্ষা হঠাৎ তাহার কালো অবগুণ্ঠন একেবারে অপসারিত করিয়া দিয়াছে।" [বিচিত্র প্রবন্ধ]

এই 'নিবিড় আষাঢ়ের মাঝখানে একদিনের জ্যোতির্ময় অবকাশ' লেখকের মনকে ছক্-কষা দৈনন্দিন কাজের জগৎ হইতে একেবারে ছুটি দিল।

"দিনের পর দিন আসে, আমার কাছে তাহারা কিছুই দাবী করে না;—তখন হিসাবের অঙ্কে ভুল হয় না; তখন সকল কাজই সহজে করা যায়। জীবনটা তখন একদিনের সঙ্গে আর এক দিন, এক কাজের সঙ্গে আর এক কাজ দিব্য গাঁথিয়া গাঁথিয়া অগ্রসর হয়, সমস্ত বেশ সমানভাবে চলিতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ—কোন খবর না দিয়া একটা বিশেষ দিন সাত সমুদ্রপারের রাজপুত্রের মতো আসিয়া উপস্থিত হয় *, প্রতিদিনের সঙ্গে তাহার কোন মিল হয় না—তখন মুহূর্তের মধ্যে এতদিনকার সমস্ত খেই হারাইয়া যায়—তখন বাঁধা কাজের পক্ষে বড়ই মুস্কিল ঘটে।

* দ্র—'শুভক্ষণ' (উৎসর্গ)।

কিন্তু এই দিনই আমাদের বড়োদিন ; এই অনিয়মের দিন, এই কাজ নষ্ট করিবার দিন। যে দিনটা আসিয়া আমাদের প্রতিদিনকে বিপর্যস্ত করিয়া দেয়,—সেই দিন আমাদের আনন্দ। অন্য দিনগুলো বুদ্ধিমানের দিন, সাবধানের দিন,—আর এক-একটা দিন পুরা পাগলামির কাছে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করা।"

কিন্তু পাগলামির কাছে দিনটা সমর্পণ করিয়া লেখকের মনটা শুধু খাপ-ছাড়া পাগলামিতেই মাতিয়া ওঠে নাই, এ পাগলামির ভিতরে বেশ একটি সুর-তাল আছে ; তাই সেই পাগলামির মধ্য দিয়া লেখকের নিকট জাগিয়া উঠিল নিয়মের জগতের পশ্চাতে এই পাগলামির জগৎটা এবং নিয়মের দেবতার সঙ্গে সঙ্গে পাগলামির দেবতা ক্ষ্যাপা ভোলানাথের রূপ।

রবীন্দ্রনাথের এই রচনাগুলির ভিতরে ভাব হইতে ভাবনার অংশটা কিছু অপ্রধান নহে, এই ভাবনার অংশটাই ইহাদিগকে রচনা-সাহিত্যের রূপ দিয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কতগুলি গদ্যলেখা রহিয়াছে যেখানে এই ভাবটিই মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে। একটি সাময়িক মানসিক অবস্থান—এক একটি বিশেষ 'মুড্'-ই এই লেখার প্রাণ। লিরিক কবিতার ন্যায় এই লেখাগুলি স্বল্পায়তনের ভিতরেই ভাবস্থ কবি-মানসটিকে প্রকাশ করে। যেমন রবীন্দ্রনাথের 'পথে ও পথের প্রান্তে'র লেখাগুলি। সাহিত্যের ভিতরে এগুলির জাতি নির্ধারণ করা শক্ত। রচনা ও কবিতার মাঝখানে আমরা এগুলিকে 'তটস্থ' * বলিয়া গণ্য করিতে পারি। কোন্ অংশে যে ইহারা রচনা হইয়া উঠিয়াছে, কোন্ অংশে যে কবিতা হইয়া উঠিয়াছে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা যায় না। আসলে আমরা গদ্য এবং পদ্যের ভিতরে যে একটা মারাত্মক রকমের ব্যবধান কল্পনা করিয়া বসিয়া আছি এইটাই ভুল ; সাহিত্যের ক্ষেত্রে সর্বদা মাথা মাপিয়া জাতি নির্ণয় করা চলে না, ওটা অনেক সময়ে আমাদের একটা অনড় সংস্কার। রবীন্দ্রনাথের গদ্য ও পদ্যের ভিতরে বেশ একটা 'এদেশে সেদেশে মেশমেশি আছে',—এবং এ 'মেশামেশি'টি সত্যই অতি 'সহজ'।

'লিপিকা'র কতকগুলি লেখা গদ্য-রচনার সীমা অনেকখানি অতিক্রম করিয়া স্পষ্ট কবিতা হইয়া উঠিয়াছে, এগুলি সম্বন্ধে আর কোন সংশয়ের অবকাশ নাই। এগুলির ভিতরে একটু সূক্ষ্ম হইলেও কবিতার ন্যায় স্পষ্ট ছন্দ

* তটে স্থিত।

রহিয়াছে, কবিতার ঢঙে না সাজাইয়া ওগুলিকে যে গদ্যের ঢঙে সাজান হইয়াছে তাহা একান্তই বাহ্য। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন,—"গীতাঞ্জলির গানগুলো ইংরেজী গদ্যে অনুবাদ করেছিলেম। এই অনুবাদ কাব্যশ্রেণীতে গণ্য হয়েছে: সেই অবধি আমার মনে এই প্রশ্ন ছিল যে পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে ইংরেজিরই মতো বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কি না। মনে আছে সত্যেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করিয়াছিলেম, তিনি স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু চেষ্টা করেন নি। তখন আমি নিজেই পরীক্ষা করেছি, 'লিপিকা'র অল্প কয়েকটি লেখায় সেগুলি আছে। ছাপবার সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয়নি—বোধ করি ভীরুতাই তার কারণ।"

আকৃতির কথা বাদ দিয়া প্রকৃতির কথা বিচার করিলেও 'লিপিকা'র অনেকগুলি লেখার ভিতরেই বেশ একটা জটিলতা দেখিতে পাই। ইহার ভিতরে ভাবস্থ অতি সহজ মনের স্পন্দন আছে,—কোথাও কোথাও একটা গল্পের আমেজ আছে—কোথাও প্রচ্ছন্ন হইলেও একটা বিশেষ বক্তব্য রহিয়াছে, সে বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে রহিয়াছে সাহিত্যিক কৌশল। লেখাগুলি যে কোথায় গদ্য কবিতা হইয়া উঠিয়াছে, কোথায় গল্প হইয়া উঠিয়াছে, কোথায় রচনা হইয়া উঠিয়াছে তাহা স্পষ্ট বিশ্লেষণ করিয়া দেখান শক্ত।

চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের যাহা বৈশিষ্ট্য লিপিকার এই লেখাগুলির মধ্যেও দেখি সেই বৈশিষ্ট্য। আমাদের প্রচলিত চিত্রাঙ্কনের প্রায় সর্বত্রই দেখিতে পাই, রেখা বা রঙের ভিতর দিয়া যে রূপটি শিল্পী ফুটাইয়া তুলিতে চান সে বিষয়ে তাঁহার একটা দৃঢ় সংস্কার থাকে। রূপসৃষ্টি করিতে হইলেই আমরা মনকে স্বাধীনভাবে সৃষ্টি করিবার সুযোগ দিতে পারি না; রূপের সংস্কারে মনকে বাঁধিয়া ফেলি। এই রূপ বা আকৃতির সংস্কার সাহিত্যের ক্ষেত্রেও আমাদের জ্ঞাতে অজ্ঞাতে মনকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করে। এই সংস্কারবদ্ধ রূপের বাহিরেও যে চিত্রশিল্পের কত অফুরন্ত সম্ভাবনা রহিয়াছে রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কনের ভিতরে দেখিতে পাই তাহারই আভাস। 'লিপিকা'র লেখাগুলির ভিতরেও দেখিতে পাই রূপ-সংস্কার হইতে বিমুক্ত—নব নব সাহিত্য-সৃষ্টির প্রচেষ্টা। ঠিক প্রবন্ধও নয়, ঠিক লিরিক কবিতাও নয়, ঠিক ছোট গল্পও নয়—অথচ তাহাদের মিশ্রণে একটা স্বাধীন রূপ।

রবীন্দ্রনাথের পত্র-সাহিত্যকে ঠিক 'বিপুলকায়' বিশেষণে বিশেষিত না

করা গেলেও তাহার কায়ের স্থূলতা নেহাৎ উপেক্ষণীয় নহে। ইহার ভিতরে নানা ধরণের পত্র আছে,—কতগুলি বন্ধু-বান্ধবগণের নিকটে লেখা পত্র,—যাহার ভিতরে কবির সাহিত্য-জীবন এবং তৎসহযুক্তভাবে তাঁহার ধর্মজীবনের পরিচয় রহিয়াছে,—আর অধিকাংশ পত্রই কবির দেশ-বিদেশে ভ্রমণের কাহিনী অবলম্বন করিয়া।

আমরা রচনা-সাহিত্যের স্বরূপ-লক্ষণ আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়াছি যে, সাহিত্য হিসাবে পত্র-সাহিত্য রচনা-সাহিত্যের সহিত নিকটসূত্রে সম্বন্ধযুক্ত। কিন্তু পত্র-সাহিত্যের পরিচয় প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি, রচনা-সাহিত্যের সহিত তাহার বিশেষ সাজাত্য এইখানে যে মূলতঃ রচনা-সাহিত্যও যেমন বারোয়ারী জিনিস নহে, অনেকখানি ঘরোয়া, পত্র-সাহিত্যও তাই;—বরঞ্চ পত্র-সাহিত্যে এই গুণটি রচনা-সাহিত্য অপেক্ষাও বেশী থাকিবার কথা, কারণ এগুলি বিশেষভাবে একটি লোকের জন্য লেখা—এবং সে লোকটিও হইতেছে এমন একজন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি যাহার সহিত লেখকের অন্তরের যোগ একান্ত অকুণ্ঠিত এবং অকৃত্রিম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিকাশের কিছু পর হইতেই তিনি এমন বারোয়ারী সম্পত্তি হইয়া উঠিয়াছিলেন—শুধু স্বদেশে নয়, বিদেশেও—যে মধ্যজীবন হইতেই রবীন্দ্রনাথ যত চিঠি লিখিয়াছেন সেই চিঠি যাঁহাকে সম্বোধন করিয়াই লিখুন না কেন, তাহার শ্রোতা যে বাঙলা দেশের শত সহস্র নর-নারী একথা একেবারে ভুলিয়া যাওয়া কবির পক্ষে বাস্তবেই অসম্ভব ছিল। যেখানে তিনি নিশ্চিন্ত জানিতেন যে তাঁহার মুখের একটি সাধারণ বাণীকেও সংবাদওয়ালা নোটওয়ালার দল সহসা ফাঁসিয়া যাইতে দিতে প্রস্তুত নহেন, সেখানে কবি কি করিয়া মনে করিবেন যে তিনি দেশ-বিদেশকে অবলম্বন করিয়া যেসকল চিঠি-পত্র লিখিবেন তাহা শুধু একজনের কাছেই লেখা? পত্র-সাহিত্যের মূল কথাটি রবীন্দ্রনাথ নিজেই একখানি পত্রে সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন।—

"দেশ থেকে বেরোবার মুখে আমার উপর ফরমাস এলো কিছু কিছু লেখা পাঠাতে হবে। কাকে পাঠাব লেখা, কে পড়বে? সর্বসাধারণ? সর্বসাধারণকে বিশেষ ক'রে চিনিনে এই জন্য তা'র ফরমাসে যখন লিখি তখন শক্ত ক'রে বাঁধানো খুব একটা সাধারণ খাতা খুলে লিখতে হয়, সে-লেখার দাম খতিয়ে হিসেব কষা চলে।

"কিন্তু মানুষের একটা বিশেষ খাতা আছে তা'র আলগা পাতা, সেটা

যা-তা লেখবার জন্যে, সে লেখার দামের কথা কেউ ভাবেও না। লেখাটাই তা'র লক্ষ্য, কথাটা উপলক্ষ্য। সে-রকম লেখা চিঠিতে ভালো চলে; আটপৌরে লেখা,—তা'র না আছে মাথায় পাগড়ি, না আছে পায়ে জুতো। পরের কাছে পরের বা নিজের কোনো দরকার নিয়ে সে যায় না; সে যায় যেখানে বিনা-দরকারে গেলেও জবাবদিহি নেই,—যেখানে কেবল ব'কে যাওয়ার জন্যই যাওয়া-আসা।

"স্রোতের জলের যে-ধ্বনি সেটা তা'র চলারই ধ্বনি, উড়ে চলা মৌমাছির পাখার যেমন গুঞ্জন। আমরা যেটাকে বকুনি বলি সেটাও সেই মানসিক চ'লে যাওয়ারই শব্দ। চিঠি হচ্ছে লেখার অক্ষরে ব'কে যাওয়া।

"এই ব'কে যাওয়াটা মনের জীবনের লীলা। দেহটা কেবল চলবার জন্যেই বিনা-প্রয়োজনে মাঝে মাঝে এক-একবার ধা ক'রে চ'লে ফিরে আসে। বাজার করবার জন্যেও নয়, সভা করবার জন্যেও নয়, নিজের চলাতেই সে নিজে আনন্দ পায় ব'লে। তেম্‌নি নিজের বকুনিতেই মন জীবন-ধর্মের তৃপ্তি পায়। তাই বক্‌বার অবকাশ চাই, লোক চাই। বক্তৃতার জন্য লোক চাই অনেক, বকার জন্যে এক-আধজন।"

['জাভা-যাত্রীর পত্র', ২নং, যাত্রী]

কিন্তু এই 'একজন'কে চিঠি লিখিবার সঙ্কল্প লইয়া বসিলেও তিনি একটি চিঠিখানিও 'একজন'কে লিখিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাহার এক কারণ পূর্বেই বলিয়াছি; দ্বিতীয় কারণ কবি এই চিঠিতে নিজেই দিয়াছেন।—

"সেই ভাবেই চিঠি লিখতে সুরু ক'রেছিলুম। কিন্তু আকাশের আলো দিলে মুখ-ঢাকা। বৈঠকখানার আসর বন্ধ হ'য়ে গেলে ফরাস বাতি নিবিয়ে দিয়ে যেমন ঝাড়লণ্ঠনে ময়লা রঙের ঘেরাটোপ পরিয়ে দেয়, দ্যুলোকের ফরাস সেই কাণ্ডটা ক'রলে; একটা ফিকে ধোঁয়াটে রঙের আবরণ দিয়ে আকাশ-সভার তৈজসপত্র দিলে মুড়ে। সেই অবস্থায় আমার মন তা'র হাল্‌কা রকমের খেলা আপনিই বন্ধ ক'রে দেয়। বকুনির কূলহারা ঝরণা বাক্যের নদী হ'য়ে কখন্‌ এক সময় গভীর খাদে চ'ল্‌তে আরম্ভ করে, তখন তার চলাটা কেবলমাত্র সূর্যের আলোয় কলধ্বনির নূপুর বাজানোর জন্যে নয়, একটা কোনো লক্ষ্যে পৌঁছবার সাধনায়। আনমনা সাহিত্য তখন লোকালয়ের মাঝখানে এসে প'ড়ে সমনস্ক হ'য়ে ওঠে। তখন বাণীকে অনেক বেশী অতিক্রম ক'রে ভাবনাগুলো মাথা তুলে দাঁড়ায়।"

এই জন্যই 'হালকা কলমের লেখা'য় লেখা চিঠি রবীন্দ্রনাথ বেশী লিখিতে পারেন নাই; কলম লইয়া বসিলেই তাঁহার ভাব ও ভাবনাগুলিও মনের ভিতরে ভিড় করিয়া একটা গভীর খাদে চলিতে থাকিত। কিন্তু এই খাদটা একটানা গভীরতায় চলিত না, তাহার ভিতরে খাদের এবং চড়ার বেশ একটা সাবলীল ওঠা-নামা রহিয়াছে। কবির মন কখনও কখনও বিষয়-বস্তুর প্রসঙ্গেই মগ্ন হইয়া যায়,—আবার মাছে মাঝে তিনি আত্মীয়তার হালকা চালে ভাসিয়া ওঠেন। তা ছাড়া ভাব ও ভাবনা প্রকাশের ভিতরে এখানে কোন নৈয়ায়িক কঠোরতায় আমাদের মন দৃঢ়ভাবে বদ্ধ থাকে না। কবি দেশ-বিদেশের জলে স্থলে কখনও ভাসিয়া চলিতেছেন, কখনও ছুটিয়া চলিয়াছেন,—কিন্তু এই ভাসা এবং ছোটা এই উভয় ক্ষেত্রের কোথাও গন্তব্যস্থলটাই কবির কাছে সবচেয়ে বড় জিনিস হইয়া ওঠে নাই—গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে মোটের উপরে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে একটা আকর্ষণ থাকিলেও আশে-পাশে তাকাইতে তাকাইতে পথ-চলার সবটাকেই তিনি যতদূর সম্ভব উপভোগ করিতে করিতে চলিয়াছেন,—তাহাতে নির্দিষ্ট তালিকা হইতে যদি কিছু কিছু বিচ্যুতিও ঘটিয়া থাকে সেজন্য কোন নির্দয় খবরদারী ছিল না। এই চল্‌তি-পথের লেখার ভিতরেও ছিল ঠিক সেই একই ধর্ম। ভ্রমণকাহিনী লিখিতে বসিয়া তিনি হয়ত অনেকস্থানে ভ্রমণকাহিনী লিখিয়াছেন খুব কম, তাহার ভিতরে সাহিত্য সম্বন্ধে, সাধারণ শিল্প সম্বন্ধে, সমাজ সম্বন্ধে, ধর্ম সম্বন্ধে, শিক্ষা সম্বন্ধে এবং রাজনীতি সম্বন্ধে নানা কথা ও মতামতই প্রকাশ করিয়াছেন বেশী,—কিন্তু সব জিনিসটাই চলতি প্রসঙ্গে ভাসিয়া আসিয়াছে। তাহার ফলে কোনও একটা বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌছাইবার জন্যই সব কথাগুলি তাড়াতড়া করিয়া একটানা ঠেলায় ঠেলিতে থাকে না,—পাঠকও বেশ আশে-পাশে চোখ ফেলিতে ফেলিতে প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে ভাসিয়া যাইতে পারেন,—প্রসঙ্গের চলতি স্রোত মাঝে মাঝে সিদ্ধান্তের ঘাটে ঘাটে থামিয়া থামিয়া নূতন নূতন ক্ষেত্রে মনকে টানিয়া লইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথাই বলা যায়,—"ভেসে চলার মধ্যে দিয়ে দেখার আর একটা গুণ হ'চ্ছে এই যে, তা মনোযোগকে জাগ্রত করে, কিন্তু মনোযোগকে বদ্ধ করে না।" (জাপান-যাত্রী)। রবীন্দ্রনাথের আলোচনা ও মতামতবহুল চিঠিগুলির এইখানেই পত্র-সুলভ বৈশিষ্ট্য।

রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি পত্র তাঁহার ভ্রমণের ডায়ারির মত। কিন্তু এই ডায়ারি লিখিতে গিয়া লেখক আদালতের হলফ পাঠ পূর্বক কোথাও নিছক

তথ্য সরবরাহ করিতে রাজি হন নাই। সমস্ত তথ্যগুলিকে প্রথমে নিজের ভিতরে সংহরণ করিয়া লইয়াছেন; সে তথ্যগুলি যখন কবির ভিতরে পৌছিয়া কবির 'হৃদয়ের জারক রসে' পরিপক্ব হইয়া কবির জীবনের তথা ব্যক্তিপুরুষেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ হইয়া উঠিয়াছে তখনই তিনি তাহাকে প্রকাশ করিয়াছেন। একস্থানে ডায়ারি-লেখা সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"কথায় কথা বেড়ে যায়। ব'ল্‌তে যাচ্ছিলুম ডায়ারি লেখাটা আমার স্বভাব-সঙ্গত নয়। আমি ভোলানাথের চেলা, ঝুলি বোঝাই ক'রে আমি তথ্য সংগ্রহ করিনে। আমার জলাশয়ের যে জলটাকে অন্যমনস্ক হ'য়ে উবে' যেতে দিই, সেইটেই অদৃশ্য শূন্যপথে মেঘ হ'য়ে আকাশে জমে, নইলে আমার বর্ষণ বন্ধ।" ['পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারী',—যাত্রী]

অন্যত্রও কবি বলিয়াছেন,—

"চোখের পেছনে চেয়ে দেখার একটা পাকযন্ত্র আছে, সেইখানেই দেখাগুলো বেশ ক'রে হজম হ'য়ে না গেলে সেটাকে নিজের ক'রে দেখানো যায় না। তা' নাই বা দেখানো গেল—এমন কথা কেউ ব'ল্‌তে পারেন। যেখানে যাওয়া গেছে সেখানকার মোটামুটি বিবরণ দিতে দোষ কি?

"দোষ না থাক্‌তে পারে,—কিন্তু আমার অভ্যাস অন্য রকম।—আমি টুঁকে যেতে টেঁকে যেতে পারিনে। কখনো কখনো নোট নিতে ও রিপোর্ট দিতে অনুরুদ্ধ হয়েছি, কিন্তু সে সমস্ত টুক্‌রো কথা আমার মনের মুঠোর ফাঁক দিয়ে গলে ছড়িয়ে পড়ে যায়। প্রত্যক্ষটা একবার আমার মনের নেপথ্যে অপ্রত্যক্ষ হ'য়ে গিয়ে তার পরে যখন প্রকাশের মঞ্চে এসে দাঁড়ায় তখনই তা'র সঙ্গে আমার ব্যবহার।" [জাপান-যাত্রী]

এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের সমস্ত ভ্রমণকাহিনী এবং তাহার ভিতরকার সমস্ত আলোচনা সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে। সমস্ত বিবরণ এবং আলোচনার ভিতরে তিনি কি বলিয়াছেন সেইটার দিকেই আমাদের মনের সমস্ত ঝোঁক পড়ে না, কে বলিতেছেন সেদিকেও আমাদের কৌতুহলের অন্ত নাই। সাহিত্যে এবং অ-সাহিত্যে এইখানেই মৌলিক তফাৎ।

"আমাকে তোমরা জিজ্ঞাসা কর্‌তে পার, আজ এতক্ষণ ধ'রে তুমি যে লেখাটা লিখ্‌চ, ওটাকে কী বল্‌বে? সাহিত্য না তত্ত্বালোচনা।

"নাই বল্লুম তত্ত্বালোচনা। তত্ত্বালোচনায় যে-ব্যক্তি আলোচনা করে, সে প্রধান নয়, তত্ত্বটাই প্রধান। সাহিত্যে সেই ব্যক্তিটাই প্রধান, তত্ত্বটা

উপলক্ষ্য। এই যে শাদা মেঘের ছিটে-দেওয়া নীল আকাশের নীচে শ্যামল-ঐশ্বর্যময়ী আঙিনার সামনে দিয়ে সন্ন্যাসী জলের স্রোত উদাসী হ'য়ে চলেচে, তার মাঝখানে প্রধানত প্রকাশ পাচ্ছে দ্রষ্টা আমি। যদি ভূতত্ত্ব ভূবৃত্তান্ত প্রকাশ করতে হ'ত, তাহলে এই আমিকে স'রে দাঁড়াতে হত। কিন্তু এক-আমির পক্ষে আর এক আমির অহেতুক প্রয়োজন আছে, এইজন্য সময় পেলেই আমরা ভূতত্ত্বকে সরিয়ে রেখে সেই আমির সন্ধান করি।" [জাপান-যাত্রী, ২]

রবীন্দ্রনাথের কোন লেখাই তাঁহার 'আমি'কে আড়াল করিয়া বা আবৃত করিয়া রাখিতে পারে নাই। সাহিত্য, সৌন্দর্য, শিল্পের স্বরূপ ও আঙ্গিক, ধর্ম, নীতি ও শিক্ষা প্রভৃতি যে-বিষয়েই তিনি আলোচনা করিয়াছেন, বুঝিতে কষ্ট হয় না—তাহা বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথেরই কথা। তবে আলোচনার মাত্রাধিক্য অনেকস্থানে পত্রগুলির পত্রত্ব অতিক্রম করিয়া গিয়া রবীন্দ্রনাথের ঐজাতীয় আলোচনাত্মক রচনার সমজাতীয় হইয়া উঠিয়াছে।

'ছিন্নপত্রে'র চিঠিগুলির ভিতরে কবিকে পরবর্তী কালের চিঠিগুলি অপেক্ষা বেশী পাওয়া যায়। ইহার একটা কারণ বোধ হয় এই, তখন পর্যন্তও কবির আত্মস্থ নির্জনতাকে একেবারে ভগ্ন করিয়া আমরা কবিকে সার্বজনীন বস্তু করিয়া তুলি নাই। 'ছিন্নপত্রে'র চিঠিগুলিও লিখিত কবির সহৃদয় ঘনিষ্ঠ বন্ধুগণের নিকটে এবং এ-পত্রগুলি অনেক খানিই 'একজন'কে লেখা। এই চিঠিগুলির ভিতর কবির অনেকগুলি কাব্যানুভূতির সহজ পরিচয় রহিয়াছে; এই কাব্যানুভূতিগুলিই রহিয়াছে 'সোনার তরী', 'চিত্রা' প্রভৃতি কবিতা-গ্রন্থের অনেক কবিতার পশ্চাতে। এইসকল গূঢ়ানুভূতির প্রকাশ ব্যতীতও এই চিত্রগুলির ভিতরে রবীন্দ্রনাথের ভিতরকার সাধারণ মানুষটির একটা অকৃত্রিম সরস পরিচয় রহিয়াছে। ছোট ছোট তুচ্ছ ক্ষুদ্র বর্ণনা ও টীকা-টিপ্পনী ভিতর দিয়া এই পরিচয়টি প্রকাশিত হইয়াছে দার্জিলিং হইতে একখানি চিঠিতে কবি বলিয়াছেন,—

"......মেয়েদের এবং অন্যান্য জিনিষ-পত্র ladies compartment-এ তোলা গেল, কথাটা শুনতে যত সংক্ষেপ হ'লো কাজে ঠিক তেমনটা হয় নি। ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি ছুটোছুটি নিতান্ত অল্প হয় নি—তবু ন—বলেন আমি কিছুই করিনি—অর্থাৎ একখান আস্ত মানুষ একেবারে আস্ত রকম খেপ্‌লে যে-রকমটা হয় সেই প্রকার মূর্তি ধারণ ক'রলে ঠিক পুরুষ মানুষের উপযুক্ত

হ'তো। কিন্তু এই দু'দিন আমি এত বাক্স খুলেছি এবং বন্ধ করেছি এবং বেঞ্চির নীচে ঠেলে গুঁজেছি ; এবং উক্ত স্থান থেকে টেনে বের ক'রেছি, এত বাক্স এবং পুঁটলির পিছনে আমি ফিরেছি এবং এত বাক্স এবং পুঁটলি আমার পিছনে অভিশাপের মতো ফিরেচে, এত হারিয়েছে এবং এত ফের পাওয়া গেছে এবং এত পাওয়া যায়নি এবং পাবার জন্য এত চেষ্টা করা গেছে এবং যাচ্ছে যে, কোনো ছাব্বিশ বৎসর বয়সের ভদ্রসন্তানের অদৃষ্টে এমনটা ঘটে নি।"

ইহার ভিতর দিয়া যে-রবীন্দ্রনাথ কথা কহিতেছেন তিনি আমাদের অতি নিকটের মানুষ—আমাদের আর পাঁচজনেরই মত মানুষ।

নবম অধ্যায়

রবীন্দ্র-যুগের অন্যান্য লেখকগণ

ঠাকুর পরিবারের ভিতরে রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত বিশুদ্ধ রচনা-সাহিত্যের প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১২৭৭—১৩০৬ সাল)। তাঁহার সাহিত্য-সাধনার কাল খুব দীর্ঘ ছিল না, তিনি মাত্র উনত্রিশ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন; কিন্তু এই স্বল্প জীবনের সাহিত্য-সাধনায়ই তিনি বাঙলা-সাহিত্যে একটি স্থায়ী আসনের অধিকারী হইয়া গিয়াছেন। খুব অল্পজীবী হইলেও বলেন্দ্রনাথের গদ্য-রচনা খুব অল্প নয়, তবু বেদনা এই জন্যে, মনে হয়, যাহা পাইতে পারিতাম তাহার অতি অল্পাংশই মাত্র পাইয়াছি, প্রতিভার সম্ভাবনার যে আশা পাইলাম, তাহার পরিণতি দেখিতে পাইলাম না। প্রথমে তিনি 'বালক' পত্রিকায় লিখিতে আরম্ভ করেন, পরে 'সাধনা' পত্রিকার লেখক হন; 'সাহিত্য' পত্রিকাতেও তাঁহার কিছু কিছু রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। বলেন্দ্রনাথের এই রচনাগুলি পাঠ করিলে প্রথমে মনে হয়, বলেন্দ্রনাথ সাধারণ পাঁচজনের ন্যায় প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়া রচনা লেখেন নাই,—রচনা লিখিবার একটি বিশেষ সাহিত্যিক প্রতিভা লইয়াই তিনি রচনা লিখিয়াছেন। রচনা-সাহিত্যে এই প্রতিভার পরিচয় তাঁহার চিত্তের নব নব উন্মেষের ফলে নব নব সৃষ্টিতে। বলেন্দ্রনাথের চিত্তের ভিতরে যথার্থ কবিজনোচিত নব নব উন্মেষ ছিল, আর সেই বিচিত্র চিত্ত-স্পন্দনকে শব্দময় রূপ দান করিবার তাঁহার একটা সহজ নৈপুণ্য ছিল। বলেন্দ্রনাথের চিত্তধর্ম রবীন্দ্রনাথের চিত্তধর্মের একান্ত অনুরূপ ছিল; এই জন্যই বলেন্দ্রনাথের সাহিত্যিক প্রতিভা রবীন্দ্রনাথের স্পর্শ ও প্রভাবেই উদ্বুদ্ধ এবং বিকশিত হইয়াছিল। শুধু পার্থক্য এই, রবীন্দ্রনাথের ভাব প্রধানতঃ সঙ্গীতাশ্রয়ী হইয়া কাব্য-কবিতার রূপ গ্রহণ করিয়াছে, বলেন্দ্রনাথের ভাব প্রধানতঃ ভাবনাশ্রয়ী হইয়া গদ্য রচনার রূপ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু মূলতঃ ভাবাশ্রয়ী হওয়াতে বলেন্দ্রনাথের রচনার ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি অনেক স্থলে কাব্যধর্মী হইয়া উঠিয়াছে।

বলেন্দ্রনাথ বহু বিষয়ে রচনা লিখিয়াছেন। তাহার ভিতরে সামাজিক আছে,

সাহিত্য-বিষয়ক—বিশেষতঃ সংস্কৃত সাহিত্য-বিষয়ক আছে, প্রাচীন ভারতের তীর্থ, মন্দির বা বিশেষ কোন জনপদ সম্বন্ধেও আছে,—আবার কতগুলি আছে চিত্তের একটি সুকুমার ভাবনাকে অবলম্বন করিয়া কাব্যময় রচনা। এই সমস্ত রচনারই পশ্চাতে রহিয়াছে বলেন্দ্রনাথের কাব্য-সাধনার একটা গভীর আন্তরিকতা,—একটা নির্মল সততা। কাব্য-সাধনার ক্ষেত্রে কোন কৃত্রিম ঢঙ্‌কে তিনি বরদাস্তই করিতে পারিতেন না। 'সাহিত্যে' (২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা) প্রকাশিত তাঁহার 'কবি ও সেন্টিমেণ্টাল' রচনায় তিনি প্রকৃত কবি ও কৃত্রিম 'সেন্টিমেণ্টাল' কবির ভিতরে বিদ্রূপের কাঁটাতার দিয়া একটি ভেদের সীমানা তৈয়ারী করিয়া দিয়াছেন।

"একদল লোক কবিতা রচনা করেন, অর্থাৎ প্রকৃতির প্রাণের মধ্যে ডুবিয়া ভাষায় তাহার সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলেন, মানবের অগাধ হৃদয়ে বসিয়া সেখান হইতে সঙ্গীতে ছন্দে মধুরতায় প্রেমের গভীর বিচিত্র রহস্য ব্যক্ত করিয়া দেন, অন্তর বাহিরে আসিয়া ফুটে, বাহির অন্তরে আশ্রয় লাভ করে। আর এক দল লোক আকাশে তারা দেখিলেই অর্দ্ধনিমীলিত অনিমেষনেত্রে পরম গাম্ভীর্য্য সহকারে সেই দিকে চাহিয়া নিঃস্পন্দবৎ নীরবে বসিয়া থাকেন, দিগন্তে চন্দ্র উঠিলেই—বোধ করি অন্তরে দারুণ বিরহ অনুভব করিয়া—করতলে কপোল-ভার ন্যস্ত করিয়া দেন, আলুথালু শিথিল দেহযষ্টি ছড়াইয়া দিয়া চন্দ্রকরে হৃদয়ের ব্যথা অনুভব করেন, যথারীতি সঘনে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া জ্বালা জুড়ান। ইহারা জামার বোতাম আঁটেন না, কেশবিন্যাসে যথেষ্ট যত্নপূর্ব্বক সমধিক ঔদাস্য ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পান; সংসার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতার গর্ব্ব করেন, এবং অহরহ করকমলে হালফেসানের কাব্যগ্রন্থ লইয়া ফিরেন, তৎসম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেন, টীকা করেন, অন্ততঃ সমালোচনা না করিয়া ছাড়েন না।"

বলেন্দ্রনাথ এই দ্বিবিধ কবি সম্প্রদায়ের ভিতরে প্রথম সম্প্রদায়ের কবিধর্ম লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার রচনার ভিতরে এ-কথার প্রমাণ আছে।

বলেন্দ্রনাথের সংস্কৃত সাহিত্যের সমালোচনাত্মক অনেক প্রবন্ধ আছে—রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাত্মক প্রবন্ধগুলির ন্যায় এই প্রবন্ধগুলিও 'রচনা' হইয়া উঠিয়াছে; সমালোচনার ভিতর দিয়া প্রাচীন সাহিত্যকে 'রচনা' করিয়া লইবার ক্ষমতা বলেন্দ্রনাথের লেখার ভিতরে বহুস্থানে বেশ স্পষ্ট। কাব্য

সমালোচনা করিতে বসিয়া তিনি শুধু কাব্যের অঙ্গে বিশ্লেষণী ছুরিকা চালাইতেন না, তিনি একটি বিশেষ রসদৃষ্টিতে আলোচনার ভিতর দিয়া একটা কিছু 'রচনা' করিয়া লইতেন। এই রসদৃষ্টি এবং রচনক্ষমতা ছিল বলিয়াই দেখিতে পাই, লেখক যেখানে 'পশুপ্রীতি' ('সাধনা', ৩য় বর্ষ, ১ম ভাগ) সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বসিয়াছেন, সেখানেও প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের ভিতর দিয়া কবিদের 'পশুপ্রীতি'র পরিচয় প্রসঙ্গে তিনি সংস্কৃত কাব্যের একটি বিশেষ সুকুমার রূপ আমাদের দেখাইয়াছেন। এই বিশেষ রূপটি যে আলোচ্য কবিদের কাব্যের ভিতরেই সবটা নিহিত ছিল, একথা বলিতে পারি না,— প্রাচীন কাব্যে যাহা ছিল, সমালোচক যেন তাহাকে আরও সুকুমার করিয়া নিজের দরদ মিশাইয়া সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন। এ বিষয়েও বলেন্দ্রনাথের প্রতিভা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার সমকক্ষ না হইলেও অনেকখানি সমধর্মা।

বাল্যকালে নিজের নবোদ্ভিন্ন বিচিত্র কল্পনার সাহায্যে কি করিয়া যে সমস্ত সাহিত্যকে লেখক একেবারে নিজের করিয়া লইতেন 'সাধনায়' প্রকাশিত 'তখনকার কথা' রচনাটির ভিতরে তাহার চমৎকার বর্ণনা রহিয়াছে।

"প্রথম যখন কাব্য পড়িতে আরম্ভ করি আমার বয়স খুব বেশী নয়, একটি ছোট আলমারি ছিল, দুই চারিখানি বই, একলাটি এক ঘরে বসিয়া পড়িতাম; স্পষ্ট মনে নাই—চোখের সম্মুখে আবছায়ার মত তখনকার কতকগুলি চিত্র উদয় হয়।

* * * *

"কেবলি কল্পনার সুখ— তখনও চিন্তা করিবার বয়স হয় নাই। নূতন ভাব সহজেই হৃদয়ে স্থান পায়, নূতন স্বাধীনতায় অবিশ্বাস জন্মে না। অথচ অতীতের বহুদিনের বিস্মৃত শৈবালকুটীরে প্রাচীন বেদগান ও হোমধূমের মধ্যে নিরালায় বাস করিবার মনে মনে একটা গভীর আকাঙ্ক্ষা। সেটা বোধ করি ভারতবর্ষের মাটিতে জন্মগ্রহণ করিবার ফল।

"নূতন নূতন কবির রচনায় আমার মনের মধ্যে একটি নূতন জগৎ উদ্ভাসিত হইল। সেখানে এই পুরাতন সৃষ্টি বিচিত্র বর্ণে বিচিত্র ছায়া-আলোকে নূতন সৌন্দর্যে ফুটিয়াছে। এই সন্ধ্যা, এই উষা, এই স্নেহ প্রেম বেদনার জ্বালা, কিন্তু ঠিক এমনিতর নহে; সে জগতে এখানকার অনেক জিনিষ নাই, অনেক যাহা আছে এখানে তাহা স্বপ্ন বই নয়।

"নবোন্মেষিত হৃদয় নবীন কল্পনায় এই নূতন জগৎ মনের মত করিয়া

ভাঙ্গে গড়ে। কোন বাধা নেই, কাহাকেও কৈফিয়ৎ দিতে হয় না ; আমার মায়াপুরীতে আপনি একেলা বাস করি—কল্পনাই সুখে দুঃখে একমাত্র সহচরী।”

প্রাচীন সাহিত্য, শিল্পকলা প্রভৃতির আস্বাদনে এবং সমালোচনায় বলেন্দ্রনাথ সর্বদাই আলোচ্য বিষয়ের উপরে নূতন আলোকপাত করিতে পারিতেন। আসলে সমস্ত লেখার পশ্চাতেই তাঁহার নিজস্ব ভাবদৃষ্টি ছিল, তাই তাঁহার সাহিত্য বা শিল্পালোচনায় সর্বদাই আমরা একটা সূক্ষ্ম লিরিক সুর লক্ষ্য করিতে পারি। ‘হিন্দু দেবদেবীর চিত্র’ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া লেখক বলিতেছেন,—

“আমাদের সুখ দুঃখ, বেদনা, আশা, সৌন্দর্য্য, প্রেম, মোহ, আকাঙ্ক্ষা সকলই এই দেবলোকে। যাহা কিছু মর্ত্ত্য—নিতান্তই ঐহিক—তাহাও আমরা মর্ত্ত্য-লোকে সাহস করিয়া রাখিতে পারি নাই ; দেবতাকে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি। তাই যোগী শিবকে পার্ব্বতীর সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া এই মর্ত্ত্য গার্হস্থ্যকে কৈলাসের অমর লোকে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। কন্দর্পকে কেবলমাত্র সামান্য নরনারীর হৃদয়ের বন্ধন না করিয়া হরপার্ব্বতীর চিরবন্ধনরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। যমুনাতীরের তমালচ্ছায়া-সুপ্ত সুন্দর আহীর-পল্লীটিকে মানবের না রাখিয়া দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখানে যুদ্ধ বিগ্রহ, দ্বন্দ্ব কোলাহল, মান অভিমান, প্রণয় বিরহ যেমন যাহা ঘটে, দেবলোকে সবই বজায় আছে ; কেবল, এখানে মৃত্যু আছে, সেখানে মৃত্যু নাই। মৃত্যুও সেখানে অমর।

“কিন্তু এই মৃত্যুই মর্ত্তের প্রধান সৌন্দর্য্য—পৃথিবীর সকল সুখদুঃখ বেদনা আনন্দের পরম পরিণাম। এই যে সকলই আছে অথচ সর্ব্বদাই হারাইবার ভয়, এই যে নশ্বরতা, ইহাতেই ইহলোকের সকল সুখদুঃখ নিহিত। দেবলোকে যদি এই মৃত্যু না রহিল, তবে দেবতাদের সুখদুঃখের সহিত আমাদের সুখদুঃখের সম্বন্ধ কিসের ? ভারতীয় হৃদয় সুতরাং অমর ধামেও মৃত্যুর ছায়া রচনা না করিয়া থাকিতে পারিল না। সতীর দেহত্যাগে ও রতিপতির অনঙ্গীকরণে এই মৃত্যুরই অনুরূপ চিত্র সূচিত হইয়াছে।”

রচনার পশ্চাতে লেখকের এই ভাবদৃষ্টি সকল প্রকারের সাহিত্যিক রচনার প্রাণবস্তু,—এইখানেই ধরা পড়ে সাহিত্যিক এবং অসাহিত্যিকের ভিতরকার মৌলিক প্রভেদ। স্পষ্টতঃই দেখিতে পাই, বলেন্দ্রনাথের এই-

জাতীয় রচনায় লেখক একটি রসমূর্তিতে আমাদের মনে রসের দোলা দিতে দিতে চলেন।

উড়িষ্যার কণারকের মন্দির বিষয়ে তাঁহার যে লেখা তাহা প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা ছিল সমধিক, কিন্তু একটি গভীর সহৃদয় দৃষ্টিতে, ভাবনার ব্যাপ্তিতে এবং আন্তরিকতায়, প্রকাশের স্বাচ্ছন্দ্যে লেখাটি সাহিত্যিক রচনা হইয়া উঠিয়াছে। নিপুণ বিশ্লেষণী বুদ্ধি অপেক্ষা সৌন্দর্য ও মহিমার একটা সামগ্রিক দৃষ্টিই এখানে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে।

"কণারকে এখন কিছুই নাই, ধূ ধূ প্রান্তর মধ্যে শুধু একটি অতীতের সমাধিমন্দির—শৈবালাচ্ছন্ন পরিত্যক্ত জীর্ণ দেবালয় এবং তাহারই বিজন বক্ষের মধ্যে পুরাতন একটি বিপুল কাহিনী। সেই পুরাতন দিন—যখন এই মন্দির-দ্বারে দাঁড়াইয়া লক্ষ লক্ষ শুভ্রকান্তি ব্রাহ্মণ যাজক যজ্ঞোপবীত জড়িত হস্তে সাগরগর্ভ হইতে প্রথম সূর্য্যোদয় অবলোকন করিতেন; নীল জল শুভ্র আনন্দে তাঁহাদের পদতলে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত এবং নীল আকাশ প্রীতিভরে অরুণিম আশীর্ব্বাদধারা বর্ষণ করিত। তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতে সিংহলে, চীনে এবং অন্যান্য নানা দূরদেশে পণ্য ও যাত্রী লইয়া নিত্য যে সকল বৃহৎ অর্ণবযান যাতায়াত করিত, তাহাদের নাবিকরা এই কোণার্কমন্দিরের মধুর ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া বহুদিন সন্ধ্যাকালে দূর হইতে দেবতাকে সসম্ভ্রম অভিবাদন জানাইত; এবং দেবতার জয়ঘোষণায় তরণীর সুবিস্তৃত চীনাংশুককেতু উড্ডীয়মান হইত।

* * * * *

"কণারকে এখন দেবতা নাই—এত কথা বলা খাটে না। কিন্তু সমস্ত প্রান্তর জুড়িয়া সেখানে এক নিশ্চল বৈরাগ্য বাসা বাঁধিয়াছে। তাহার মুখে কেবল হায় হায়। বৈদান্তিক মায়াবাদীর মত সে শুধু বলিতেছে, জীবন অনিত্য, যৌবন অনিত্য, ধনজন অনিত্য, সুখ অনিত্য, সংসার অনিত্য, সকলি যেখানে অনিত্য ও মায়া সেখানে দেবালয়ে এ বিড়ম্বনা কেন? দ্বাদশ বৎসরের দুর্ভিক্ষ দিয়া এ পাষাণস্তূপ রচনা করিয়া কি ফল? দেশ কাল ত সাগরবক্ষে একটা ক্ষণিক বুদ্বুদ মাত্র; হায়, মায়াহত তুমি জানিয়া শুনিয়াও ইহা বুঝিলে না।

মায়াই বটে—বিধাতার মায়ারাজ্যে এ শুধু মানবের মায়া-স্বপ্ন।

* * * * *

"পরিত্যক্ত পাষাণস্তূপের নির্জন নিকেতনে নিশাচর বাদুড় বাসা বাঁধিয়াছে,

হিমশিলাখণ্ডোপরি বিষধর ফণিনী কুণ্ডলী পাকাইয়া নিঃশঙ্ক বিশ্রাম সুখে লীন হইয়া আছে; সম্মুখের ঝিল্লিমুখরিত প্রান্তরদেশ দিয়া গ্রাম্য পথিকজন যখন কদাচিৎ দূর তীর্থ উদ্দেশে যাত্রা করে, একবার এই জীর্ণ দেবালয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখে এবং বিলম্ব না করিয়া আসন্ন সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই দ্রুতপদে আবার পথ চলিতে থাকে। কণারক এখন শুধু স্বপ্নের মত; যেন কোন্ প্রাচীন উপকথার বিস্মৃতপ্রায় উপসংহার শৈবালশয্যায় এখানে নিঃশব্দে অবসিত হইতেছে এবং অস্তগামী সূর্য্যের শেষ অস্তরেখায় ক্ষীণ পাণ্ডু মৃত্যুর মুখে রক্তিম আভা পড়িয়া সমস্তটা একটা চিতা-দৃশ্যের মত বোধ হয়।"

['কণারক', সাধনা, ২ বর্ষ]।

কণারক সম্বন্ধে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার মূল্য যথেষ্ট, সেদিক হইতে বিচার করিলে আমরা বলেন্দ্রনাথের এই রচনাকে তেমন মূল্য দিতে পারি না; কিন্তু যে কারণে কণারক সম্বন্ধে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার অতিরিক্ত একটা গীতি-কবিতা পাইতেও আমাদের ভাল লাগে, ঠিক সেই একই কারণে এই রচনাটিও আমাদের ভাল লাগে। শুধু ভাবদৃষ্টির দিক হইতে নহে, বচনভঙ্গির দিক হইতেও ইহার স্থানে স্থানে এমন সৌকুমার্য রহিয়াছে যাহা রবীন্দ্রনাথের লেখা ব্যতীত অন্য লেখায় খুব সুলভ নহে। "শৈবালাচ্ছন্ন পরিত্যক্ত জীর্ণ দেবালয় এবং তাহারই বিজন বক্ষের মধ্যে পুরাতন দিনের একটি বিপুল কাহিনী", "নীল আকাশ অবারিত প্রীতিভরে অরুণিম আশীর্ব্বাদধারা বর্ষণ করিত", "সমস্ত প্রান্তর জুড়িয়া সেখানে এক নিশ্চল বৈরাগ্য বাসা বাঁধিয়াছে",—ইহার প্রত্যেকটি কথার ভিতরে লেখক অনেক কথা এবং অনেক সৌন্দর্যকে ঘনীভূত করিয়া বলিয়াছেন,—সেই ঘনীভূত কথার দ্যোতনাই সমগ্র বর্ণনাকে হৃদয়গ্রহী করিয়া তুলিয়াছে। 'খণ্ডগিরি', 'বারাণসী', 'প্রাচীন উড়িষ্যা' প্রভৃতি সম্বন্ধেও বলেন্দ্রনাথের এই জাতীয় রচনা রহিয়াছে। বলেন্দ্রনাথের কবি-মনটি ছিল অনেকখানি রোম্যান্টিক-ধর্মী,—তাই প্রাচীন সম্বন্ধে—অস্পষ্ট সুদূর অতীত সম্বন্ধে তাঁহার হৃদয়ের একটা সহজাত আকর্ষণ ছিল। কল্পনার বহুবিচিত্র রঙের সহিত হৃদয়ের স্নিগ্ধ স্পর্শ মিলিত করিয়া তিনি অতীতের চিত্র অঙ্কন করিতেন। 'প্রাচীন উড়িষ্যা' সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা কতখানি ঐতিহাসিক এবং ভৌগোলিক সত্য তাহা নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারি না,—কিন্তু ইহা যে অনেক স্থানেই সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে একথা

নিঃসংশয়ে বলা যায়। বলেন্দ্রনাথের সামাজিক প্রবন্ধের ভিতরেও এই জাতীয় অতীত-প্রীতির পরিচয় রহিয়াছে ; তবে সামাজিক ক্ষেত্রে এই অতীত-প্রীতি শুধু রোম্যাণ্টিক্ কল্পনার উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে,—হৃদয়ের প্রবণতাকে সেখানে যুক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবারও চেষ্টা রহিয়াছে।

অতীত-প্রীতি ব্যতীতও অনেক রচনায় নানা ভাবে বলেন্দ্রনাথের রোম্যাণ্টিক্ কবিমনটি প্রকাশ পাইয়াছে। যেমন 'শরৎ বসন্ত' রচনাটি। শরৎ এবং বসন্তের প্রকৃতিগত পার্থক্যের কথা বলিতে গিয়া লেখক বলিতেছেন,—

"শরতের স্মৃতিও অস্পষ্ট। তাহার স্মৃতিতে একটা আবছায়া--যেন কবে-কোথায়-কি ঘটিয়াছে। বসন্তের স্মৃতি বেশ স্পষ্ট—সেই কোন মদির-মিলনময়ী রজনীর অগাধ বিলাস সুখ। বসন্ত সুখে ভোর, তাহার স্মৃতি অতীতের সুখে মন্থন করিয়া। শরৎ অতীতের দুঃখের মধ্যে আনন্দ উপভোগ করে, সুখে সুখ তাহার মন বিচরণ করিতে পারে না। শরতের স্মৃতিতে একটা অস্পষ্ট দুঃখের ছায়া-সুখ, কোন বিরহরজনীতে এমনিতর ম্লান জ্যোৎস্না ফুটিয়াছিল, এমনিতর নিঃশব্দ ক্ষীণ সৌরভে বাতাস মৃদু বহিয়াছিল, আকাশের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শুভ্র মেঘখণ্ড পানে চাহিয়া শরৎ সারানিশি বাতায়নে বসিয়া। বিস্মৃত স্বপ্নের মত সেই কুজ্ঝটি-অবগুণ্ঠিত ম্লান জ্যোৎস্নালোকে শরতের বেদনাবিদ্ধ হৃদয়ে মৃদু ছায়াকম্পনে ঈষৎ জাগিয়া উঠে।"...... [গ্রন্থাবলী, পৃঃ ১৭৩]

বলেন্দ্রনাথের ভিতরে একটি বিশুদ্ধ রিলিক কবির ধাত ছিল। প্রত্যেক বস্তু বা ঘটনার যে একটা ব্যবহারিক মূল্যামূল্য রহিয়াছে আমাদের সাধারণ মন তাহা দ্বারাই সর্বদা নিয়ন্ত্রিত হয়, ফলে যাহার কোন ব্যবহারিক গুরুভার নাই, তাহা আমাদের চোখে পড়ে না,—দৈনন্দিন তুচ্ছ ক্ষুদ্রতার অবজ্ঞাত তালিকাতেই তাহাদের একমাত্র স্থান। যথার্থ কবিমনের ভিতরে থাকে জাগতিক মূল্যামূল্য সম্বন্ধে একটা নিরাসক্তি—তাহার ফলে একটি বিশেষ মুহূর্তে আমাদের একটি বিশেষ মানসিক অবস্থানের ভিতরে অতিপরিচিত বস্তুগুলিও তাহাদের একটা স্বতন্ত্র মহিমায় আমাদের মনের সম্মুখে রহস্যে উজ্জ্বল হইয়া ওঠে। বলেন্দ্রনাথের 'দেয়ালের ছবি' (সাধনা, ১ম বর্ষ) রচনাটির ভিতরে এই জাতীয় একটি কবিদৃষ্টি রহিয়াছে। দেয়ালে টানানো রহিয়াছে দেশ-বিদেশের অনেকগুলি ছবি ; কোথাও "সরসী তীরে শ্যাম তরুচ্ছায়ে তৃণশয্যোপরি সুখসুপ্তা রমণী,..... আলুথালু বসন-প্রান্তে অর্দ্ধ-অনাবৃত চারু যৌবন চারু চন্দ্রালোকে মৃদু চঞ্চল।......" তাহারই পাশে—"দূরে জ্যোৎস্নাসিক্ত

একখানি গ্রাম—অস্পষ্ট ধোঁয়া গোলাঘর, কুটীর, বেড়া, প্রাঙ্গণে দীর্ঘ ছায়াতরু, দেয়াল বাহিয়া লতা।" মধ্যে কতকগুলি অন্য ছবি, তাহার পরে "তুষারের উপর পড়িয়া রাখাল বালক, পার্শ্বে হিমক্লিষ্টমুখে বালিকা সহচরী বসিয়া—একাকিনী কোনও উপায় করিতে পারিতেছে না।" আবার "কোথাও প্রান্তরে শান্ত শিকারী, নিকটে প্রভুভক্ত কুকুর সমস্ত দিনের বিফল পরিশ্রমের পর থাবা পাতিয়া বসিয়াছে। চারিদিকে আর কেহ নাই।" ……"অন্যত্র বিচিত্র গার্হস্থ্য দৃশ্য। নবীন যৌবন নব প্রণয়িনীর সহিত গোপনে প্রেমালাপে রত। সন্ধ্যাবেলায় গৃহকোণে গল্প শুনিবার জন্য ছেলেরা প্রবীণাকে ঘিরিয়া বসিয়াছে।"…… এমনি করিয়া চারিপাশে দেশী বিদেশী বহু ছবি। দেশ-বিদেশের বিচিত্র জীবনধারার বিচিত্র লীলা—পাশাপাশি সাজানো। লেখকের কাছে জীবনের এই বিচিত্র লীলা জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিতেছেন—

"এই ছবিগুলি দিয়া আমার মনের মধ্যে জগতের মায়াময়ী ছায়াপুরী রচনা করিয়াছি। বসিয়া বসিয়া দেখি, আর আমার মনের মধ্যে ইহারা জীবন্ত হইয়া উঠে, ছায়ার মত আসে যায়, বিচরণ করে। আমি ইহাদের সুখদুঃখ বেদনার মধ্যে আপনাকে বিস্মৃত হই।"

বলেন্দ্রনাথের আর একটি রচনার বিষয় 'পুরাতন চিঠি', (সাধনা, ১ম বর্ষ) —শৈশবস্মৃতি জড়ান বন্ধুদের চিঠি। এ জাতীয় রচনা একেবারেই ব্যক্তিগত জিনিস; কিন্তু নিজের ব্যক্তিটির'ও সাধারণীকৃতি চলে, এবং রিলিক্ কবিতায় আমরা তাহাই করি,—এজাতীয় রচনার ক্ষেত্রেও তাহাই করি। এই পুরাতন চিঠিগুলি সম্বন্ধে উপসংহারে লেখক বলিতেছেন—

"ছোট্ট ডেস্কের মধ্যে আমার ছোটখাট অতীত চাবি-বন্ধ। আমার পুরাতন জীবন ইহারই নিভৃত খোপে নিরিবিলি বাস করে। কিন্তু এখানেও নিরুপদ্রব নহে। অদৃষ্টকীট নিঃশব্দে তাহাকে কাটিতে থাকে।

"আমি বর্তমান-শ্রান্ত পথিক, মধ্যে মধ্যে এই পুরাতনের স্নেহে শান্তি লাভ করিতে আসি। চুপিচাপি আমার শৈবালাচ্ছন্ন অতীতের সমাধি মন্দিরে গিয়া একা একা বসিয়া থাকি। একটি পেন্সিলের দাগে দুইটি পুরাতন পরিচিত হাতের অক্ষরে আমার সমস্ত পুরাতন—আমার সমস্ত অতীত।"

বলেন্দ্রনাথের 'নীরবে' (সাহিত্য, ১৩২৩) রচনাটিও একেবারেই আত্মনিষ্ঠ রিলিক রচনা। 'জানালার ধারে' (সাধনা, ১ম বর্ষ) রচনাটি এই জাতীয়

রচনার ভিতরে বেশ উল্লেখযোগ্য। ঘরের জানালার পাশে বসিয়া থাকিয়া কি করিয়া বহির্বিশ্বের সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ের গভীর যোগ সাধিত হইত সেই কথাটি রচনার বিষয়বস্তু। সেই নিরালা গৃহবাতায়নে বসিয়া মনে হইত,—

"সীমাহীন ছায়াহীন বাহিরের অগাধ রূপরাশি আমাকে বাহিরে টানে, গৃহ হইতে জগতে লইয়া যাইতে চায়, আমার গৃহকোণে এই নিভৃত মলিন ছায়া ম্লান নীরব কাতরতায় আমাকে বাঁধিয়া রাখে। আমি সংসারে সুখের মাঝে বাহির হই না, এই চিরম্লান পরিত্যক্ত ছায়ার পার্শ্বে এমনি বসিয়া থাকি, মানব-হৃদয়ের ছায়াময়ী বেদনা অনুভব করি।"

বলেন্দ্রনাথের একজাতীয় রচনা আছে, সেগুলি কথার তুলিকায় অঙ্কিত ছবি। শুধু দৃশ্যের পর দৃশ্য সাজাইয়া ছবিখানিকে সমগ্রতা দান করা হইয়াছে। এই জাতীয় রচনার নমুনাস্বরূপে 'বনপ্রান্ত' (বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, পৃঃ ১০-১২), 'চন্দ্রপুরের হাট' (ঐ, পৃঃ ৫-৯), 'পুলের ধারে' (ঐ, পৃঃ ১৩-১৬), 'সূর্য্যাস্ত ও চন্দ্রোদয়' (ঐ, পৃঃ ১৫২-১৫৩) প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই রচনাগুলি প্রকৃতিতে অনেকখানি ল্যাণ্ডস্কেপ পেইন্টিং' জাতীয়,—শুধু এখানে সেখানে লেখক নিজের মনের রঙ একটু মিশাইয়া দিয়াছেন। যেমন 'বনপ্রান্ত' রচনার শেষে লেখক বলিতেছেন,—

"আমার সেই গরুর গাড়িটি আবার চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। গাড়িও চলিয়াছে বেলাও চলিয়াছে। কিন্তু তাহার চাকার শব্দ নাই, তাহার চলার বিরাম নাই, তাহার যাত্রার শেষ নাই। সে যে সুনীল অনন্ত ক্ষেত্রের মাঝখান দিয়া অবিশ্রাম চলিতেছে; সেই সুনির্ম্মল ক্ষেত্রে তাহার চাকার একটি চিহ্নও পড়ে না, কেবল তাহার পথের পার্শ্বে তারা ফুটিয়া উঠে, চাঁদ হাসিয়া চায়, সূর্য্য জাগিয়া উঠে; তাহার চারিদিকে জনকোলাহল, জন্ম মৃত্যু, সংসারের যোঝাযুঝি; কিন্তু সে কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মুখের উপরে গভীর আচ্ছাদন টানিয়া দিয়া একাকী নিঃশব্দে মাঝখান দিয়া চলিয়া যাইতেছে।"......

অতি অল্প কথায় বলেন্দ্রনাথ তাঁহার রচনার ভিতরে তাঁহার মনের রঙ ধরাইতে পারিতেন। 'কাহিনী' (গ্রন্থাবলী, পৃঃ ২৯-৩০) রচনাটির ভিতরে দেখিতে পাই—

"ফুল ঝরিয়া পড়ে—জীবন ফুরাইয়া যায়—কাহিনী ঘুমাইয়া থাকে! ঘুমন্ত কাহিনী সময়ে সময়ে জাগিয়া উঠে—দুই চারিটা গভীর মর্ম্মভেদী

দীর্ঘনিশ্বাসের মধ্য দিয়া এক একবার দেখা দেয়। সংসারের অনন্ত সুখের মধ্যে কাহিনীর মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাসে একটুকু দুঃখের ছবি ফুটিয়া উঠে—অনন্ত সুখের কষ্ট যেন ধীরে ধীরে খানিকটা মুছিয়া যায়—প্রাণে শুধু কল্পনার একটু আধটু খেলাধূলা লাগিয়া থাকে।”

বলেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ পারিবারিক জীবনে ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ,—রবীন্দ্রনাথের বিরাট সাহিত্যিক প্রতিভার প্রভাব বলেন্দ্রনাথের উপরে কিছু কিছু থাকা অসম্ভব নহে; অন্ততঃ রচনাকার হিসাবে উভয়ের ভিতরে যে সাধর্ম্য ছিল, সে কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এ-প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের মন্তব্য স্মরণীয়; তিনি বলিয়াছেন,—“বলেন্দ্রের সাহিত্যিক জীবনে যে বিশিষ্টতা ছিল সেই বিশিষ্টতার নির্ম্মাণে তাঁহার পিতৃব্যের কতটুকু কৃতিত্ব ছিল, আমরা বাহির হইতে তাহা ঠিক বলিতে পারি না। তবে রবিরশ্মির প্রভাব হইতে আপনাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য ছিল। অথবা বাংলার সাহিত্য-জগতের বহু গ্রহ উপগ্রহ ও বহুতর উল্কাপিণ্ড যাঁহার নিকট হইতে স্থায়ী বা ক্ষণিক প্রভা সংগ্রহ করিয়া দীপ্তি লাভ করিতেছে, বলেন্দ্রের মত অনুগামী ও অনুচরে তাঁহার জ্যোতির আংশিক প্রতিফলনে ক্ষুণ্ণ হইবার হেতু নাই। বরং এত সন্নিধানে অবস্থান করিয়াও তিনি যে তাঁহার নিজস্ব প্রতিভা প্রচুর পরিমাণে দেখাইতে পারিয়াছিলেন, ইহাতেই তাহার সামর্থ্যের বিশিষ্টতা।”

শিল্পচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শিল্পিমূর্তিটিকে ঘিরিয়া একটি সাহিত্যিক দীপ্তিও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার ‘বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী’ শুধু প্রবন্ধগুণসমন্বিত নহে,—যথেষ্ট রচনাগুণসমন্বিত; এবং আমাদের মতে বহুস্থানে এ লেখার রচনাগুণ প্রবন্ধগুণকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। এই লেখাগুলির ভিতরে লেখক শিল্পসম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ কতগুলি কাটাছাঁটা থিওরি সম্বন্ধেই আলোচনা করিতে বসেন নাই; অবনীন্দ্রনাথের ভিতরে একটি আজীবন শিল্পী রহিয়াছে, সেই শিল্পীরই আত্মপ্রকাশ এই লেখাগুলির ভিতরে। এই আত্মপ্রকাশের ভিতরে অবনীন্দ্রনাথের একটি স্বচ্ছ স্বতঃস্ফূর্ত নিজস্ব ভঙ্গি আছে; সেই ভঙ্গির চারুত্ব বক্তব্যকে সাহিত্যের রসব্যঞ্জনা দান করিয়াছে। শিল্পী মানুষের পরিচয় দিতে গিয়া লেখক বলিতেছেন,—

“বর্ষার মেঘ নীল পায়রার রং ধরে এল, শরতের মেঘ সাদা হাঁসের হাল্কা পালকের-সাজে সেজে দেখা দিলে, কচি পাতা সবুজ ওড়না উড়িয়ে এল

বসন্তে, নীল আকাশের চাঁদ রূপের নূপুর বাজিয়ে এল জলের উপর দিয়ে, কিন্তু এদের এই অপরূপ সাজ দেখবে যে সেই মানুষ এল নিরাভরণ, নিরাবরণ, শীত তাকে পীড়া দেয়, রৌদ্র তাকে দগ্ধ করে, বাস্তব জগৎ তার উপরে অত্যাচার করে, বিশ্বচরাচরে রহস্যের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের মধ্যে তাকে বন্দী করতে চায়—এই মানুষ স্বপন দেখলে অগোচরের অবাস্তবের অসম্ভবের অজানার, সেই দেখার মধ্য দিয়ে দৃষ্টি বদল করে' নিলে সৃষ্টির বাইরে এবং সৃষ্টির অন্তরে যে তার সঙ্গে অদ্বিতীয় শিল্পীর অপরাজিত প্রতিনিধি ; মানুষ মনোজগতের অধিকারী বহির্জগতের প্রভু।" [বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী, মত ও মন্ত্র।]

শিল্প সম্বন্ধে নানা আলোচনার ভিতর দিয়া এইভাবে অবনীন্দ্রনাথ নিজের শিল্পিমনেরই নানাভাবে পরিচয় দিয়াছেন। সে পরিচয়ের ভিতরে শিল্পীর সকল স্বপ্নের রঙ লাগিয়াছে। তাঁহার লেখার ভিতরে সমঝদারের নৈপুণ্য রহিয়াছে—পাণ্ডিত্যের দার্ঢ্য কম। শিল্প ও শিল্পীর অন্তর্নিহিত কথাগুলিকে তিনি যতটা পারিয়াছেন সহজভঙ্গিতে নিজের অনুভূতি মিশাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন। শিল্পী মানুষের পরিচয়েই লেখক অন্যত্র বলিয়াছেন,—

"খেলুড়ি রাজা হ'ল মানব শিশু—নটরাজ সে, নিজে নাচে বিশ্বকে নাচায়। বিশ্বরাজের লীলা-সহচর রূপ সমস্ত—চন্দ্র সূর্য জীব জন্তু ফুল পাতা মেঘ বৃষ্টি—তারা সবাই এই খেলুড়ির রাজা মানব-শিশুকে চিনলে, ঘিরে' ঘিরে' বল্লে তাকে—'হাসি কাঁদি যেমন নাচাও তেমনি নাচি'। মায়ের কোলে ধরা সেই মাটির ঘরের খেলুড়ি ছেলে মেয়ে দৃষ্টিতে ভোলে সে খেলনা পেয়ে। ফেলনা জিনিব দিয়ে তৈরি হ'ল না সে সমস্ত খেলাঘরের হেলা ফেলার পুতুল,—যে মাটিতে ভূমিষ্ঠ হয় প্রাণ, যে মাটিতে মাটি হ'য়ে মেশে প্রাণের পাত্র দেহ, সেই মাটিতে গড়া হ'ল পুতুল খেলার পুতুল। মাটির ঘরের ধারেই বাইরের খেলাঘরখানি পাতা, সেখানে আতা গাছে তোতাপাখী উড়ে' বসে' ডাকে—এস খোকা খেলি এস। মা বলেন—যেওনা খোকা। খোকা বলে—যাবো ; খেলতে কাঁদে খোকা, ভোলানো শক্ত তাকে চাঁদ মুখে রোদ লাগার ভয় দিয়ে। রোদও যে ডাকছে—গাছের পাতায় আলোর ফুলঝুরি জ্বালিয়ে আর মাটি দিয়ে নিকানো উঠোনের একধারে আলো ছায়ার চাকাচাকা ফুল সাজিয়ে খেলো এসে খোকা।

"বাইরে মাটির পুতুল তারা সব ডাক দেয় ঘরের পুতুলটিকে—হাত ছানি দিয়ে ইসারা করে' কথা কয়ে' গান গেয়ে। মন ভোলালো ছেলের, সে এক মায়ের কোল ছেড়ে আর এক মায়ের ঘরে খেলতে ছুটলো বাইরে। সেখানে চলে ধরা ছোঁয়ার খেলা জলে স্থলে ধরাতলে, মেঘে মেঘে আকাশতলে।" [বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী, খেলার পুতুল]

অবনীন্দ্রনাথের ভাষা কবিত্বের ভাষা এবং ইহার একটি বিশেষ ছন্দ রহিযাছে। গদ্যের ভিতর ছন্দকে এতখানি প্রধান করিয়া তোলার ভিতরে অবনীন্দ্রনাথের নিজস্ব কৃতিত্ব রহিয়াছে। এই গদ্যছন্দের নিপুণ পরিচালনায় লেখক গদ্য-পদ্যের ভেদরেখাকে অনেকখানি অস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। বিষয় এবং ভঙ্গি উভয় দিক হইতেই তাঁহার লেখা কাব্যধর্মী। অবনীন্দ্রনাথ তাহার সবজাতীয় লেখাসই রূপকথার ভঙ্গিটিকে নানাভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। রচনার ক্ষেত্রেও এই রূপকথাব ভঙ্গি স্থানে স্থানে তাঁহার লেখাকে একটা চমৎকারিত্ব দান করিয়াছে। যেমন—

"মহাজাতি রাজকন্যা ঘুমিয়ে থাকে, মহাকাল দৈত্যেব মতো তাকে ধরতে এসে কেল্লার দরজায ধাক্কা দিযে বলে, কে জাগে? বাজকুমারী সাড়া শব্দ দেন না, সাড়া দেয় যে পাহারা দিচ্ছে মহাজাতিব শিয়রে। কে জাগে?—সওদাগরের পুত্র জাগে। কাল নিরস্ত হয় আবার আসে দ্বিতীয প্রহরে, কে জাগে? মন্ত্রীপুত্র জাগে। তৃতীয প্রহর যায়,—কাল ফিরে' এসে বলে, কে জাগে? কোটালের পুত্র জাগে। রাতশেষে অন্ধকার পাতলা হয, কাল ছুটে এসে বলে, কে জাগে?—রাজপুত্র জাগে!"

রবীন্দ্রনাথেব সমসাময়িক লেখকগণের ভিতরে প্রমথ চৌধুরীর নাম দুই কারণে উল্লেখযোগ্য, প্রথমতঃ, আমরা পূর্বে রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক বা প্রায় সমসাময়িক যে-সকল লেখকের উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি প্রমথ চৌধুরী তাঁহাদের ন্যায় মোটামুটি প্রাচীন ধারার লেখক নহেন,—আবার তিনি রবীন্দ্র-যুগের লেখক হইয়াও রচনা লেখায় রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা দ্বারা আচ্ছন্ন নহেন। রচনার ক্ষেত্রে তাঁহার একটি নিজস্ব ভঙ্গি অতএব বিশেষ দান রহিয়াছে। তাঁহার রচনাগুলি সাময়িকপত্রে সাধারণতঃ 'বীরবল'-লিখিত বলিয়া প্রকাশিত।

বচনাকার হিসাবে 'বীরবল' পুরাপুরি মনটেইন্-পন্থী, আজকাল ইউরোপীয় সাহিত্যে বিশুদ্ধ রচনারূপে যে রচনাগুলিকে স্বীকার করা হয় বীরবলের

রচনাগুলি অনেকখানি তাহার সমজাতীয়। 'বীরবলের হালখাতা'য় প্রকাশিত রচনা-গুলির ভিতরে এই রচনাধর্ম স্পষ্টরূপে প্রকাশিত। লেখক এইরচনা-গুলির ভিতরেই বহুপ্রসঙ্গে নিজের রচনাধর্মের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি তাঁহার রচনার নাম দিয়াছেন 'খেয়াল খাতা', এবং এই 'খেয়াল খাতা'রও বিস্তারিত ব্যাখ্যা রহিয়াছে।

"এই খেয়াল খাতা ভারতীর চাঁদার খাতা। স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিত্তে যিনি যা দেবেন, তা' সাদরে গ্রহণ করা হবে। আধুলি সিকি দুয়ানি কিছুই ফেরৎ যাবে না, শুধু ঘসা পয়সা ও মেকি চল্‌বে না। কথা যতই ছোট হোক, খাঁটি হওয়া চাই,—তার উপরে চক্‌চকে হ'লেত কথাই নেই। যে ভাব হাজার হাতে ফিরেছে, যার চেহারা বলে' জিনিসটে লুপ্ত প্রায় হয়েছে, অতি পরিচিত বলে, যা আর কারো নজরে পড়ে না, সে ভাব-এ খেয়াল খাতায় স্থান পাবে না। নিতান্ত পুরাণো চিন্তা, পুরাণো ভাবের প্রকাশের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে,—আর্টিকেল লেখা। আমাদের কাজের কথায় যখন কোন ফল ধরে না, তখন বাজে কথার ফুলের চাষ কর্‌লে হানি কি?"

বীরবলের রচনা মুখ্যতঃ এই খেয়াল-খুশিতে 'বাজেকথার ফুলের চাষ'। কিন্তু রচনার স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা পূর্বেই দেখিয়া আসিয়াছি যে এই জিনিসটিকে প্রথমে যতটা সহজ এবং সুলভ বলিয়া মনে হয়, জিনিসটা তত সহজ নহে, সুতরাং সুলভও নহে। বীরবল নিজেই বলিয়াছেন,—

"খেয়ালী লেখা বড় দুষ্প্রাপ্য জিনিস। কারণ সংসারে বদ্‌খেয়ালী লোকের কিছু কমতি নেই, কিন্তু খেয়ালী লোকের বড় অভাব। অধিকাংশ মানুষ যা' করে, তা' আয়াস-সাধ্য। সাধারণ লোকের পক্ষে একটুখানি ভাব, অনেকখানি ভাবনার ফল। মানুষের পক্ষে চেষ্টা করাটাই স্বাভাবিক, সুতরাং সহজ। স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত চিন্তা কিংবা ভাব শুধু দু'একজনের নিজ প্রকৃতিগুণে হয়। যা' আপনি হয়, তা' এতই শ্রেষ্ঠ ও এতই আশ্চর্যজনক যে, তার মূল্যে আমরা দৈবশক্তি আরোপ করি।"

এই 'খেয়ালে'র রূপনির্ণয় করিতে লেখক সঙ্গীতশাস্ত্রের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই দৃষ্টান্তের ভিতর দিয়া রচনা-সাহিত্যের রূপও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—

"এক কথায় বলতে গেলে, ধ্রুপদের অধীনতা হতে মুক্ত হবার বাসনাই খেয়ালের উৎপত্তির কারণ। ধ্রুপদের ধীর, গম্ভীর, শুদ্ধ, শান্ত রূপ ছাড়াও পৃথিবীতে ভাবের অন্য অনেকরূপ আছে। বিলম্বিত লয়ের সাহায্যে মনের সকল স্ফূর্তি, সকল আক্ষেপ প্রকাশ করা যায় না। সুতরাং ধ্রুপদের কড়া শাসনের মধ্যে যার স্থান নেই—যথা তান গিটকিরি ইত্যাদি,—তাই নিয়েই খেয়ালের আসল কারবার। কিন্তু খেয়ালের স্বাধীন ভাব উচ্ছৃঙ্খল হলেও, যথেচ্ছচারী নয়। খেয়ালী যতই কার্দ্দানী করুন না কেন তালচ্যুত কিংবা রাগভ্রষ্ট হবার অধিকার তাঁর নেই।"

এই খেয়াল-খুশির রচনায় বীরবল সর্বদাই একটু হালকা চালের পক্ষপাতী, —এবং এই হালকা চালের ভিতর দিয়া তিনি কিছু হাস্যরস পরিবেশন করিতে চাহিয়াছেন।—

"আমার কথার ভাবে বুঝতে পারছেন যে, আমি খেয়াল বিষয়ে একটু হাল্কা অঙ্গের জিনিসের পক্ষপাতী। চুটকিও আমার অতি আদরের সামগ্রী, যদি সুর খাঁটি থাকে এবং ঢং ওস্তাদী হয়।......কিন্তু আমরা শুধু অভ্যাস করেছি নাকে কান্না! এবং এ কথাও বোধহয় সকলেই জানেন যে, সদারঙ্গ বলে গেছেন খেয়ালে সব সুর লাগে, শুধু নাকি সুর লাগে না। এই সব কারণেই আমার মতে এখন সাহিত্যের সুর বদলানো প্রয়োজন। করুণ রসে ভারতবর্ষ স্যাঁতসেঁতে হয়ে উঠেছে; আমাদের সুখের জন্য না হোক্, স্বাস্থ্যের জন্যও হাস্যরসের আলোক দেশময় ছড়িয়ে দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে।"

বীরবলের রচনাধর্মের পরিচয় উপরি-উদ্ধৃত মতামতগুলির ভিতরেই পরিস্ফুট এবং 'বীরবলের হালখাতা'র ভিতরে আমরা এই রচনাধর্মকেই দেখিতে পাই। 'হালখাতা' ব্যতীতও বীরবলের বিভিন্ন সাময়িকপত্রে হাল্কাচালের বিবিধ লেখা রহিয়াছে। কতকগুলি লেখা অবশ্য সাহিত্যের পরিধি ছাড়াইয়া রাজনীতির গণ্ডিতে গিয়া পড়িয়াছে। 'নীললোহিত'কে অবলম্বন করিয়া বীরবলের কিছু কিছু লেখা রহিয়াছে; এই 'নীললোহিতে'র ভিতরে 'কমলাকান্তে'র অস্পষ্ট আমেজ রহিয়াছে।

বীরবলের হাস্যরসের ভিতরে একটি অতর্কিত মৃদু ধাক্কা থাকে, তাহা রসিকতার সহিত বুদ্ধিকেও একটু একটু ঝাঁকানি দিতে দিতে চলে। এই বুদ্ধির ঝাঁকানিযুক্ত হাস্যরস পরিবেশের ভিতরে বীরবলের কয়েকটা

বিশেষ কৌশল ছিল, তাহার ভিতরে প্রধান একটি হইতেছে আপাতবিরোধী বর্ণনা-রীতি, অপরটি হইতেছে শ্লেষ (pun)। 'শ্লেষে'র দ্বারা যে রসিকতা জমান খুব সহজ তাহার প্রমাণ শ্লেষ কথাটা বাঙলায় একেবারে বিদ্রূপাত্মক-হাস্যরসের সমার্থবাচী হইয়া উঠিয়াছে। অস্ত্যর্থক এবং নাস্ত্যর্থক বাক্যের পাশাপাশি সংযোজনায় বর্ণনায় যে একটা চমৎকারিত্ব ফুটিয়া ওঠে বীরবল তাঁহার রচনায় সেই কৌশলটিরও যথাসম্ভব সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন,—শুধু যে বাক্যমধ্যেই এই কৌশল গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা নহে, বীরবলের সুপ্রসিদ্ধ 'আমরা ও তোমরা' সমগ্র রচনাটিই এই রীতিতে গঠিত।

চলতি ভাষায় এবং সাধারণ আলাপ-আলোচনার ভঙ্গিতে বীরবল যে সরস রচনারীতি প্রচলিত করিয়াছিলেন সেজন্য তিনি শ্রদ্ধার্হ। কিন্তু ওস্তাদগণের কলা-কৌশলের প্রায়ই মুদ্রাদোষে গিয়া পরিণত হইবার একটা প্রবণতা থাকে; বীরবলের রচনাভঙ্গিও এই দোষ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত নহে। তবে বীরবলের একটা রসজ্ঞোচিত মাত্রাবোধ ছিল,—সেই মাত্রাবোধে তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধু উৎরাইয়া যান নাই,—ওস্তাদির সঙ্গে রসজ্ঞতা রক্ষা করিয়াছেন।

আমরা আর বেশী দূর অগ্রসর হইব না,—এইখানেই দাঁড়ি টানিলাম। রবীন্দ্রোত্তরকালের রচনাকারগণ সম্বন্ধে আমরা আর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না,—কারণ সে আলোচনায় সমসাময়িকতার দোষগুণ উভয়ই বর্তিতে পারে,—জ্ঞাতেও পারে অজ্ঞাতেও পারে। তা ছাড়া গবেষকবৃত্তির খনিত্র লইয়া বর্ধিষ্ণু বৃক্ষের গোড়া খুঁড়িতে যাওয়া নিরাপদ নহে, সুতরাং সঙ্গতও নহে।

মোটের উপর মনে হয়, আধুনিককালে আমাদের সাহিত্যের অন্যান্য দিক যে ভাবে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে, রচনা-সাহিত্য সেরূপ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে না। ইহার এক কারণ, গোলামনের খোলা হাসি মিশাইয়া পরমাত্মীয়রূপে কথা বলিবার লোক যেন ক্রমে বিরল হইয়া উঠিতেছেন। ইহার জন্য শুধু আমাদিগকে দায়ী করিলেই চলিবে না, আমাদের পরিবেশটিও হয়ত অনেকখানি দায়ী। মনের খেয়ালের জন্য মনের খুশি চাই,—খুশির অভাবে আমাদের খেয়াল আসিতেছে না; আর যদি একবার ভাব পাই বা ভাবে পায় ত কবিতা লিখি, অপারগ পক্ষে সমালোচনা করি। অন্যদিকে গুরুগম্ভীর পল্লবগ্রাহিতায় সাময়িক-পত্রের পত্রগুলি প্রবন্ধকণ্টকে আকীর্ণ

হইয়া উঠিতেছে। আশাপ্রদ ব্যক্তিক্রম একেবারে নাই তাহা বলিতে পারি না, —কিন্তু বড় বিরল। ইতিহাসের বিরুদ্ধে আপশোষ করিয়া লাভ নাই। জোর করিয়া বা সভা-সমিতি করিয়া আর সবই হইতে পারে, সাহিত্য রচনা হয় না।

--শেষ--

রচনাকার-নির্ঘণ্ট